# রাণুর কথামালা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২, মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

'রাণুর কথামালা'

বইখানি

পরমপূজ্য মেজমামার

হাতে

সমর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার

# সূচী


| | | |
|---|---|---|
| মোটর-দুর্ঘটনা | ... | ১ |
| বাঘ | ... | ২০ |
| বিপন্ন | ... | ২৫ |
| খাঁটির মর্যাদা | ... | ৩৬ |
| নির্বাসিত | ... | ৪৮ |
| নোংরা | ... | ৬৫ |
| হোমিওপ্যাথি | ... | ৮৯ |
| অব্যবহিতা | ... | ১১৫ |
| "কস্মৈ হবিষা বিধেম ?" | ... | ১৩৭ |
| ধার্মিক | ... | ১৫৪ |
| কৈকালার "দাদা" | ... | ১৬১ |
| আশা | ... | ১৭২ |
| মাতৃপূজা | ... | ১৯৮ |
| বন্য ও বন্যা | ... | ২১৩ |
| কাব্যের মূলতত্ত্ব | ... | ২৩২ |
| ছত্রপতি | ... | ২৪৮ |

# মোটর-দুর্ঘটনা

পান্নালালকে শ্রীরামপুরের ভীষ্ম বলা হইত। তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রাণ দিবে, তবু বিবাহ করিবে না।

সে-যুগের এক-একটা দিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। সন্ধ্যার মুখে গঙ্গার ঘাটে সব বসিয়া আছি, তর্ক চলিতেছে। তখন কলেজের নূতন জীবন, লজিকের ঝাঁজ খুব বেশি, সবারই পান্নালালকে কোণ-ঠাসা করিবার চেষ্টা। কে একজন বলিলাম, বেশ, প্রাণ দেবে, তবু বিয়ে করবে না; কিন্তু যদি জবরদস্তি কিংবা পাকেচক্রে বিয়ে দিয়ে দেয়?

প্রাণ দোব।

গোঁয়ারের বেয়াড়া লজিকের ধাঁধায় পড়িয়া সবাই মনে মনে দ্রুত বইয়ের পাতা উলটাইতেছি, ততক্ষণ পান্না বলিয়া চলিয়াছে, কেন বিয়ে করতে যাব বল দিকিন? এই যে আমাদের পরমকাম্য স্বাধীনতা,‑ কিসের লোভে এটা একজনের পায়ে জন্মের মত জলাঞ্জলি দোব?

রমণী বলিল, বাঃ, তা হ'লে ইউরোপ, অ্যামেরিকা, জাপানের সবাই পরাধীন বলতে চাও?

পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের মত পান্নালাল-জাতীয় লোকেদের বেষ্টন করিয়া এক-আধটি উপগ্রহ থাকে; পান্নালালের ছিল সতে। সতে রমণীর কথায় ফোঁস করিয়া উঠিল, যা বুঝিস না, তাতে তর্ক করতে যাস নি, ভাল লাগে না। বিয়ে ক'রে পৃথিবী জাহান্নমে যেতে বসেছে, আর তোরা সব—তোমার সে প্যারডিটা শুনিয়ে দাও না পান্নাদা, কে কাটে দেখি।

পান্নালাল বলিল, হ্যাঁ, লংফেলোর সেই কবিতাটা একটুখানি বদলে বেশ বলা চলে—

Lives of married men all remind us
We make our life a hell and slime,
And departing leave behind us
Progeny to curse us till end of time

সতে বাংলাও বেশ করেছে—

বিবাহিত ভ্রান্তজন যে পথে ক'রে গমন
এনেছেন ধ্বংস ডেকে স্বীয় ;
সেই পথই লক্ষ্য ক'রে,—একি মতিচ্ছন্ন ওরে !
—মৃত্যুকে করিলি বরণীয় !

তা, এই সর্ববিধ মৃত্যুকে ডেকে আনবার যার শখ আছে, সে বিয়ে করুক না ভাই ; আমার নেই।

সতে বলিল, আমারও নেই।

কোন বুদ্ধিমান লোকেরই থাকা উচিত নয়। যে সময়টা বিয়ে ক'রে নষ্ট করব, আমার মতে ঢের ভাল হয় সেই সময়টা—সেই সময়টা—

সামনে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা আসিতেছে। সতে বলিল, সে সময়টা যদি গঙ্গা সাঁতরে ব্যারাকপুরে ওঠা যায়—

রমণী মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার চেয়ে আরও ভাল হয়, যদি সাঁতরে আর না উঠতে পারিস।

পান্নালাল বলিল, আমি সেই ত্রেতাযুগ থেকে আরম্ভ করছি, মিলিয়ে নাও।—রামচন্দ্র বিয়ে না করলে চোদ্দ বছর পরেই নিরিবিলিতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পারতেন ; পঞ্চপাণ্ডব বিয়ে না করলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হ'ত না, তাতে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সহজে একটা

এমিকেব্‌ল সেট্‌ল্‌মেণ্ট হয়ে যেতে পারত; পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে বিয়ে ক'রে যা কাণ্ডটি বাধালেন, তাতে শেষ পর্যন্ত পৈতৃক প্রাণটি তো গেলই, দেশটিও মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে বসলেন; আর—আর—! একেবারে আধুনিকতম উদাহরণ চাও তো চোখের সামনেই দেখতে পাবে—

সতে তাড়াতাড়ি জুড়িয়া দিল, রমণী বিয়ে ক'রে দু বছর থেকে আই. এ.-তে ঘ্যাস্‌টাচ্ছে।

রমণী রাগে নির্বাক হইয়া গটগট করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল এবং গঙ্গায় কোঁচার খুঁটটা ভিজাইয়া আনিয়া বলিল, নে, পান্না আর সতে হাত পাত্‌; গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে বল্‌—কখনও বিয়ে করবি নি, দেখি কত মুরোদ!

পান্নালাল তেজোগর্ভ নিস্পৃহতার সহিত হাতটা বাড়াইয়া বলিল, আমার নিজের প্রিন্সিপ্‌ল-ই গঙ্গাজলের চেয়ে পবিত্র, তবুও যখন বলছিস, দে।

আমরা দুই-একজন বাধা দিতে উঠিলাম। পান্নালাল সৌম্য মৃদু হাস্যের সহিত দৃঢ়ভাবে বলিল, তোমরা পান্নাকে তা হ'লে চেন নি ভাই।

* * *

সেই পান্নালালকে দেখিলাম, অখিল বোসের মনিহারী দোকানে গভীর অনুধাবনের সহিত কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার একটা ফিডিং-বট্‌ল পরীক্ষা করিতেছে।

পাস করিয়াই চাকরি লইয়া নাগপুরে চলিয়া যাই; ছয় বৎসর পরে আজ দেশে ফিরিয়াছি। খবর-টবর এখনও বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা হয় নাই; তাহা হইলেও এ দৃশ্য একেবারেই প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। যাই হোক, হঠাৎ বিস্ময়ে পান্নাকে অভিভূত করিয়া দিবার জন্য

আস্তে আস্তে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাশে দাঁড়াইলাম, কাঁধে হাত দিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি রে, চিনতে পারিস ?

খু-ব। তারপর ? আচ্ছা, দেখ দিকিন, ঐ জিনিসটা কেমন হবে ? পাচ-ছটা ব্র্যাণ্ড দেখলাম বাজার ঘুরে,—আমেরিকান আছে, জার্মান আছে, জাপানী আছে ; জাপানী ফিডিং-বট্‌ল ভাল নয়—খোঁজ নিলাম, আমাদের পাড়াতেই সাত-আটটা গিয়েছিল, কারুরই টেঁকে নি। অখিল এই দু রকম দিশী আমদানি করেছে, মোটা নয় তেমন কাঁচটা—ছেলেটা যা দামাল, টেঁকতে দেবে কি ? আমি তো বলি, বেল্‌জিয়ান—

বিস্ময়ের মাত্রা আমারই বাড়িয়া চলিয়াছিল,—ছয় বছর পরে এই সম্ভাষণ ! কাঁধে চাপ দিয়া বলিলাম, কার ছেলে রে পান্না ?

পান্নালাল যেন অন্য কোন লোক হইতে ফিরিয়া আসিল। আস্তে আস্তে বোতলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিল, আমাদের শৈলেন না ? তারপর, অনেকদিন পরে যে ! দেশ মনে পড়ল ? নাগপুর —নাগপুর—নাগপুরে—কি যে বলে—নাগপুর থেকে আমাদের জন্যে গুপোসন্দেশ—

লজ্জার বশে তাহার অবস্থা দেখিয়া বেজায় হাসি পাইল, চাপিয়া লইয়া বলিলাম, নাগপুরে গুপোসন্দেশ হয় না—কমলালেবু। যাক, সে কথা পরে হবে 'খন ; বলি, কার দামাল ছেলে সামলাবার বন্দোবস্তে বাজারে বেরিয়েছিস তাই বল্। তোর যে এ রকম দুর্ভোগ হবে—

সেই রকমই জড়িতকণ্ঠে পান্নালাল বলিল, আর কার ? থাক্, সে দুঃখের কথা আর তুলে কাজ নেই ভাই।

বলিলাম, শুনিই না।

আরে ভাই, এই এক সেরামপুর-হাওড়া বাস-সার্ভিস হয়েছে ঢঙের,

ধড়ফড়ানির মধ্যে তাড়াহুড়ো ক'রে চড়তে গিয়ে বিয়ে হয়ে গেল। সাতটায় ফিডিং-বট্‌ল কিনতে বেরিয়েছি, এই সাড়ে নটা বাজে। রোদে ধূলোয় আর মাথার ঠিক নেই।

বলিলাম, আমারও মাথা গুলিয়ে আসছে, একটু ভেঙে বল্‌। বাসে চড়তে গিয়ে ঠ্যাং খোড়া ক'রে বসলে সেটা বুঝতে পারতাম; কিন্তু—

ঠ্যাং খোঁড়া হওয়ার চেয়ে কি এ কম দুর্ঘটনা রে ভাই? চল্‌, বলছি, এইটেই তা হ'লে কিনে নিই। দাও হে অখিল।

বাড়ি আসিতে আসিতে পান্নালাল নিম্নলিখিত কাহিনীটি বিবৃত করিল—

এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাসটা আর পাওয়া গেল না, সে তো জানিসই; প্রফেসারির চান্সটা গেল। বি. এল.-এ জয়েন করলাম। আচার্য রায় তখন ল-কলেজটাকে ডাক ছেড়ে গালাগাল দিচ্ছেন; দুচ্ছাই ব'লে ব্যবসায় ঢুকে পড়লাম।

তিন মাস পরে বেরিয়ে আসতে হ'ল। জেঠামশাই দু হাজার পর্যন্ত লোকসান বরদাস্ত ক'রে বললেন, নাও, ঢের হয়েছে; গণেশের মুখটি ফিরিয়ে দাও।

দুদিন পরে বাড়িতে বললেন, আর তো হ'ল, এইবার বিয়ে-থা করুক।

জেঠাইমাকে বললাম, প্রাণ দোব, তবুও— সে আমার প্রিন্সিপ্‌ল তো তুই জানিসই।

জেঠামশাই বললেন, তবে আমি চললাম; ও নিজের বাড়িঘরদোর দেখুক নিজে।

দোসরা অঘ্রাণ কাশী যাবেন, পয়লা হাঁচতে গিয়ে মাথার শির ছিঁড়ে মারা গেলেন।

তারপরে চাকরির চেষ্টায় বেরুলাম আর কি। খেয়ে-দেয়ে একটি ছোট্ট নিদ্রা দিয়ে বেরুই, আবার খাবার সময়টিতে বাড়ি ঢুকি। যত না হয়, যেন একটা রোখ চেপে যায়। গভর্মেণ্ট আপিস, পোর্ট কমিশনার, কর্পোরেশন, ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট—কিছু আর বাকি রাখলাম না। শেষে একটা সওদাগরী আপিসে একটু আশা পাওয়া গেল। বললে. কাল সাড়ে এগারোটার সময় দেখা ক'রো, ঠিক সাড়ে এগারোটার সময়।

তার মানে নটা বিয়াল্লিশের গাড়িটা ধরতে হয়, তার মানে বাড়ি থেকে বেরুতে হয় অন্তত সাড়ে নটার সময়। শীতকাল, তায় আবার কয়েক দিন থেকে ভোরের দিকে চাকরি হওয়ার স্বপ্ন দেখছি ব'লে আশায় আশায় আটটা সাড়ে আটটার পূর্বে আর ঘুম ভাঙে না।

যা হোক, সেদিন তাড়াহুড়ো ক'রে ভোর সাড়ে সাতটার সময়েই উঠে পড়লাম। মুখ-হাত ধুয়ে-টুয়ে তেল মেখে নাইতে যাব, জেঠাইমা বললেন, চাকরিটা হচ্ছে, যা, বরং গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আয়।

বললাম, কোথায় চাকরি তার ঠিক নেই—তা ছাড়া সময় কোথায় জেঠাইমা? নটা বিয়াল্লিশের গাড়িটা যে ধরতে হবে।

জেঠাইমা বললেন, থাক্, অপরাধ হয়েছে। আমায় আজ কাশী পাঠিয়ে দে।

কাজ কি ঘাঁটিয়ে? হি-হি করতে করতে ছুটলাম গঙ্গায়। নেয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল; সাড়ে নটার সময় খেতে বসলাম। তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে উঠতে যাব, জেঠাইমা বললেন, ওরে পান্না, থাম্। দেখেছ মরণ! একেবারেই মনে ছিল না, দই না খেয়ে আজ বেরুতে আছে? ব'স একটু, রতু গিয়ে দু পয়সার নিয়ে আসুক চট ক'রে।

বললাম, এই ঠাণ্ডা; ফোঁটা দিয়ে দিলে হয় না জেঠাইমা? ততক্ষণ কাপড়-চোপড় পরি।

বললেন, হবে না কেন? সবই হয় বাবা; হয় না শুধু এই রকম অপদার্থ ভুলো মন নিয়ে আর সংসার করা, তাই বলছিলাম যে, দে আমায় কাশী পাঠিয়ে।

কত আর বলব ভাই? যাত্রা করতে গাড়ি তো গেল বেরিয়ে। দশটা পনরোর একটা বাস রান করে, বুঝি সেটাও ছেড়ে যায়। পিঁড়েয় ব'সে ঘড়ির দিকে চেয়ে ছটফট করতে লাগলাম।

দই আসতে, খাওয়া শেষ হতে অনেক দেরি হয়ে গেল। 'অমৃতবাজার'টা একবার উল্টেও দেখা হয় নি। জুতো জামা পরতে পরতে রতনকে বললাম, তুই ততক্ষণ এই বিজ্ঞাপনের কলমগুলো পড়্ দিকিন, শুনি।

রতনা তখন ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ছে; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প'ড়ে যেতে লাগল। কেবল লেডি আর লেডি। লেডি স্টেনোগ্রাফার চাই, একজন লেডি প্রাইভেট সেক্রেটারি চাই, স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস; একটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির ক্যান্‌ভাসার চাই, তাও লেডি। বেটাছেলের যদি নামগন্ধ আছে! ওদিকে জুতোর ফিঁতেটা গেল ছিঁড়ে; একটা গেরো দিলাম, এমন বড হয়ে গেল, ফিঁতেটা টানলে না ভেতরে যায়, না বাইরে আসে, মেজাজটা গেল খিঁচড়ে। এই রিডিং পড়া শিখেছ্ রাস্কেল?—ব'লে দিলাম রতনার রগে এক চড় কষিয়ে। তাতেই বোধ হয় তার চোখ দুটো অন্য কলমে ঠিকরে গিয়ে পড়ল; রতনা পড়লে, ওয়ান্টেড এ হাইলি কোয়ালিফাইড ইউথ অফ—

ঠিক এই সময়টিতে মোড়ে বাসের ভোঁ-শব্দ শোনা গেল, একেবারে ছ-সাতটা, ওগুলো ওই রকমই করে কিনা, যেন দিলে এই ছেড়ে। একটা জুতো প'রে, একটা হাতে নিয়ে ছুটলাম।

মিনিট দশেক কেটে গেল, ছাড়েই না। আমার মন প'ড়ে সেই

বিজ্ঞাপনটির ওপর। কেবলই মনে হচ্ছে, আহা, ঠিকানাটা নিয়ে এলে হ'ত! অনেকবার হ্যাঁ-না হ্যাঁ-না ক'রে পড়লাম একবার নেমে। বাড়ির সিঁড়িতে পা দোব আর কি, স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ হ'ল। ফিরে, এক রকম দৌড়ুতে দৌড়ুতে বললাম, রতন, কাগজটা নিয়ে আয় শিগগির; না দিতে পারিস, আফিসের নম্বরটা চেঁচিয়ে ব'লে দে, গাড়িটা দিলে বুঝি ছেড়ে।

রতনা আসতে আসতে গাড়িটা মোশন দিয়েছে। চেঁচিয়ে বললে, পঁচাত্তর নম্বর ক্লাইভ রেঞ্জ—ক্লাইভ রেঞ্জ—পলাশীর রবার্ট ক্লাইভ মামা। এই হিসেব ঠিক রেখে শুনে যাও।

তারপর হাত উঁচু ক'রে দু হাতের আঙুলগুলো হরদম খুলতে লাগল, আর মুড়তে লাগল, বুদ্ধিমান ভাগনে আমার! যখন এই ভাবে আন্দাজ বোধ হয় দেড়শো হয়েছে, তখন বাসটা মোড় ফেরায় আর দেখতে পেলাম না। আপিসে তার পরদিন দেড়টার সময় ডাকলে—ঠিক দেড়টার সময়। ওরা বোধ হয় ক্যাণ্ডিডেটদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাস গেলে বাস কোম্পানি, ট্রাম কোম্পানি, এদের কাছ থেকে মোটা কমিশন মারে। ভাবলাম—মরুক গিয়ে, ক্লাইভ রেঞ্জ কি বলেন একবার দেখি।

জায়গাটা খুঁজে বের করতে যা বেগটা পেতে হয়েছিল, সে আর ব'লে কাজ নেই। নাম শুনে প্রথমে ক্লাইভ স্ট্রীট, ক্লাইভ-রো তো চ'ষে ফেললাম, সারা ড্যালহৌসি স্কোয়ারের কোথাও আর বাদ দিলাম না। শেষে এক ভদ্দরলোক বললেন, সে তো এখানে নয়; কালীঘাটে গিয়ে খোঁজ করুন।

মনটা একটু দ'মে গেল। ভেবেছিলাম, হাইলি কোয়ালিফাইড ইউথ চাইছে, নিশ্চয় বড় কোন সাহেবী সওদাগরী আপিস হবে;

তা হ'লে নয় দেখছি। কালীঘাটের বাস থেকে নেমে একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম। বললে, বেলেঘাটায় যেতে হবে।

বললাম, একজন বললেন যে কালীঘাটে ?

সে একটা ঢেকুর তুলে মুখটা কুঁচকে শুধু বললে, খুঁজে দেখুনগে তা হ'লে।

তার সঙ্গে আর একটি ছোকরা ছিল; আমার পানে বিরক্তভাবে আড়ে চেয়ে বললে, ক্লাইভ রেঞ্জে ওর শ্বশুরবাড়ি মশাই; কালই শালীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে এল, এখনও চোঁয়া ঢেকুর তুলছে আর কেল্নাবের সীতাকুণ্ডের জলের সোডাওয়াটার খুঁজে বেড়াচ্ছে, ও জানবে কেন ? তার র‍্যাপারে একটা টান দিয়ে বললে, চল্, যত সব বোগাস।

তাদের কাছে পাকাপাকি ঠিকানাটা জেনে ফিরতি বাসে চ'ড়ে বসলাম।

মাঝারি গোছের একটা দোতলা বাড়ি, বেশ ফিটফাট, সামনে একটু বাগানের মতনও আছে। সওদাগরী আপিস নয় ব'লে বিশেষ নিরাশ হলাম না; ভাবলাম, বাড়ির মালিক কোন ছোটখাট কোম্পানির ডিরেক্টর-গোছের কেউ একটা হওয়া বিশেষ আশ্চর্য নয়।

খবর পেয়ে একটি ভদ্দরলোক বেরিয়ে এলেন।

আগ্রহ চাপিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিলাম, তোর হবু-শ্বশুর বুঝি ?

পান্নালাল বলিল, শোন্‌ই না সবটা আগে।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই ?

বললাম, 'অমৃতবাজারে' একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

ভদ্দরলোকের কপালটা হঠাৎ কুঁচকে উঠল, আর দৃষ্টিও হয়ে উঠল

যেন বড় তীক্ষ্ণ। আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। কথাটা না বাড়িয়ে বাড়ির নম্বরের দিকে চেয়ে বললাম, এইটেই তো পঁচাত্তর নম্বরের বাড়ি?

বললেন, হ্যাঁ, পঁচাত্তর নম্বরের বাড়ি।

বললাম, বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে যে, একজন বিশেষরকম শিক্ষিত যুবক দরকার, তাই ভাবলাম, বেলেঘাটার দিকে যখন যাচ্ছিই, একবার না হয় দেখাটা ক'রেই যাই।

ভদ্দরলোক সেই রকম ভাবেই ভুরু কুঁচকে বললেন, যুবকটি আপনার কে হয়?

খটকাটা বেড়েই চলল; বললাম, আজ্ঞে, আমি নিজের জন্যেই এসেছি, ভাবলাম, সব কাজে নিজে গিয়েই—

একেবারে যাকে বলে অগ্নিশর্মা! বললেন, কে হ্যা তুমি? ইয়ারকির আর জায়গা পাও নি? দারোয়ান!

আমি তো এতটুকু হয়ে গেলাম রে ভাই।—বলে কি? সেই সেরামপুর থেকে ক্লাইভ স্ট্রীট, কালীঘাট হয়ে তেতে-পুড়ে এককাঁড়ি পয়সা খরচ ক'রে এলাম ইয়ারকি দিতে! ভ্যাবাগঙ্গারাম মেরে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় ওপর থেকে একজন বললেন, কি হ্যা দ্বিজেন?

ভদ্দরলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তোমায় বলেছিলাম দাদা, ও রকম অ্যাড্‌ভার্‌টাইজ্‌মেণ্ট করা ঠিক হবে না, এ সে দেশ নয়। দেখ না, কোথাকার একটা ভ্যাগাবণ্ড, বলে কিনা, নিজের জন্যে—

ওপরের লোকটি নেমে এলেন। বলতে কি ভাই, আমার তো তখন শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর লাসটি দেখে বোধ হ'ল, তাঁর দ্বারবান ডাকবারও দরকার হবে না। যা হোক, নেমে একটু ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, ব্যাপার কি? থাম দ্বিজেন, চট ক'রে রাগে না। আপনি কোথা থেকে আসছেন মশায়? কি কাজ?

বললাম, আজ্ঞে, আসছি সেরামপুর থেকে। ভ্যাগাবণ্ড নয়। সেখানে এক বিশিষ্ট ভদ্রঘরেরই ছেলে আমি। আজ পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

এ ক্ষেত্রেও ওই পর্যন্ত ব'লেই একটু দাঁড়ালাম ; দেখি, এঁর মুখের ভাবটা আবার কেমন হয় ; তা বুঝে সাবধানে এগুব।

ভদ্দরলোক বেশ ভাল ক'রে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, আপনি বড্ড ঘুরেছেন, না? আসুন, ওপরে আসুন।

তাঁদের দু ভায়ের তত্ত্বাবধানে একবারে রাস্তা ছেড়ে অত ভেতরে যাবার সাহস হচ্ছিল না ; কিন্তু 'না' বলবার সাহসও সঞ্চয় করতে না পেরে আস্তে আস্তে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বললেন, হ্যাঁ, বেরিয়েছে। আপনি কি করেন ?

বললাম, কিছুই করি না, সেইজন্যেই তো আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।

প্রথম লোকটি মুখ লাল ক'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন, দাদার চোখ-টিপুনিতে থেমে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি ভাই বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম ব্যাপার দেখে,—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি' অবস্থা। ঘাগী ক্যাণ্ডিডেট্‌দের ভঙ্গীতে হাত কচলে বললাম, তা আপনাদের যদি দয়া নাই হয় তো উঠি না হয়।

ছোট রাগে গসগস করতে করতে উঠে গেলেন, ফিরে ফিরে আমার ওপর অগ্নিদৃষ্টি হানতে হানতে। দাদা বললেন, আচ্ছা, এসে পড়েছেন যখন ব'সেই যান একটু, বড্ড মেহনত হয়েছে। দারোয়ানকে ওপর থেকে এক গ্লাস জল আর পান আনতে হুকুম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বাপ-মা জীবিত আছেন ?

দুদিক থেকে এ রকম প্রবল অনুরাগ আর বিরাগের ধাক্কায় আমার মাথা গুলিয়ে আসছিল। প্রশ্নটা অনধিকার-চর্চা ঠাউরে একটু বিরক্তির আঁচ দিয়েই বললাম, আজ্ঞে না, তাঁদের অনেক দিন খেয়েছি, জেঠামশাই ছিলেন, সম্প্রতি তাঁকেও সাবড়েছি ; কিন্তু এসব কথা বলতে তো মশায়ের কাছে আসি নি।

ঠিক এই সময় জল আর পান এল। এক চুমুকে জলটুকু খেয়ে দুটো পান মুখে দিয়ে উঠে পড়লাম। বললাম, কেন তা বলতে পারি না, কিন্তু আমাকে দেখছি আপনারা উপযুক্ত ক্যান্‌ডিডেট ব'লে মনে করেন না—যদিও আমার শিক্ষাদীক্ষা বংশপরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সেটা পরখও করলেন না। তা হ'লে উঠি।

গেট পর্যন্ত এসেছি, তিনি বারান্দার সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে ডাকলেন, শুনুন।

কাছে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, পড়াশুনা কতদূর হয়েছে আপনার ?

বললাম, ইংরেজীতে এম. এ. সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হই গত বৎসর। চার মার্কের জন্যে ফার্স্ট ক্লাসটা মিস করি। ওদিকে ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ.-তে. স্কলার্‌শিপ নিয়ে এসেছি। দিন কত বি. কম -এও জয়েন করেছিলাম, আর ব্যবসা সম্বন্ধেও একটু অভিজ্ঞতা আছে।

ভদ্রলোক 'পুয়োর চ্যাপ' ব'লে মুখটা নীচু ক'রে মাথা চুলকোতে লাগলেন, যেন কি একটা মহা সমস্যায় পড়েছেন। একটু পরে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, পুয়োর চ্যাপ, ইয়োর আঙ্কল্‌স ডেথ হ্যাজ্‌ বিন টু মাচ ফর ইউ—জেঠামশাই মারা পড়েছেন ব'লে কি অতটা মুসড়ে পড়তে আছে ? আচ্ছা, এখন যান, কাল বরং সার্টিফিকেটগুলো একবার নিয়ে আসবেন। সকালে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় নিয়ে আসবেন বরং।

এ ধরনের সহানুভূতির জন্যে কড়া কড়া দু কথা শুনিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল ; কিন্তু আর হাঙ্গামা বাড়ালাম না। মনে মনে বললাম, ঢের হয়েছে বাবা, ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার ; আবার এ-মুখো ?

রাস্তায় আসতে আসতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে দেখবার চেষ্টা করলাম। শেষের দিকে অত সহানুভূতি-সান্ত্বনার মানেটাই বা কি ? জেঠামশাই মারা যাওয়ার জন্যে এমন প্রবল শোকের পরিচয় তো দিই নি ওদের কাছে ! তবে কি পাগল ঠাওরালে ? চাকরির উমেদারি করেছি, যেমন আরও পাঁচজনে ক'রে থাকে, তবে ? আমি উল্টে পাগলদের পাল্লায় পড়ি নি তো ?

বাড়িতে এসে 'অমৃতবাজার'টার খোঁজ করলাম, বিজ্ঞাপনটা ভাল ক'রে দেখতে হবে। টের পাওয়া গেল, রতনা ঢাউস ঘুড়ি ক'রে সেটাকে উড়িয়ে দিয়েছে। আমি আর অতটা চাড়ও করলাম না ; কাল তো টের পাওয়াই যাবে। পরের দিন যা কাগজ এল তাতে বিজ্ঞাপনটা ছিলই না।

হ্যাঁ-না হ্যাঁ-না ক'রে সেদিন সাড়ে আটটার বাসে সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সর্দি করেছিল, দইয়ের ভয়ে আর জেঠাইমাকে কিছু বললাম না।

ভদ্রলোক বাইরের বারান্দাতেই ব'সে একটা কাগজ পড়ছিলেন ; বললেন, এই যে এসেছেন ! বসুন।

একটি ছোট ছেলেকে আদেশ করলেন, যা, তোর কাকাকে ডেকে দে।

বললাম, থাক্ থাক্ ; তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ?

ছেলেটা কিন্তু চ'লে গেল। কাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, পাশের ঘরটিতে একপাল মেয়েরও আমদানি হ'ল। ব্যাপারটা যতই

তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি, চাপা হাসি, ফিসফিসানি আর চুড়ির আওয়াজে ততই যেন থই পাই না। একবার ভাবলাম, বোধ হয় টুইশনির চাকরি হবে; কিন্তু তার মধ্যে এত হেঁয়ালি আসে কোথা থেকে?

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি—রাতারাতি গিয়ে কলেজের প্রিন্সি-প্যালের কাছ থেকে আর গুণময়ের বাবার কাছ থেকে দুটো ভাল ক্যারেক্টার-সার্টিফিকেট নিয়ে আসি। গুণময়ের বাবা তখন সেরামপুরের স্যাব্‌ডিভিশনাল অফিসার।

দুই ভাইয়ে মিলে সার্টিফিকেটগুলো দেখে গেলেন। শেষ হ'লে বড় শুধু 'হুঁ' ক'রে একটা টানা শব্দ করলেন। ছোট জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আপনার গার্জেন কে?

বললাম, নিজেই; অর্থাৎ বাড়ির বেটাছেলের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়। আর একটা অপোগণ্ড ভাগনে আছে।

দুই ভাইয়ে মুখ-চাওয়াচায়ি করলেন। ছোট বললেন, তবুও একজন মুরুব্বী আছেন তো এসব কথায় মধ্যস্থতা করবার জন্যে?

বললাম, দরকার কি? আমায় উপযুক্ত মনে করেন গ্রহণ করবেন, না করেন বিদায় হব। এর মধ্যে মধ্যস্থতার দরকার দেখি না তো।

ঘরের ভেতর চাপা হাসি হঠাৎ একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। বড় উঠে গিয়ে একটু দাবড়ানি দিয়ে এসে বসলেন।

সার্টিফিকেটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, বড় অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাসটা পান নি তা হ'লে। আচ্ছা, পরীক্ষার আগে কোন শক্ত ব্যারাম-ট্যারাম হয়েছিল কি? এই যেমন টাইফয়েড, কি—

যে কারণেই হোক, আমায় যে পাগল ঠাউরেছে তাতে আর সন্দেহ

রইল না। আমি কথাটা খোলসা ক'রেই উত্তর দিলাম ; বললাম, আজ্ঞে না, যাতে ব্রেন অ্যাফেক্ট করে এমন অসুখই হয় নি।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না না, ব্রেন অ্যাফেক্ট করার কথা বলছি না, ব্রেন অ্যাফেক্ট কেন করতে যাবে !

আরও এই রকম গোটাকতক কথাবার্তার পর বড় ভাই ছোটকে ডেকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে চ'লে গেলেন। খানিকক্ষণ কি পরামর্শ হ'ল, তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা, আপনি তা হ'লে যান এখন ; ঠিকানাটা রেখে যান, আমাদের মতামত জানাব।

চাকরির উমেদারিতে মাসখানেক নাগাড়ে ঘুরে ঘুরে একেবারে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলাম। এই আশাটুকুকে একেবারে আঁকড়ে ধরলাম। হাত দুটো একত্র ক'রে খুব মিনতির সঙ্গে বললাম, আমার চেয়ে খুব বেশি উপযুক্ত ইয়ংম্যান পান তো আলাদা কথা ; তা না হ'লে নিরাশ হব না, এ রকম আশা করতে পারি কি ?

ঘরের মধ্যে হাসি, ফিসফিসানি, ঠুংঠুং আবার একচোট বেড়ে উঠল। এঁদের মুখে যেন হঠাৎ কালি ছেয়ে গেল, বড়রও। কেমন এক রকম হয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, এখন আসুন।

বাড়িতে এসে দেখলাম, বহরমপুর থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে —দিদিমা এখন-তখন, একবার দেখতে চান। বিকেলের ট্রেনে চ'লে গেলাম। তিন দিন পরে ফিরে এলাম। স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতেই ফেলুর সঙ্গে দেখা ; পিঠ চাপড়ে বললে, বেশ, দিব্যি ! মোদ্দা, মিষ্টান্ন ইতরে জনা—যেন বাদ না পড়ি।

তাকে যতই স্পষ্ট ক'রে বলতে বলি, সে ততই হেঁয়ালিটা ঘোরালো ক'রে তোলে ; উলটে বলে, যাও না ভাই, আর ভাঁওতা দেওয়া কেন ?

বাড়িতে এসে জেঠাইমাকে প্রণাম করতে তিনি ডুকরে কেঁদে

উঠলেন, ওগো, কোথায় গেলে গো, তোমার সেই পান্না আজ স্বয়ংবরা হয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে, একবার দেখে যাও গো।

একেবারে কাঠ মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম, শোকে শেষ পর্যন্ত কি জেঠাইমার মাথা বিগড়ে গেল!

শৈলীকে ডাকলাম; সে বাড়ি ছিল না। রতনা লেই-মাখা হাতে বেরিয়ে এল। একগাল হেসে, চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললে, মামা, দিদিমা সব ঠিক ক'রে ফেললে, চল্লিশ ভরি সোনা, আর এই নগদ—। ব'লে লেইয়ের মধ্যে থেকে বুড়ো-আঙুল দুটোকে উদ্ধার ক'রে দাঁড করিয়ে ধরলে,—অর্থাৎ দু হাজার টাকা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কার চল্লিশ ভরি সোনা রে? খুলে বল্ দিকিন। শৈলী কোথায়?

রতন হাত দুটো পরিষ্কার করতে করতে বললে, যাও, যেন জানেন না; নিজে ঠিক ক'রে এসে—। মামীমার। আর কার? আমি নিদবর; সিল্কের জামা চাই, হ্যাঁ।

জেঠাইমা ওদিকে কেঁদে যাচ্ছেন। রতনার কাছ থেকে যতটা জানতে পারা গেল, তাতে বোঝা গেল—আমি যাওয়ার পরদিন কলকাতা থেকে দুটি ভদ্রলোক এসে হাজির হন। রতনা হাত দুটো মুঠো ক'রে আর কনুই দুটো পাঁজরা থেকে হাতখানেক ক'রে সরিয়ে বললে, ইয়া কেঁদো কেঁদো দুটো ভদ্দরলোক মামা। জেঠাইমা বাড়ি ছিলেন না; প্রথমে রতনার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়। এদিক সেদিক অনেক কথা আলোচনা ক'রে রতনাকে নানা প্রকারে আপ্যায়িত ক'রে তাঁরা প্রশ্ন করেন, তোমার মামার কি মাথা-খারাপ আছে?

রতন বলে, হ্যাঁ, একটু একটু।

তাঁরা বলেন, বিয়ে-পাগলা, না?

রতন বলে, হ্যাঁ, এক্কেবারে বিয়ে করতে চায় না। দিদিমা বেচারী সবাইকে ব'লে বেড়ায়, এ কি পাগলামি ছেলের, দেখ তো! মামা কিন্তু টসকায় না একটুও।

তারপর জেঠাইমা এসে পৌছন। তাঁদের কথা শুনে লাহিড়ী মশায়কে ডেকে আনান। মুখুজ্জেদের বাগানে ঘুড়ি কেটে এসে পড়ায় রতনা আর এর পরের খবর রাখে না।

বললাম, তোর মাকে ডেকে আন্ শিগগির।

শৈলী এসে পৌছবার আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সোমবার 'অমৃতবাজার' বন্ধ থাকায় কাগজওয়ালা 'বঙ্গবাণী' দিয়ে যায়। রতনা সেটাকে ঢাউস ঘুড়িতে পরিণত করবার জন্যে সব যোগাড়যন্ত্র ক'রে রেখেছিল। বিজ্ঞাপনের কলমে চোখ বোলাতে বোলাতে এক জায়গায় হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল ; লেখা রয়েছে,—

একটি সুন্দরী সুশিক্ষিতা পাত্রীর জন্য বিশেষ উচ্চশিক্ষিত শাণ্ডিল্য গোত্রেতর পাত্র আবশ্যক। কন্যার বয়স পনের বৎসর। কন্যার পিতা উপযুক্ত পণদানে সমর্থ। পাত্রটি সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিভাবক পাত্রের ফোটো সমেত পত্রাচার করুন, অথবা সম্ভবপর হইলে স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

ডাক্তার সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি

৭৫।১ নং ক্লাইভ রেঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা

আমি তো এক রকম টলতে টলতেই চেয়ারে এলিয়ে ব'সে পড়লাম। —করেছি কি! তাড়াতাড়ি একেবারে সশরীরে গিয়ে হাজির! বিজ্ঞাপনটা আবার পড়বার চেষ্টা করলাম, বোধ হয় ভুল দেখেছি, কিন্তু কালো ঝাপসা রেখার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম মাত্র, একটা কথারও যেন মানে ধরতে পারলাম না। মাথার মধ্যে ক্রমাগতই

কতকগুলো কথা এলোমেলোভাবে এসে সব গুলিয়ে দিতে লাগল।—বলছি, 'আজ্ঞে আমি নিজের জন্যেই এসেছি', কতই কাকুতি ক'রে বলছি, 'সেইজন্যেই তো আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি', শেষে হাত দুটো একত্র ক'রে বলছি, 'নিরাশ হব না, এ রকম আশা করতে পারি কি ?'—পাশের ঘরের চাপা হাসি, ছোট ভাইয়ের উগ্র ভাব, আর বড়র সেই হতভম্ব ভাব—সবই তাদের প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ভাবলাম, মা ধরণী, তোমায় দ্বিধা হতে অনেকেই অনেকবার বলেছে ; কিন্তু আমার মত বিপন্ন হয়ে কেউ কখনও বলে নি। তুমি অন্তত তিনটি জায়গায় ফাঁক হয়ে আমাকে, সত্যপ্রিয়-গুষ্টিকে, আর সেই বেটা বাস-ড্রাইভারকে গ্রাস ক'রে ফেল। ওঃ, এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, বেটা নিশ্চিন্দি হয়ে বিড়ি টানছে, আর নামতে গেলেই বলছে, 'এই ইস্টার্ট দিলাম ব'লে বাবু।'

তাড়াতাড়ি সাইকেলটা নিয়ে ক্লাবে গিয়ে সেদিনকার পুরনো 'অমৃতবাজার'টাও খুঁজে বের করলাম। যদি কোনখানে, কোন রকমে, কোন একটু ভুল থাকে, নেহাত যদি—। কোথায় ভুল ? স্পষ্ট লেখা রয়েছে—

**Wanted a highly qualified youth of other than Sandilya Gotra for a fair, accomplished girl aged fifteen. Handsome dowry. Kindly correspond with or see personally—in either case with the groom's photo.**

**Dr. Satyapriya Banerjee,**
**75/1 Clive Range,**
***Beliaghata, Calcutta.***

অনেক চেষ্টাচরিত্র করলাম। বোঝানো, রাগ, অভিমান,—কিছুতেই কিছু হ'ল না। অনশনব্রত ধরলাম, ভাবলাম, গভর্মেণ্ট ট'লে যাচ্ছে ; ওদিকে ওরাও কাউণ্টার-অনশনব্রত ধরলে—জেঠাইমা, শৈলী,

এমন কি রতনা পর্যন্ত। পরে টের পেলাম, রতনা তিন বেলায় ছিদাম ময়রার দোকানে আমার নামে ধার ক'রে তিন টাকা আড়াই আনার খাবার সাঁটিয়েছে, বলেছে, বাড়িতে সবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হাঁড়ি চড়ে না।

বেলেঘাটাতেও লজ্জার মাথা খেয়ে এক লম্বা চিঠি দিলাম, এই এই ব্যাপার—অবস্থাগতিকে আমি ঘুণাক্ষরেও আসল কথাটা সন্দেহ করতে পারি নি—বড়ই লজ্জিত—আর বিবাহ করতে নিতান্তই অক্ষম—আমায় রেহাই দিন।

তারা তাড়াতাড়ি সেই দিন সন্ধ্যের সময় এসে আশীর্বাদ ক'রে গেল।

আমি সতেদের বাড়ি ছিলাম; টের পেলে কি আসি? শৈলী চালাকি ক'রে রতনাকে বলে, তোর মামাকে ডেকে আন্, বলবি, মাকে বিছে কামড়েছে, ছটফট করছে, শিগগির এস। শৈলীর সুপুত্র হঠাৎ এসে চোখ মুখ পাকিয়ে বললে, মামা, দিদিমাকে সাপে কামড়েছে, শিগগির ওঠ। বেটা হারামজাদাকে সেদিনে আর পেলাম না যে—

তবুও জেঠাইমাকে বললাম, আমি গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, বিয়ে করব না।

জেঠাইমা বললেন, মা দোষ নেবেন না, প্রাশ্চিত্তির ক'রে নিস।

বললাম, বিয়ের প্রাশ্চিত্তির কি আছে? কিন্তু কে শোনে সে সব কথা!

এই তো কাণ্ড রে ভাই; তাড়াতাড়ি বাসে চাপতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটিয়ে ব'সে আছি। তারপর? কবে এলি নাগপুর থেকে? আছিস কদ্দিন?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সতে? সে কি করলে?

প্রথমটা দিন কতক কথা বন্ধ করলে; তারপর আমার ওপর আক্রোশ ক'রে পর পর দু-দুটো বিয়ে করলে। এখন বউ একটিই আছে, দুটি যমজ ছেলে, একটি মেয়ে।

# বাঘ

যাহা শুনিতেছি, তাহার অর্ধেকও যদি সত্য হয় তো শুধু এখন কেন, আজ সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি বাড়ির বাহির হইতে পারিব না; সেজন্য আপনারা আমায় কাপুরুষ, ভেতো বাঙালী—যা খুশি বলুন।

আমাদের বাড়িটা আপনারা দেখেন নাই। বাড়ির খিড়কির দিকটায় কাঠা পাঁচেক জমির উপর একটা মাঝারি-গোছের বাগান আছে। তাহার শেষ দিকটা জাম আর জামরুল গাছের ডালপালায় বেশ একটু অন্ধকার। একটু যা খালি জায়গা ছিল, সেখানটায় আজকাল একটা বিচালির গাদা তৈয়ার করা হইয়াছে। মোটের উপর সব মিলিয়া জায়গাটা বেশ একটু ঘুপটি-গোছের হইয়া গিয়াছে, রাত্রিবেলায় গাঢ় অন্ধকারের আড্ডা। অবশ্য তার পরেই গয়লা-পাড়ার ঘন বস্তি, তবু ছেলেবেলায় ওই কোণটুকুর কথা রাত্রে ভাবিতে গেলে বরাবরই গা ছম-ছম করিত। আর, সত্য কথা বলিতে কি, এখনও না ভাবিলেই ভাল থাকি। সেইখানে খড়ের গাদার পাশে সন্ধ্যার পর হইতে একটা বাঘ আসিয়া বসিয়া আছে। গোবাঘা না, চিতাও নয়, একটা জাত বাঘ; কিছু নয় তো হাত ছয়েক লম্বা, কাঁচা সোনার মত হলদে রঙের ওপর হাত খানেক করিয়া লম্বা এক-একটা কালো ডোরা, ইয়া খোরালো মুখ, এক-একটা গোঁফ যেন এক-একটা সজারুর কাঁটা। সামনের দুইটা থাবা ছড়াইয়া ঘাড় উঁচাইয়া বসিয়া আছে, পেটের ঢিলাঢালা মাংসটা হাত পাঁচ-ছয়ের একটা গোল জায়গার উপর ছড়াইয়া আছে। বেশ বোঝা যায়, আস্ত একটা মহিষ হইলে, ওই পেটের কতকটা ভরিতে পারে।

তবে বাঘ যে নিতান্ত উপোস করিয়া আছে এমন নয়, একটু

জল-খাবার সারিয়া লইয়াছে। জেওলগাছের বেড়া ডিঙাইয়া আমাদের বাগানে পড়িবার আগে, বুধনী গয়লানীর যে কচি মেয়েটা অষ্টপ্রহর ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া পাড়া মাথায় করিত, সেটাকে জিবে করিয়া তুলিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে,—বুধনী মেয়েটাকে বাহিরের দাওয়ায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের পাট সারিতেছিল। মেয়েটার গায়ে দাঁত বসে নাই, সেই-জন্য বোধ হয়, পেটে গিয়াও ট্যাঁ-ট্যাঁ করিতেছিল, বাঘটা জ্বালাতন হইয়া সেইখান হইতে একটা লাফ দিয়া হরুনী মাহতোর বাড়িতে পড়ে। হরুনীর বুড়ো বাপ বাহিরে বসিয়া ভজন করিতেছিল। শুধু মাংস খাইয়া বাঘের একটু হাড় চিবাইবার ইচ্ছা হয়। হরুনীর বাপের ঘাড়টা ধরিয়া দুইটা ঝাঁকানি দিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া এক লাফে আমাদের বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

টের পাওয়া যাইত না ; ওদিকে গয়লা-পাড়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর সন্ধ্যার পর আমাদের বাগানের দিকেও বড় একটা যায় না কেহ। ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হয় বটে, কিন্তু সেটা যে বাঘ-পড়ারই শব্দ, লোকে কি করিয়া জানিবে? বাঘ তো আর রোজই দুই-দশটা করিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছে না। একটা কলাগাছ মুইয়া গিয়াছিল, সবাই ভাবিল, বোধ হয় সেইটিই ভূমিসাৎ হইয়াছে। নিশ্চিত আছে, এমন সময় কড়-কড়-কড়-কড়-কড়াৎ! সে এক বিকট আওয়াজ —যেমন বিনা ঝড়ে গাছ পড়া, তেমনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

পরে টের পাওয়া গেল, বাজ পড়া নয়—বাঘটা হরুনীর বুড়ো বাপকে দুই থাবা দিয়া মুড়িয়া-সুড়িয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁতের একটা চাপ দিয়াছিল, সমস্ত হাড়গুলা একসঙ্গে চুর হইয়া যাওয়ায় ওই রকম বিকট আওয়াজ হইয়াছে। আশি বছরের বুড়ো হরুনীর বাপ, সোজা কথা নয় তো, হাড়ের পরিপক্কতা দেখিতে গেলে একেবারে দধীচি হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু শব্দের রহস্য ভেদ করিতে যাইয়াই কাল হইল। বাগানের এদিকটায় আমাদের মালী মহিষটাকে জাবনা দিতেছিল, খড়ের গাদার কাছে হঠাৎ এ কি বিপরীত শব্দ! হাতের জাবনা মুছিতে মুছিতে দেখিতে যাইবে—দেখে, অন্ধকারের মধ্যে ঠিক খড়ের পাছটিতে দাউদাউ করিয়া দুইটা আগুনেব ভাঁটা জ্বলিতেছে। বেচারা আর ভাবিতেও সময় পায় নাই, ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহিষের জন্য তোলা বালতিসুদ্ধ সমস্ত জল লইয়া গিয়া একেবারে বাঘের মাথায়। যখন হুঁশ হইল, আগুন নয়—বাঘের চোখ, তখন মালীর নিজের চোখ ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে—ব্যাঘ্ররাজের একটি থাবায়। বাঘের গলায় তখন হরুনীব বাপের উরুর হাডটা ফটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সে বেচারী বোধ হয় সারসের সন্ধানে জলার দিকে পা বাড়াইয়াছিল,—ঢুকিয়া যাইত সব ল্যাঠা, এমন সময় ওই নূতন উপদ্রব! সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়েব উপর থাবাটি বসাইযা একটি চাপ।

ব্যাপারটা আপাতত এইখানেই শেষ হইত। বাগানের এক পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যে এতবড একটা কাণ্ড হইতেছে, কে কি করিয়া জানিবে? বডরা নিজেদের গল্পগুজব লইয়া আছে, ছেলেমেয়েরা নিজেদের পডাশুনা লইযা আছে, কুঁচোবা নিজেদের হুল্লোড় লইয়া আছে। হয় সকালবেলায় ব্যাপারটা সবার জ্ঞানগম্য হইত, কিংবা বাঘ যদি সব নিশ্চিহ্ন করিয়া রাতারাতি সরিয়া পড়িত তো তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। জানাজানি করাইয়া দিল মহিষটা। মালীর নিয়ম ছিল, জাবনাটি ঠিক তৈয়ার করিয়া মহিষটাকে এই খোঁটায় আনিয়া বাঁধিয়া দিত। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটাকে খুলিয়া দিত। বাছুরটাকে একটু পিয়াইয়া মালী দুধ দুহিতে আরম্ভ করিত। এদিকে মহিষ জাবনা খাইয়া যাইত।

তৈয়ারি জাবনার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বাহির হইয়াছে, অথচ খাইতে পাইতেছে না। মহিষটা ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু গুজরাটী মহিষ; এ দেশের দড়িকে মনে ক'রে সুতা, খোঁটাকে মনে করে একটা কুটা, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে চুপচাপ করিয়া বাঁধা থাকে। যখন নিতান্ত আর সহ্য করিতে পারিল না, দিল মাথার একটা ঝাঁকানি। একটা ঘাসের শিকড় টানিলে যেমন নিরুপদ্রবে উঠিয়া আসে, খুঁটিটা সেই রকম ভাবে উঠিয়া আসিল। মহিষ হাঁস-হাঁস করিয়া সমস্ত জাবনটা সাবাড় করিল, তারপর বাছুরটার কাছে গিয়া তাহাকে সমস্ত দুধটা খাওয়াইয়া দিল; এখানকার মহিষ তো নয়,—এক দোহনে পাক্কা সাত সের দুধ দেয়।

বাচ্চাকে খাওয়াইয়া তখন তাহার মালীকে মনে পড়িল। মালীকেও মনে পড়িতে পারে কিংবা জলতৃষ্ণাও পাইতে পারে, মহিষের মনের কথা কে বলিবে? মালীটা জলের বালতি লইয়া যেদিকে গিয়াছিল, জাবনা-ভরা পেটটা দুলাইতে দুলাইতে, জাবর কাটিতে কাটিতে মন্থর গতিতে সেই দিকে অগ্রসর হইল। যেন ওপাড়ার কালোপিসী নেমতন্ন খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে টহল দিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর দুই পা গিয়াই ওই দৃশ্য!

গুজরাটী মহিষ, তায় নূতন বাচ্চা হইয়াছে, বাঘ দেখিয়া রাগে একেবারে কয়লার আগুনের মত গনগন করিয়া উঠিল। বাঘের চোখের আর কি জ্বলন! মহিষের চোখ জ্বলিতে লাগিল যেন মোটরগাড়ির দুটো হেডলাইট; তিনটা করিয়া পাক দেওয়া সিং একেবারে সোজা হইয়া উঠিল, যেন দুইটি বর্শা—লক্ষ্য বাঘের জ্বলন্ত চোখ দুইটি। মাথা গুঁজিয়া, ক্ষুর দিয়া এক আঁচড়ে এক এক কোদাল মাটি চাঁছিয়া পিছনে ফেলে আর গোঁ-গোঁ শব্দ। যেন সেদিনকার মত ঈশান কোণে কালবৈশাখী ঝড় উঠিয়াছে।

বাঘের চোখে পলক পড়ে না, ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, পেটের মধ্যে বুধনীর মেয়ের চিঁ-চিঁ শব্দটুকু পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, হরুনীর বাপকে চিবাইতেছিল ;—একে এমনই শুকনো হাড়ের গাদা, তায় যা একটু আধটু রস ছিল, ভয়ে গলা শুকাইয়া সব একেবারে ছাতু হইয়া গিয়াছে। গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, তবুও মহিষের পানে চাহিয়া কোন রকমে ভয়ে কাঁপা গলায় বলিল, লম্বা লম্বা শিং তোমার—

* * *

বড় বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে।

শুইয়া শুইয়া পাশের ঘরের পানে চাহিয়া বলিলাম, রাণু, বড্ড ভুল করছ মা, কচি ছেলে, ওকে এখন অত উৎকট ভয়ের গল্প শুনিও না। তোমাকে আমি দেখিয়ে দোব বইয়ে যে, ওতে ওদের মনে কি ভীষণ চাপ পড়ে। বাঘটাকেই যথেষ্ট উগ্র করেছিলে, তার ওপর তুমি আবার মহিষটাকে যেমন দাঁড় করাতে চাইছ, তাতে—

রাণু ক্লান্তি ও বিরক্তিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল ; আমার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল, ভয় দেখে যাও মেজকাকা, এততেও ও দজ্জালের চোখে একটু ভয় আছে কিনা ! আর এর বেশি আমার মাথায় আসেও না বাপু। তুমি বইয়ের কথা বলছ ! ওই শোন, আবদার উঠেছে, বাঘ আর মোষের লড়াই দেখতে নিয়ে যেতে হবে। আমি পেরে উঠব না ও ছেলেকে মেজকাকা, সামলাও তোমার নাতি, আমার রাজ্যির পাট প'ড়ে আছে—

# বিপন্ন

এম. এস-সি. পাস করিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে একটি চাকরিও জুটিয়া গেল। বয়স তখন এত অল্প যে, প্রফেসার সেন তাঁহার নিজস্ব প্রথায় অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, শৈলেন, তুমি, যাকে বলে এঁচড়ে পেকে গেলে।

চাকরি—বেহারে কোন একটি কলেজে প্রফেসারি। সত্বর যোগদান করিবার তাগিদও ছিল, তাহার উপর কাকা 'শুভস্য শীঘ্রম্, শুভস্য শীঘ্রম্' করিয়া বাড়িটাতে এমন একটা উৎকট তাড়ানো-ভাব দাঁড় করাইলেন এবং আমি বালকসুলভ অবুঝপনার বশে চাকরিটা হারাইবই জানিয়া শেষ পর্যন্ত এমন নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন যে, বাহালি-পত্র পাওয়ার পরদিনই তাড়াতাড়ি যাত্রা করিতে হইল। তাহাতে খুঁটিনাটি অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যই কেনা হইয়া উঠিল না।

কর্মস্থানে পৌছিয়া বৈকালের দিকে বাজারে বাহির হইয়া গেলাম এবং একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বড় দেখিয়া মনিহারী দোকানে প্রবেশ করিলাম। দোকানটিতে বেশ ভিড়, বেশির ভাগ লোকই দাঁড়াইয়া ; কাউণ্টারের সামনে সারি সারি কতকগুলি চেয়ার পাতা, সবগুলিই অধিকৃত। আমার একটু বসিতে পারিলেই ভাল হইত, কেন না, অনেকগুলি জিনিস লইতে হইবে, বিলম্ব হইবার কথা। এদিক ওদিক চাহিতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল, একটি কোণপানা জায়গায় একটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই তাহার চেয়ারটি ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি এইখানে আসুন না ; দাঁড়িয়ে কেন ?

হিন্দীতে কথা বলিল, তাহা না হইলে বেহারী বলিয়া চিনিবার

উপায় ছিল না। মাথায় আধা-বাবরি-গোছের ব্যাক-ব্রাশ চুল, কোঁচায় কাবুলী-ফেরতা দেওয়া কাপড় পরা, গায়ে বোতামের কালো ফিতা বাহির করা একখানি পাশ-বোতাম পাঞ্জাবি—টায়টোয়ে কোমরের নীচে পর্যন্ত নামিয়াছে, পায়ে নাগরা—এদেশী নয়, যাহা কলিকাতায় গিয়া বাংলার সুকুমারত্বের ছাপ লইয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটু হাসিয়া ইংরেজীতে বলিলাম, না, থাক্, ধন্যবাদ। আমি বেশ আছি।

এক ধরনের খাতির আছে যাহা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র, দেখিলাম এও তাই। তাও কি হয়?—বলিয়া ছোকরা হাসিতে হাসিতে দুই পা আগাইয়া আসিল এবং আমার হাতটা ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিয়া সামনের বিক্রেতাকে বলিল, নাও, আমার এখন থাক্, আগে এঁকে দাও; সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

সন্দেহ হইল, দালাল নাকি? তাই বা কেমন করিয়া হয়? দেখিলাম, কাউণ্টারের উপর তাহার নিজেরই বাছাই করার জন্য এক-রাশ জিনিস রহিয়াছে। কুলেল তৈল, সাবান, আরশি, চিরুনি, কয়েক রকম সুগন্ধি, লেটারপ্যাড, আরও নানা রকম জিনিস—যাহা শৌখিনও, আবার প্রয়োজনীয়ও হয়। ইতিমধ্যে বিক্রেতা কাউণ্টারের ওধার হইতে একখানা চেয়ার তুলিয়া তাহার জন্য এদিকে নামাইয়া দিল। বোঝা গেল, শাঁসালো খদ্দের বলিয়া বেশ খাতির আছে।

আমি বিক্রেতাকে বলিলাম, আগে আমায় একটা স্টোভ দেখাও দেখি; প্রাইমাস হান্‌ড্রেড আছে?

দোকানী বলিল, আছে বাবু, তবে একটু দেরি হবে, সামান্য একটু। আজই বাক্স এসে পৌঁছেছে, প্যাকিং খুলে এখুনি নিয়ে আসছি।—বলিয়া সে ফিরিল; ছোকরা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, খুলে, দাম

খতিয়ে নিয়ে এস, নইলে একটা যা-তা দাম ব'লে একে ঠকাবে—। কিছু তাড়াতাড়ি নেই এঁর।

তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিল, আপনি কি বেশি ব্যস্ত?

বলিলাম, না, তেমন আর কি! তবে ততক্ষণ বরং অন্য একজনকে ব'লে যাক না, আমায় তেল, সাবান, ব্লেড এইগুলো দিক বের ক'রে।

আচ্ছা, সে হচ্ছে। তুই যা শিগগির, দেখিস, যেন আবার মেলা তাড়াহুড়ো ক'রে যা-তা নিয়ে আসিস নি। ও-ই আসুক মশাই, ভাল সেল্‌স্‌ম্যান। সিগারেট খান?

পকেট হইতে একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সামনে ধরিল। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে দিলাম; ছোকরা নিজেও একটা ঠোঁটের মাঝে আলগা করিয়া ধরিয়া কেতাদুরস্তভাবে দেশলাই জ্বালিয়া আমার সামনে ধরিল। তাহার পর নিজেরটা ধরাইয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, স্মোক ইজ মাই প্যাশন।

একেবারে আপ-টু-ডেট!

লক্ষ্য করিলাম, সিগারেট খাইতে খাইতে খুব চকিত এবং সংযত-ভাবে দুই-একবার পাশের জিনিসগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিল এবং নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার ভাবটা দেখিলে সন্দেহ হয়, যেন কি একটা কথা বলিতে চাহিতেছে, অথচ যেন জো পাইতেছে না।

নিতান্ত চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তি কাটাইবার জন্য বলিলাম, ও জিনিসগুলো বুঝি আপনি পছন্দ করবার জন্যে আনিয়েছেন?

মুখের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে বলিল, ঠিক কথা,

এই তো আপনাকে পাওয়া গেছে, দিন তো মেহেরবানি ক'রে আমার গোটাকতক জিনিস পছন্দ ক'রে। বলবেন বোধ হয়, কেন, আপনি নিজে কি পছন্দ করতে পারেন না? পারি, কিন্তু জানেনই তো টু হেডস আর বেটার দ্যান ওয়ান।

আমার মুখে এরূপ একটা অশোভন আপত্তি ধরিয়া লওয়ায় আমি একটু লজ্জিত হইয়াই বলিলাম, সে কি কথা? আমার দ্বারা যদি সামান্য সাহায্য হয় তো আমি বিশেষ আনন্দিতই হব।

সে আমি বাঙালীদের জানি, তাঁদের সম্বন্ধে আমার ধারণাও খুব উচ্চ। আচ্ছা, এই সাবানের কথাই ধরা যাক।

সাবানের বাক্সগুলি একে একে সরাইয়া দিয়া বলিল, এই তো ভিনোলিয়া, ইর‍্যাস্‌মিক, হিমানী, ন্যাসকো, পামঅলিভ, ক্যালকাটা সোপ ওআর্কস, মাইসোর—আরও এই সব কি কি রয়েছে, আপনি কোন্‌টা রেকমেণ্ড করেন?

আমি বলিলাম, মাফ করবেন, বিলিতীগুলির সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। তবে—

ছোকরা ভিনোলিয়া, পামঅলিভ, ইর‍্যাস্‌মিকের বাক্সগুলি সঙ্গে সঙ্গে পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, নিন, বলুন এবার। মানে, ভিনোলিয়া দাবি করে, অমন সফ্‌ট আর ডেলিকেট স্কিন অন্য সাবানে দিতে পারে না। তা যাক গিয়ে; এদিকে আবার স্বরাজও তো চাই মশাই! এখন এগুলোর মধ্যে আপনার কোন্‌টা পছন্দ? এক কোম্পানিরই পাঁচ-সাত রকম আছে। আচ্ছা, আপনি সায়েন্স, না, আর্টস?

বলিলাম, সায়েন্স।

আই. এস-সি.?

না, এইবারে এম. এস-সি. পাস করেছি।

ছোকরা গভীর শ্রদ্ধার সহিত আমার দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, তবে তো কথাই নেই, দি ম্যান ফর ইট। আচ্ছা, সাবানে গায়ের রঙ ইম্প্রুভ করতে পারে? ধরুন—

সেকেণ্ড কয়েক একটু চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর কহিল, ধরুন—এই ধরুন, কেউ যদি পাড়াগাঁয়ে, মনে করুন, এই তেরো-চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে থাকে, জানেনই তো, পাড়াগাঁয়ের ধুলো কাদা মেঠো হাওয়া—এসবের মধ্যে রঙ তো আর ঠিক থাকে না; তা এখন যদি সে রেগুলার্লি সাবান মেখে যায় তো রঙটার জলুস বাড়বে ব'লে আপনাদের সায়েন্স গ্যারান্টি দিতে পারে?

কোথায় ব্যথা এবং আমার এত খাতিরের কারণটাই বা কি এতক্ষণে বুঝিলাম। বলিলাম, কি জানেন? সায়েন্স যে গায়ের রঙ আর সাবানের কথা ধ'রেই কোন বিশেষ কথা বলেছে তা মনে পড়ে না; তবে সাবান জিনিসটা লোমকূপগুলো বেশি পরিষ্কার রাখে, বাইরের ময়লাও জমতে দেয় না, কাজেই গায়ের চামড়ার স্বাস্থ্যটা থাকে ভাল; সেই থেকেই—

ছোকরা গালে হাত দিয়া মাথাটি কাত করিয়া খুব মনোযোগ-সহকারে কথাগুলা শুনিতেছিল; সোজা হইয়া বসিয়া, তর্জনীটা একটু নামাইয়া বলিল, দেয়ার ইউ আর, হয়েছে। আচ্ছা, তা যদি হয় তো এক বার ক'রে সাবান মাখলে যে পরিমাণে উন্নতি হবে, দু বার ক'রে মাখলে তার চেয়ে বেশি উন্নতিই হবে নিশ্চয়, তিন বার ক'রে মাখলে সেই অনুপাতে তার চেয়েও বেশি? চার বার—ছ বার—আট বার—

হায় রে, চোদ্দ-পনেরো বৎসরের গাত্রচর্ম, তোমার বিপদও অনেক! আমি আর না থাকিতে পারিয়া বলিলাম, হেজে যেতে পারে।

ছেলেটি যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ক্ষণমাত্রে সামলাইয়া লইয়া বলিল, না, ছ বার আট বার একটা কথার কথা বলছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাবানপর্ব যেন চাপা দেওয়ার জন্যই একটা তুলিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে এ সাবানটার সম্বন্ধে কি বলেন? কোম্পানিটাও ভাল, গন্ধটাও ডিসেণ্ট—

খুব বড় সাবানবেত্তা বলিয়া আমার কোন কালেই নাম ছিল না; তবু বেচারাকে সপ্রতিভ করিয়া তুলিবার জন্যই বলিলাম, দেখি, হ্যাঁ, এইটিই আজকাল কলকাতায় খুব চলেছে, হট ফেভারিট।

মুখটি পুলকে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বাক্সটা একটু তুলিয়া ধরিয়া এক পাশে নামাইয়া রাখিল, মনে মনে বুঝিবা কাহার দুটি কঙ্কণ-পরা হাতে তুলিয়া দিল। বলিল, এই দেখুন বেয়াদবি, আপনাকে পান অফার করা হয় নি!

পকেট হইতে একটা রূপার ডিবা বাহির করিয়া ডালাটা খুলিয়া ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, জরদা খান?

না।

আচ্ছা, তেল আজকাল কলকাতায় সবচেয়ে কোন্‌টা বেশি চলছে?

সাবান সম্বন্ধে সমস্ত কলিকাতাকে টানিয়া আনিয়া ভাল করি নাই দেখিতেছি; কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ছোকরা বলিয়া উঠিল, অত কথায় কাজ কি, আপনি নিজে কি ব্যবহার করেন তাই বলুন না? আপনারও তো চমৎকার চুল দেখছি।

উত্তর করিলাম, আমার কথা ছেড়ে দিন, যখন যেটা হাতের কাছে পাই, খানিকটা দিই মাথায় চাপড়ে।—বলিয়া একটু হাসিলাম।

ছোকরা নেহাত যেন খাতিরে পড়িয়া মুহূর্তের জন্য মুখটাতে একটু

হাসি টানিয়া আনিল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ব্যস্ততার সহিত জেরা শুরু করিয়া দিল।

আচ্ছা, হাতের কাছে কোন্‌টা বেশি পান?

তার কি কোন ঠিক আছে? কোন দিন হয়তো দিলামই না তেল মাথায়।

নাছোড়বান্দা। ক্ষণমাত্র ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, না হয় অন্য দিক দিয়েই দেখা যাক, সবচেয়ে কম কোন্‌টা পান?

আমি আর একবার হাসিয়া বলিলাম, সেটা আরও বলতে পারি না। যেটা সবচেয়ে বেশি পাই, সেটার কথাই যখন মনে থাকে না, তখন সবচেয়ে কমের কথা কি ক'রে মনে থাকবে বলুন?

আবার একটু অপ্রস্তুত ভাব; একটু মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনাদের সায়েন্স কি বলে, চুলের সঙ্গে তেলের সম্বন্ধ বিষয়ে?

বলিলাম, কেশতৈল সম্বন্ধে সায়েন্স বিশেষ ক'রে কোথাও ব'লে গেছে ব'লে তো মনে পড়ে না। তবে কথা হচ্ছে, তেল-টেল মাখলে, একটু শ্যাম্‌পুইং করলে, চুলটা থাকে ভাল।

ছোকরা আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তর্জনীটা নামাইয়া বলিল, থাকে ভাল। বেশ, এইবার এই দিক থেকে দেখা যাক, কেশতৈল হচ্ছে মোটামুটি তিন ক্লাসের—তিলের, নারকেলের আর এণ্ডির, এই তিনের কোন-না-কোন একটা দিয়ে ভাল কেশতৈল তৈরি; এখন দি কোশ্চেন ইজ, এর মধ্যে কোন্‌টি চুলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল? আপনাদের সায়েন্স কি বলে? ধরুন—। একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, এই ধরুন, আমার এক আত্মীয়া প্রায় তেরো-চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত পাড়াগাঁয়েই ছিল। আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কতটা গাফিল, জানেনই তো। বিশেষ ক'রে বেহারে। এরা আবার

স্বরাজ চায় মশাই! আমার হাতে থাকলে আমি এখন দুশো বছর কিছু দিতাম না। চুল যে সৌন্দর্যের একটা কতবড় অঙ্গ, সেটুকুও যারা জানে না, তারা আবার স্বরাজ চায় কোন্ মুখে মশাই? 'স্বাস্থ্য ভাল, স্বাস্থ্য ভাল' ব'লে যে তার বাপ-মা গুমর করে, তাতে তাদের কি বাহাদুরি? সে তো নেচার দিয়েছে, শুধু চুলটার দিকে তোমরা একটু লক্ষ্য রাখতে পারলে না? শেম!

বেজায় চটিয়াছে। একবার মনে হইল, বলি, আজকাল তো সভ্য এবং স্বাধীন জগতে চুলটা বাদই দিতেছি—বলিয়া স্বরাজকামীদের এবং তাহার "আত্মীয়া"র বাপ-মায়েদের উপস্থিতের জন্য বিপন্মুক্ত করি; কিন্তু কেশের মোহ তাহাকে যেমন পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে এ ধরনের কথায় ফল হইবে না জানিয়া কহিলাম, আপনি যদি তাঁর চুলের উন্নতি চান তো এখনও যে একান্ত না হয় এমন নয়।

ছোকরা ব্যস্তভাবে বলিল, কি ক'বে? আমি এইজন্যেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বাঙালী ব'লেই। আর আমি মশাই, বাঙালীদের একটু ভালবাসি। এদিকে আমরা বলি, বেহার ফর বেহারীজ, ওদিকে আপনারা পাল্টা জবাব দিন, বেঙ্গল ফর বেঙ্গলীজ—এই ক'রে দুটো প্রতিবেশী জাতের মধ্যে ভাবের কিংবা অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে যাক—বাস্, তা হ'লেই স্বরাজ মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে আর কি! নিন, সিগারেট খান। চুলোয় যাক সব; তবে আমাকে আপনার বন্ধু ব'লেই জানবেন।

বলিলাম, বড় আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। বলেছেন ঠিকই, পাশাপাশি দুটি জাতের মধ্যে এ ধরনের মনোমালিন্য থাকা উচিতও নয়, আশা করা যায়, থাকবেও না বেশিদিন। ঠিক কথা, কেশ সম্বন্ধে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যা করেন—

ছোকরা তর্জনীটা উৎসাহভরে টেবিলে ঠুকিয়া বলিল, দেয়ার ইউ আর ; আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করব করব করছিলাম, অথচ লেডিদের কথা তুললে আপনি কি মনে করবেন ভেবে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, তাঁরা কি করেন ? বাঙালী মেয়েছেলেদের কেশসৌন্দর্য নামী। আমাদের এখানে কথায় বলে, 'ছাজা, বাজা, কেশ—তিনে বাংলা দেশ।' 'ছাজা' হ'ল ঘরের ছাউনি, 'বাজা' বুঝতেই পারেন, বাজনা, আর 'কেশ'—এই তিন নিয়ে বাংলা দেশ। আচ্ছা, ধরুন, তাঁরা যে উপায় অবলম্বন করেন, তাতে কতটা পর্যন্ত উন্নতি হতে পারে ? যার চুল কোমর পর্যন্ত কায়ক্লেশে যায়, কতটা নামতে পারে তার চুল ? হাঁটু পর্যন্ত ? নাঃ, হাঁটু পর্যন্ত আর হতে হয় না, টু লেট, কি বলেন ?

নূতন বিবাহ, নূতন সাধ ; নিরাশ করিয়া আর পাপের ভাগী হই কেন ? বলিলাম, চোদ্দ-পনরো আর এমন কি বিশেষ দেরি হ'ল ? এই তো মোটে চুল হবার সময় আরম্ভ হয়েছে।

ছোকরা আমার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে স্মিতবদনে পানের ডিবা বাহির করিতেছিল ; বলিল, আসুন, পান খান। আচ্ছা, চুল কি হাঁটুর নীচেও নামতে পারে ? সে রকম যত্ন নিলে ? এই দেখুন না, এই হেয়ার-অয়েলটার বাক্সের এই ছবিটা।

বেজায় হাসি পাইল। তবুও ভাবিলাম, যাহার এমনই সঙিন অবস্থা যে, তুচ্ছ একটা বিজ্ঞাপনের ছবিকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহাকে দমানো নিতান্ত পাষণ্ডের কাজ। বলিলাম, তুলির টানে যতটা সহজে চুল নীচে নামানো যায়, বাস্তবক্ষেত্রে ততটা আশা করা যায় না, তবে চেষ্টার অসাধ্য তো কিছু নেই।

নিশ্চয়ই, নেপোলিয়ান আল্‌প্‌স ক্রস করেছিলেন কি ক'রে মশাই ?

চেষ্টা ক'রেই তো? তা হ'লে ধরুন পায়ের গুলের নীচ পর্যন্ত? যদি খুব যত্ন নেওয়া যায়, প্রাণপণে? সম্ভব?

বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিতেছে। বিনীতভাবে, যেন এক অনির্দিষ্ট পক্ষের জন্য ওকালতি করিতেছি এই ভাবে বলিলাম, দেখুন, ও-রকম যত্ন নেওয়া কি এক উপদ্রবে দাঁড়াবে না? গোড়ালি পর্যন্ত চুল নিয়ে জীবন কাটানো—খোঁপা ক'রে রাখলে তার ভারে মাথা ঠিক রাখা দায়, খুলে রাখলে পায়ে জড়িয়ে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা।

ছোকরা বোধ হয় ঝোঁকের মাথায় নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধোগতির বহর দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিল, না, ও একটা এমনই জিজ্ঞাসা করছিলাম, কথায় কথায়। কি জানেন, আপনার কোন আত্মীয়ার সৌন্দর্যটুকু যথাসাধ্য বাড়িয়ে যদি একটু উপকার করতে পারেন তো করেন না কি? বললে শুনব কেন? আপনারা, বাঙালীরা, তো এটা একটা কর্তব্যের মধ্যেই ধরেন।

সেই নেহাত গন্ধময় স্থানে, বেচা-কেনার হট্টগোলের মধ্যে রচিত নিভৃতে এই নূতন প্রণয়ীর মূঢ়তা, বিহ্বলতা বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। একবার ইচ্ছা হইল, একটি সুমিষ্ট প্রশ্নের আঘাতে কৃত্রিম অথচ স্বচ্ছ রহস্যটুকু ভাঙিয়া দিয়া ব্যাপারটিকে চরমে আনিয়া ফেলি; শুধাই, আত্মীয়াটি কি ধরনের, অর্থাৎ সৌন্দর্য বাড়াইয়া উপকার করিলে উপকারটি আসলে কোথায় পৌঁছিবে বন্ধু?

কি ভাবিয়া প্রশ্নটা আর করিলাম না।

*　　*　　*

ভালই করিয়াছিলাম।

পরের দিন কর্মে যোগদান করিলাম। প্রিন্সিপ্যাল রায় আমায় সমস্ত কলেজটি একবার ঘুরাইয়া লইয়া দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ঘরে

লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন ; এই ক্লাসেই আমার অধ্যাপনা শুরু।

ক্লাসটির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া হঠাৎ চতুর্থ বেঞ্চের এক জায়গায় আমার চক্ষু সেকেণ্ড কয়েকের জন্য নিরুদ্ধ হইয়া গেল। দেখি, একটি ছোকরা একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া আছে ; চোখে জ্বলন্ত বিস্ময়, তাহাতেই যেন মাথার চিতাইয়া আঁচড়ানো চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, মুখে ছোট্ট একটি গোল হাঁ, বাঁ হাতে কালো ফ্রেমের চশমা—শখের জিনিস, দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য যেন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

কালকের সেই ছেলেটি, দোকানে যাহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম।

রোল কল করিতে করিতে মনে হইল, যে ছেলেটি ৮৮-তে উত্তর দিয়াছিল, সে-ই যেন আবার ৯২-তেও সাড়া দিল। প্রক্সি। আন্দাজে কাহার প্রক্সি তাহাও বুঝিলাম, তবুও দৃষ্টি একবার চতুর্থ বেঞ্চে গিয়া পড়িল। দেখিলাম, সেই কেশবিলাসী ছেলেটির জায়গা খালি, হাজরির বন্দোবস্ত করিয়া কখন নিঃসাড়ে চলিয়া গিয়াছে।

৮৮ এবং ৯২-কে আর একবার ডাকিলেই প্রবঞ্চনাটা হাতে হাতে ধরা পড়িত ; কিন্তু তাহা আর করিলাম না। ভাবিলাম, যাক, আপাতত সেও যেমন বাঁচিয়াছে, আমিও তেমনই একটা প্রবল অস্বস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

# খাঁটির মর্যাদা

বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু যেন বেশি রকম প্রফুল্ল ভাব। এমনই কুকুর বেড়াল দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, আজ আসিয়াই আমার জিমিটাকে টুসকি দিয়া শিস দেওয়ার চেষ্টা করিয়া নাচাইতে লাগিল। বলিল, জাতটা বড্ড নোংরা, নইলে মন্দ নয়, যদি কামড়াবার আর পাগল হওয়ার ভয় না থাকত; আর এই এক ঘাড়ে-ওঠা আর হাত-চাটা রোগ! যা যা, গেট অ্যাওয়ে।

বলিলাম, ব'স্; কি খবর বন্ধু? আজ সকালে ছিলি কোথায় রে? তোর জন্যে আমরা সব ব'সে—ব'সে—ব'সে—

বন্ধু বলিল, তোমাদের কি ভাই? দিব্যি খাচ্ছ-দাচ্ছ আর রাজা-উজির মেরে বেড়াচ্ছ, আগে পড় আমার মত ইয়ের পাল্লায়—। বলিয়া ছোট্ট করিয়া একটু হাসিল।

এটা বন্ধুর পেটেণ্ট বুলি, সরল অর্থ হইতেছে—বিয়ে না করিয়া ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরিয়া বেড়াও তোমরা, আমার প্রযোজন-অপ্রয়োজনের কথা আর কি বুঝিবে বল?

ইহার পরে সামান্য একটা সূত্র ধরিয়া টান দিলে বউয়ের কথা আসিয়া পড়ে। সেসব কায়দা-কানুন আমাদের সব জানা আছে। যখন বন্ধুর মনটা বেশি রকম হৃষ্ট থাকে, আমাদের কিছুই করিতে হয় না, নিজেই সূত্রটা হাতে করিয়া ধরাইয়া দেয়।

সে-ই প্রশ্ন করিল, কই, চশমার কথা জিজ্ঞাসা করলি নি?

বলিলাম, হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কি হ'ল তোর চশমা বন্ধু?

বউ ভেঙে দিয়েছে।—কথাটা বলিয়া এমন ভাবে ফিক করিয়া একটু

হাসিল যে, বেশ বুঝা গেল, ব্যাপারটিতে বঙ্কু বেশ আনন্দ পাইয়াছে। শ্রোতার তরফ হইতে কোন রকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিলেও চলিত, তবুও প্রশ্ন করিলাম, সত্যি নাকি? চোখে কোন রকম আঘাত লাগে নি তো?

বঙ্কু আবার হাসিল; বলিল, যদি লাগতই আঘাত, ধর, যদি নেহাত চোখ দুটো যেতই তো কোর্টে তো আর নালিশ করতে যাওয়া যেত না। ভায়া, এ যে কি হাঙ্গাম, তা তোমরা কি বুঝবে বল? নির্ঝঞ্ঝাট আছ, দিব্যি গায়ে ফু দিয়ে বেড়াচ্ছ, হুঃ।

বলিতে লাগিল, পরশু বলে, আজ সিনেমা দেখতে চল। আমি সোজা ব'লে দিলাম, না। ও অভিনয় দেখা আমার ধাতে সয় না—থিয়েটারই হোক, সিনেমাই হোক বা মিলিটারি প্যারেডই হোক। যে যা নয়, সে তাই সেজে ন্যাকামি করবে, কিংবা ছোট হাজরি খেয়ে এসে গড়ের মাঠে নিরীহ বাঙালীদের দেখিয়ে দেখিয়ে ফাঁকা আওয়াজ দাগতে থাকবে, এসব তঞ্চকতায় যার মন ওঠে উঠুক, বঙ্কার ওঠে না। এর ওপর কোন কথা আছে? নিকুঞ্জ ময়রাও অর্জুন নয়, ভৈরব তেলীর বখাটে ছেলে যতেও কিছু অভিমন্যু নয়, অথচ আসরে সেজে-গুজে ভোল ফিরিয়ে কি বাহবাটাই না লুটছে! তোমরা যখন দেখছ, নিকুঞ্জ অভিমন্যুর মৃত্যুতে ছেলের রূপগুণ ব্যাখ্যানা ক'রে হাপুস-নয়নে কাঁদছে আর খুলে যাওয়া গালপাট্টা এক হাতে চেপে অন্য হাত নেড়ে ভীষণ প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করছে, আমি ততক্ষণে স্পষ্ট দেখছি, অভিমন্যু যতে সাজঘরে পরচুলাটা বগলে ক'রে গাঁজায় দম মারছে। দেখার ভুলে তোমরা দাও বাহবা, আর আসল রূপটি মনশ্চক্ষের সামনে থাকে ব'লে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। যতেকে যদি চিনতে তো বুঝতে পারতে, সপ্তরথীতে মিলে তাকে সাবাড় ক'রে পাড়ার কি

উপকারটাই করেছে! অবশ্য যদি সত্যি সাবড়াতে পারত। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে দুশো লোকে তার মৃত্যুকামনা করছে। আবার আশ্চর্য দেখ, একটা মখমলের সাজ প'রে সেই যতেই মরেছে ব'লে তারাই সব কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, লজিক্যালি দেখতে গেলে যতে যথার্থই ম'ল না ব'লেই যাদের কাঁদা উচিত ছিল। মিছে বলছি ?

সিনেমা দেখতে গেলে—এতে আর্টের আরও কারচুপি, তার মানে ভাঁড়ামি আরও এক পর্দা ছাড়িয়ে। সেবারে কি একটা ইংরিজী সিনেমা দেখে এসে বউ তো রাত্তিরে আহার-নিদ্রাই ত্যাগ করলে এক রকম ; কেবলই—আহা, অমন সতীলক্ষ্মীর এত হেনস্তা ! যত বলি, ও গল্প, ওসব কি ধরতে আছে ? কিন্তু এসা গেঁথে ব'সে গেছে মনে, কিছু কি শুনতে চায় ? শেষে বললাম, তোমার ওই সতীলক্ষ্মী নায়িকার খোঁজ ক'রে দেখতে গেলে একাদিক্রমে বোধ হয় আট-দশটি বিবাহ, তা ছাড়া স্বাধীন প্রেমের পরীক্ষা যে মাঝে মাঝে কত চলছে—

বলতে যা দেরি ! সে আমার যে নাকালটা হ'ল, তা আর ক'য়ে কাজ নেই। হিন্দুর মেয়ে নিজের গা বাঁচিয়ে স্বামী-দেবতাকে যতটা গালমন্দ দিতে পারে সে তো হ'লই, সে রাত্রে অনাহার, তার পরের দিন সাধন ময়রার দোকান না থাকলে তাই হ'ত ; তিন দিন কথা বন্ধ, চার দিনের দিন ঘাট মেনে শান্তি স্থাপন হ'ল, বলে, টের পেলে তো সতীলক্ষ্মীর নামে কুকথা বলার মজা ?

বিদ্যাসাগর মশাই গিরিশ ঘোষকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন শুনেই তোমাদের তাক লেগে যায়, প্রবঞ্চনাটা কতদূর এগুতে পারে বোঝ ! স্বামী-স্ত্রীতে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ !

কি কথায় কি কথা এসে পড়ল ! হ্যাঁ, পরশু বললে, আজ সিনেমা

দেখতে চল। সাফ জবাব দিলাম, কোন মতেই না। যেতেই হবে। আলবৎ যাব না। আমারও মরদকা বাত—একেবারে গ্যাঁট হয়ে ব'সে রইলাম। দাঁতে দাঁত দিয়ে উঠে টেবিল থেকে অ্যাশ-ট্রেটা নিয়ে মারলে ছুঁড়ে জানলায়, আমার চোখ ঘেঁষে সোজা গিয়ে গরাদে লেগে চুরচুর হয়ে গেল। বললাম, চোখটা যেত এক্ষুনি।

উপযুক্তই হ'ত।—ব'লে সিগারেটের টিন থেকে এক গোছা সিগারেট বের ক'রে দু হাতে ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে ঘরময় দিলে ছড়িয়ে। বলে, হিন্দুর মেয়ের ঘরে এসব নেশাপত্র চলবে না। বললাম, বেশ, চলবে না তো চলবে না, আর আসব না এ ঘরে। আরও উঠল আগুন হয়ে; ও গরমের সময় বরফ আর রাগের সময় ঠাণ্ডা জবাব মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। আমার হাতটা ধ'রে মারলে একটা হ্যাঁচকা, দোরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, তুমি যাও বেরিয়ে, এ ঘরে নেশাখোরের জায়গা নেই, হিঁদুর ঘর। আমিও গোঁ ধ'রে ব'সে আছি—বঙ্কার গোঁ বাবা! আস্তে আস্তে আসছি বেরিয়ে, 'ওই নাও তোমার নেশার সরঞ্জাম' ব'লে দিলে সিগারেটের খালি টিনটা ছুঁড়ে। রোলঙে ঠিকরে পায়ে লেগে পড়ল গিয়ে উঠোনে।

আমার জিদটা গেল আরও বেড়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, বটে! তারপর হনহন ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, না, আর নাই দেওয়াটা ঠিক নয়, ঢের হয়েছে।

বঙ্কু মুখটা একটু বাকাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে এক দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি বলিলাম, না গিয়ে ঠিকই করেছিস; ও-জাতের সব কথাতে সায় দিলে—

বঙ্কুর মুখটা মোলায়েম হইয়া আসিল। আমার দিকে না চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তোমাদের কি ভাই? বেপরোয়া জীবন দিব্যি,

কত ধানে কত চাল তা তো জান না ; ব'লে দিলে, না গিয়ে ঠিকই করেছিস। না যাওয়া এমনই মুখের কথা কিনা !

যাক, তোকে কত আর বলব, কতই বা তুই শুনবি ? শেষ পর্যন্ত আমার জিদটা গিয়ে রাগে দাঁড়াল, ঘুরে এসে বললাম, বেশ, চল, যাচ্ছি।

পুরুষকে বোঝা যায় ; কিন্তু কথায় বলে—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—মেয়েমানুষের মেজাজ বোঝাই দায় রে ভাই ! এই এতক্ষণ রেগে কাঁই হয়েছিল দেখলে তো ? আমি যেই রাজি হলাম, সঙ্গে সঙ্গে জিদ ধ'রে বসল, কক্ষনই যাব না। কেন যাবে না ? এই এর জন্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল ! আমি যাব না, আমার খুশি। খুশি আমার।—ব'লে সে এক ঘর-ফাটানো চীৎকার ! সঙ্গে সঙ্গে গলা ভেঙে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, নিজের খোঁপা টেনে ছেঁড়া ; গায়ের ব্লাউজ ছিঁড়ে, ড্রয়ার থেকে সাবান, পাউডার, জরির ফিতে, আলতার শিশি টান মেরে ফেলে দিয়ে, পানের ডিবে আছড়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ল।

বন্ধু থামিল—যেন সদ্যই ওই দুর্যোগটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটু বিশ্রাম লইতেছে।

আমি বলিলাম, যাক, এবার তা হ'লে আত্মনেপদ হ'ল ; তোর জিনিসপত্র এবং পৈতৃক শরীরটা বেঁচে গেল। তবু ভাল।

বন্ধু বলিল, মুখের কথায় তো কিছু লাগে না, অমনই ব'লে দিলে—তবু ভাল। হ'লে টের পাবি রে ভাই, পরস্মৈপদীর চেয়ে আত্মনেপদীর হেপা সামলানো কত শক্ত ! নিজের গায়ে একটা চোটফোট লাগলে তবু ভরসা থাকে, দেখে বোধ হয় একটু মমতা হবে এক সময় না এক সময়। জিদ রাগ মাথায় রইল, খোশামোদ করতে করতে প্রাণান্ত। আর এই সময় খোশামোদই কি কম শক্ত ! কোন্ কথা যে কি ভাবে

নেবে, ঠাহরই হয় না; ওর চেয়ে চার হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করা ঢের সহজ।

যাক, বিস্তর সাধাসাধির পর যেতে রাজি হ'ল; কিন্তু শাসিয়ে দিলে, খবরদার, শেষে কোনদিন যদি খোঁটা দাও যে, জিদ ক'রে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম তো ভাল হবে না। নেহাত অবাধ্য ব'লে লোকের কাছে দুষবে, তাই রাজি হচ্ছি।

ভয়ঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললাম, বাঃ, জিদটা তোমার হ'ল কোন্‌খানটা? গোড়া থেকে নেহাত গোঁ ধ'রে ব'সে আছি, না নিয়ে গিয়ে ছাড়ব না, তাই না যাচ্ছ? দয়া মানে জিদ হ'ল?

বঙ্কিম স্ত্রীর সামনের সেই বিস্ময়ের ভাবটি মুখে ফুটাইয়া কথা বলিতেছিল, আমার হাসি লক্ষ্য করিয়া বলিল, হাসছ? বেশ, হেসে নাও যদ্দিন পার। তখন বললে, যাব তো, কিন্তু আলতার শিশিটা তো গেল তোমার পাল্লায় প'ড়ে।

বললাম, তোমার নিজের দোষ। কেন, বালিশের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে পারলে না? নিদেন আমার গায়ে এসে পড়লেও আমি সামলে নিতে পারতাম তো?

ভয়ে ভয়ে হাসবার চেষ্টা ক'রে একটু ঠাট্টাও ক'রে দিলাম চোখ কান বুজে; বললাম, মনে করতাম না হয়, মানের পালার পর একটু হোলি-খেলাই হয়ে গেল।

ও-ও হেসে ফেললে, মুখ ঘুরিয়ে বললে, নাও, আর রঙ্গ করতে হবে না; কতই জানেন!

পকেট থেকে একটা টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

ফার্স্ট শোতে যাওয়ার সময়ই পাওয়া গেল না; কাজেই যখন বায়স্কোপ দেখে ফিরে এলাম, তখন বারোটা বেজে গেছে। শুতে সাড়ে

বারোটা হয়ে গেল। তখন থেকে ঠায় আড়াইটে পর্যন্ত বায়স্কোপের গল্প শুনে কাটাতে হ'ল—আচ্ছা, ইলা ব'লে ওই মেয়েটির সেইখানটা তোমার কেমন লাগল? সেই যেখানটা ডাক্তারের কথায় অম্লান বদনে নাড়ী কেটে রক্ত দেওয়ার জন্যে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে? নাড়ী কেটে রক্ত দিতে আমার বেশ লাগে, হ্যাঁঃ তোমার যেন কিছু হয়ে কাজ নেই, মা-ওলাইচণ্ডী রক্ষে করুন। কি রকম আস্তে আস্তে নির্জীব হয়ে পড়ল মেয়েটা! আহা, আমার সেই থেকে মনটা এমন হয়ে আছে—সেই আস্তে আস্তে চোখ দুটি বুজে আসছে, সেই ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলবার চেষ্টা, সেই দুবার ডান হাতটি তোলবার চেষ্টা ক'রে হার মেনে ডাক্তারের দিকে চাওয়া, ডাক্তার ভাগ্যিস বুঝে নিয়ে হাতটা সীতেশের কাঁধে তুলে রেখে দিলে! তুলে দিতে চোখ দুটি কেমন বুজে এল আপনি আপনি! শেষকালে যতক্ষণ না হাসপাতালে বেঁচে উঠতে দেখলাম, আমার মনের মধ্যে কি যে হচ্ছিল! আর তোমার মনে?

আমার বোধ হয় চোখ ঢুলে এসেছিল, একটা ঠেলা দিয়ে বললে, ছাই হয়েছিল ওঁর মনে। হ্যাঁ গা, তোমার চোখে ঘুম আসছে আজকে? মনিষ্যি না কি!

আমি সামলে নেবার চেষ্টা ক'রে বললাম, আমার সেই গানের সুরটা কানে লেগে রয়েছে, হাজার চেষ্টা ক'রেও চোখ চেয়ে থাকতে পারছি না। এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি—নিশি ভোর হ'ল শুধু জাগরণে।

বউয়ের গলার স্বর বদলে গেল; আস্তে আস্তে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, এটা সেই বাইজীটার গান না?

ঝাঁ ক'রে আমার ঘুমটা ছুটে গেল। আবার সামলাবার চেষ্টা ক'রে বললাম, হ্যাঁ, পেত্নী বেটীর নাকে-কাঁদুনি; শুনে আমার এমন মাথা

ধ'রে গেছে, যে, কোন মতেই চেয়ে থাকতে পারছি না। ঠিক এই ভুরুর ওপরটা যেন—

বউ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর চিপটেন কেটে বললে, দেখ, আমি কচি খুকীটি নই। কিছু কিছু বুঝি। এসব কথা ব'লে কি আর মেয়েছেলেদের ঠকানো যায়? ওঁর মাথা ধ'রে গেছে, তাই চোখ চাইতে পারছেন না! আসলে সে মাগী তোমার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। সীতেশবাবুকে প্রায় শেষ করেছিল, এবার তোমার দফা নিকেশ করতে বসেছে।

শাসিয়ে বললে, কিন্তু স্থির জেনো, আমি ইলার মত নাড়ী কেটে রক্ত দিতে পারব না। ঘুমোও, আর বড়বড় ক'রে ব'কে আমায় জ্বালিও না। উনি পেত্নী দেখেছেন! আমার চোখে ধূলো দেবে, না?

আমার বেজায় রাগ হ'ল। এ কি ব্যাপার! প্রতিজ্ঞা ভেঙে খোশামোদ ক'রে নিয়ে গেলাম। এককাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ, তার ওপর প্রায় দু ঘণ্টার ওপর ব'সে যেন পিঁজরেয় বন্ধ হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা; তার পুরস্কার গিয়ে এই দাঁড়াল? একেবারে চরিত্র নিয়ে সন্দেহ?

পাছে রাগের মাথায় উৎকট একটা কিছু ক'রে বসি, এই ভয়ে আর কোন কথা কইলাম না। রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চা-টা সারলাম পুরন্দরের বাড়ি, সেইখানে প্রায় নটা পর্যন্ত কাটিয়ে মনে করলাম, এইবার বাড়ি যাওয়া যাক। গিয়ে কি দেখলাম বল তো?

কি জানি, বুঝি মনস্তাপে—

বন্ধু একটা কঠিন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, হয়েছে। মনস্তাপ! না প'ড়েই সব বিদ্বান হয়েছে কিনা! মনস্তাপ ওর শত্রুর হোক। গিয়ে দেখি, নীচে ঝিটা থামে ঠেস দিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

উনুনে আঁচ পড়ে নি। বেড়ালটা ধীরে-সুস্থে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিচ্ছু নেই, চুরিও করতে হয় নি, না-হক লোক দেখেই বা ভড়কাতে যাবে কেন? ঝিকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি যাচ্ছেতাই ক'রে, জিজ্ঞেস করলাম, বউ কোথায়? বললে, ওপরে। সেই রাগ মাথায় ক'রে ওপরে উঠে গেলাম। দেখি, বউ শোবার ঘরে শোফাটায় হেলান দিয়ে ব'সে, টিপয়ে একটা হাত আলগাভাবে ফেলে রেখে জানলার বাইরে চেয়ে আছে।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সিনেমার একটা দৃশ্য মনে প'ড়ে গেল। সীতেশ এক মাস কোন চিঠিপত্তর না দিয়ে আজ বাড়ি এসেছে, ইলা ঠিক এই রকম ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে ব'সে আছে। সীতেশ এসে ঘরে ঢুকল, তারপর একচোট নানা রকম বিটকেল পশ্চার দেখিয়ে শোফার এক পাশটিতে বসল; তারপর মানভঙ্গের সে এক পালা!

আমার দুঃখে রাগে ঘেন্নায় মনটা যে কি ক'রে উঠল বলতে পারি না। আমি দশটা পর্যন্ত বাড়ি নেই, পরের বাড়ি চা খেয়ে বেড়াচ্ছি, সমস্ত রাত চক্ষে ঘুম নেই, আর ও কিনা ব'সে ব'সে অভিমানের পোজ অভ্যেস করছে! যে অভিনয়কে, ন্যাকামিকে, আদিখ্যেতাকে আমি এত ঘেন্না করি, শেষকালে তাই কিনা আমার বাড়ির মধ্যে! ওর আমি কি অত্যাচার, কি আবদারই না সইছি! ঝগড়াঝাঁটি, গালমন্দ, ছেঁড়া-ছিঁড়ি—কোন্‌টা বাদ যাচ্ছে? কখনও কখনও রেগেছি বটে, সেটা ব্যাটাছেলের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু মনে গ্লানি উপস্থিত হয় নি আজ পর্যন্ত; তার কারণ কি—না, সেগুলো ওর মনের খাঁটি অভিব্যক্তি, অভিনয় নয়। সেই ও কিনা আজ—

বন্ধু একটু গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, তক্ষুনি

ফিরলাম, মনে মনে কড়া দিব্যি করলাম, সমস্ত দিন আর বাড়িতে পা দোব না; থাক্ ও ওর থিয়েটারী পোজ নিয়ে।

ঠিকই করেছিলি।—বলিয়া আমি বন্ধুর কার্যের সমর্থন করিতে যাইতেছিলাম; আমার কথায় কান না দিয়া বলিল, কিন্তু সিঁড়ির কাছে এসে মনে হ'ল—এ ঠিক হচ্ছে না; পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে চলবে না তো, ঠিক ক'রে বুঝে নিতে হবে—ব্যাপারটা খাঁটি, না, মেকী —সত্যিই মনে দুঃখ হয়েছে, না, অভিনয়; একেবারে কৃতনিশ্চয় হয়ে তারপর অন্য ব্যবস্থা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা বের করতে হবে।

আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে সোফার ধারে ওর পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম, ঠিক সীতেশ যেমনটি ক'রে এক মাস পূরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল—অবশ্য যতটা পারলাম। বুঝলে—এসেছি, কিন্তু ফিরে চাইলে না। আমি তখন একটু সামনে এগিয়ে গেলাম, ও-ও ঠিক সেই পরিমাণ অন্য দিকে ঘুরে গেল। ঠিক মিলে যাচ্ছে—ইলার নকল। দুঃখে বিরক্তিতে আমার গা জ্ব'লে যাচ্ছে, কিন্তু ছাড়লাম না। একটু মুখে হাসি টেনে এনে সোফাটা ঘুরে সামনে এসে দাঁড়ালাম। বউ জানলার উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল: হুবহু সীতেশ-ইলা, আর কোন সন্দেহই নেই; পাশ ঘেঁষে সোফাটাতে ব'সে পড়লাম, কোণটাতে স'রে গিয়ে সোফার হাতলে মাথা গুঁজড়ে দিলে। বুঝতে পারছ তো? তুমি সব সিনেমাতেই অভিনয়ের এই মার্কা-মারা অভিনয় দেখতে পাবে— পেটেণ্ট। ইংরিজী ফিল্‌ম থেকে বাংলা ফিল্‌মে এসেছে, সেখান থেকে এখন বাঙালীর ঘরে ঘরে ঢুকছে; ভীম-দ্রৌপদীই বল, আর সীতেশ-ইলাই বল, ওই এক জিনিস—সোফার চারিদিকে ঘোরাঘুরি।

আমি মনের রাগ মনে চেপে স্থির ক'রে ব'সে আছি, শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। ঘুরে মাথা গুঁজড়ে বসতেই আমি আমার ডান হাতটা

ওর ডান হাতের চুড়ির ওপর তুলে দিলাম, তারপর বাঁ হাতটা পিঠের ওপর দিয়ে সীতেশী স্টাইলে যেই খোঁপার ওপর রাখব, বাস্, আর কোথায় আছে! বন্ ক'রে ঘুরে গিয়ে দিলে টিপয়টা লাথিয়ে ঠেলে, সেটা ছিটকে গিয়ে একটা ঠ্যাং ভেঙে গড়িয়ে পড়ল; তারপর উঠে আমার চশমাটা টেনে নিয়ে মারলে আছাড়, চুরচুর হয়ে কাচগুলো ছড়িয়ে পড়ল—ষোল টাকা দামের চশমা। তারপর আমার ফাউণ্টেন-পেনটা পকেটসুদ্ধ ছিঁড়ে টেনে ফেলে, বোতামগুলোয় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে, কেঁদে চেঁচিয়ে সে এক মহামারি কাণ্ড ক'রে তুললে; তাতেও যখন আশ মিটল না, আমি সাবধান হবার আগেই—'খোঁপায় টান দিলে কেমন লাগে এই দেখ—দেখ এই'—বলে আমার সামনের চুলটা দু মুঠোয় ক'ষে ধ'রে দুটো কড়া ঝাঁকানি দিয়ে, আছড়ে সোফায় প'ড়ে ফোঁপাতে শুরু ক'রে দিলে। বড় জোর দুটি মিনিট—কিন্তু ঘরে যেন একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল।

বন্ধু চুপ করিয়া উত্তেজনায় অল্প অল্প হাঁপাইতে লাগিল।

আমি মেয়েছেলের এতটা স্পর্ধায় একটা রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ বন্ধুর মুখে প্রসন্ন হাসির উদয় দেখিয়া থামিয়া গেলাম। বন্ধু আমার হাত হইতে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা লইয়া হাসি-মুখেই বলিল, বুঝতে পারলি তো?

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু সিগারেটে একটা টান দিল, তাহার পর হাসিতে একটু ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া বলিল, এইটুকু আ। বুঝলি নি?—বোকা! অভিনয় নয়, খাঁটি জিনিস। আমারই ভুল হয়েছিল; অভিনয় হ'লে কি আর মাথার চুল ধ'রে হ্যাঁচকা টান মারে!

সেই থেকে ভাই, মনটি এমন হাল্কা হয়ে আছে, কি বলব! একবার

ভেবে দেখ্‌ না, সন্দেহে সন্দেহে একেবারে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলাম—সোজা কথা!

অনেকক্ষণ পরে, বিস্তর সাধ্যিসাধনার পর ঠাণ্ডা হ'ল, কথা কইলে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, কি চাই বল?

বললে, পদ্মলতা পাড়ের শাড়ি।

মনে পড়ল, ফিল্‌মে ইলা ওই রকম একখানা শাড়ি পরেছিল বটে। তা হোক, দিলাম একখানা এনে।

বলিয়া বন্ধু খুব পরিতৃপ্ত একটি হাসি হাসিয়া, সামনের চুলগুলা ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলিয়া দিতে লাগিল।

তাহাদের গোড়ায় যেন খাঁটি সুখের আমেজ তখনও লাগিয়া আছে।

# নির্বাসিত

রাত্রি প্রায় এগারোটা।

'শহরের এ প্রান্তে আজ একটা ব্ল্যাক-আউট অর্থাৎ দীপ-নির্বাণ-পব ছিল। ঘণ্টা দুয়েক ঘুটঘুটে অন্ধকারের পর এইমাত্র আলো জ্বালা হইয়াছে। শুধু আলো নিবানো নয়, সব রকম আওয়াজ পর্যন্ত চাপিয়া লোকেরা এক রকম জবুথবু হইয়া বসিয়া ছিল। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ কলোচ্ছ্বাসটা আবার চতুর্গুণ বেগে জাগিয়া উঠিল। কলিকাতার এ চাকলাটাকে যেন রাহুতে গ্রাস করিয়াছিল, মুক্তির পর আবার উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

অম্বিকা গাঙ্গুলী পার্কের ধারে ধারে ফুটপাথ দিয়া ঠুকঠুক করিয়া আসিতেছিলেন। মনটা অত্যন্ত অপ্রসন্ন, নিতান্ত একটা বাজে হুজুকে দাবা-খেলাটা আজ বন্ধ গেল। বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম—এক হিসাবে। আর একবার বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, কিন্তু এ রকম বাজে কাজ নয় বলিয়া ওরই মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। সেবার নেহাত তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এক-আধ দিনের নয়, সাঁইত্রিশ বৎসরের পুরানো স্ত্রী,—এগারো বৎসরে বিবাহ করিয়াছিলেন, আটচল্লিশ বৎসরে গেলেন মারা। তবুও বাদ দিতেন না; 'হাঁ' 'না' করিতে করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন আড্ডায়; কিন্তু যাহার সঙ্গে দাবা-খেলা, সেই ভৈরব হালদার তাঁহার মৃতা পত্নীর জন্য এমন শোকাচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, তাহার উপর দাবা-খেলার কথা তোলা নিতান্ত কি রকম দেখাইত যেন। চক্ষুলজ্জা বলিয়াও একটা জিনিস আছে তো? তাহা ছাড়া, একটা অনিষ্ট যে ঘটিবেই, এই বিশ্বাসে আরও মনটা তিক্ত হইয়া আছে। কবে কে আসিয়া দুইটা বোমা ফেলিবে না-ফেলিবে,

সেই ভয়ে এখন হইতে অন্ধকার করিয়া বসিয়া থাকিয়া এই রকম ভাবে চোর-ডাকাতদের সুবিধা করিয়া দিলে তাহারা দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে। আজ এই দুই ঘণ্টার মধ্যে কত কি হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়, কালকের কাগজেই খবর পাওয়া যাইবে। কেন যে এই 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো'!

শুধু তাই? আজকে আবার হল্যাণ্ডে প্যারাশুট বাহিয়া সৈন্য নামিবার যা সব খবর পাওয়া গেল, যদি এই অন্ধকারের সুযোগ লইয়া আকাশ হইতে—

চিন্তাটাকে জোর করিয়া এইখানেই স্থগিত রাখিয়া গাঙ্গুলী মশাই পা চালাইয়া দিলেন। মোটা মানুষ, দুশ্চিন্তায় পরিশ্রমে ঘামিয়া একশা হইয়া যাইতেছেন।

বাড়ির গলির সামনে আসিয়া বড় রাস্তাটা পার হইলেন। গলিটার মুখটায় আলো একটু কম, দুই দিক হইতে দুইটা মাঝারি সাইজের গাছের ডালপালা গলির মুখটাকে একটু চাপিয়া দিয়াছে। একটা গাছের গুঁড়ির চারিদিকে তারের জাল দিয়া ঘেরা। পাশে একটা পানওয়ালা বসে, সে তারের জালের উপর একটা ছেঁড়া চট শুকাইতে দিয়াছে। সেইখানটা অন্ধকার একটু জমাট। পানওয়ালা ব্ল্যাক-আউটের হিড়িকে দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চটটা তুলিতে ভুলিয়া গিয়া থাকিবে।

রাস্তা পার হইয়া গলিটায় প্রবেশ করিবেন, তারের বেড়ার ও-পাশটায়, অর্থাৎ অন্ধকার দিকটায়, একটা হাঁচির আওয়াজ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। অমন বেয়াড়া জায়গায় হঠাৎ হাঁচে কে? মনে হয়, গা-ঢাকা দিয়া আছে; অথচ হাঁচিল, যেন একটা বাজ পড়ার শব্দ হইল। বেড়াটার পাশ দিয়া চটের আড়ালে দৃষ্টি পড়িতেই

চক্ষুস্থির! একটি অদ্ভুত ধরনের পোশাক-পরা ষণ্ডাগুণ্ডা-গোছের মানুষ বেড়ার ঠিক পাশটিতে দুই হাঁটু তুলিয়া তাহার মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া হাঁটু দুইটা দুই হাতে জড়াইয়া বসিয়া আছে। মাথায় বিলাতী হেল্‌মেট টুপির উপর কতকটা শুঁড়ের মত পিতলের কি একটা আঁটা, দেখিতে অনেকটা ফায়ার-ব্রিগেডের টুপির মত। গায়ের জামাটা একটু নূতন ধরনের। মিলিটারি কোট বা ওইরকম ধরনের কিছু নয়। খুব হালকা কোন একটা কাপড়ের হাতকাটা জামা, খাকী রঙের বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বেশ ভাল রকম বোঝা যাইতেছে না। গলার কাছটা অনেকটা খোলা। এদিকে নামিয়াছে উরুর প্রায় আধাআধি, মাঝখানে একটা পটি।

লোকটা রাস্তার পানে মুখ করিয়া, অর্থাৎ গাঙুলী মশাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া, বসিয়া আছে। কোমরে কি পরিহিত, পিছন হইতে ঠিক বোঝা যায় না। একবার মনে হয়, হাফ প্যাণ্ট; একবার মনে হয়, না, হাইল্যাণ্ডার গোরারা যেমন কতকটা ঘাঘরা-গোছের একটা জিনিস পরে, এও সেই রকম একটা কিছু। এসবের উপর কাঁধ হইতে নীচে পর্যন্ত একটা চাদরের মত ঝলঝল করিতেছে। কোমরে একটা খাপ ঝুলিতেছে, তাহাতে ছোরা আছে, কি পিস্তল আছে, বোঝা যাইতেছে না। প্রথমটা দারুণ বিস্ময় হইল, এ পোশাকই বা কোথাকার? এমনভাবে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছেই বা কেন, এই বেয়াড়া জায়গায় আর এই অসময়ে? গাঙুলী মহাশয় দাঁড়াইয়া মুঠার উপব চিবুকটা চাপিয়া, লোকটার দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলেন। সাড়া-শব্দ নাই। একটু গলা-খাঁকারি দিলেন। সাড়া-শব্দ নাই। এসব অঞ্চলে, এই সময় এক-একবার এমন হয় যে, দুই-চার মিনিট বোধ হয় লোকই থাকে না ফুটপাথে; কাহারও সঙ্গে

যে একটা পরামর্শ করিবেন, তাহারও সুবিধা হইতেছে না। আর একবার গলা-খাঁকারি দিয়া কোন রকম শব্দ না পাইয়া দুই পা আগাইয়া দেখিতে যাইবেন, একটা কথা মনে পড়িয়া সমস্ত শরীরটা যেন একেবারে হিম হইয়া গেল। ঠিক যা ভাবিয়াছেন তাই—নিশ্চয়, অকাট্য। গাঙুলী মহাশয় অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলিলেন, কি সব্বনাশ, এখানেও! খুব সন্তর্পণে দুই পা পিছাইয়া সরিয়া আসিলেন এবং আর একবার ঘাড় বাঁকাইয়া মূর্তিটিকে দেখিয়া লইয়া হনহন করিয়া পা চালাইয়া দিলেন। শুধু পিছন ফিরিয়া এক-একবার দেখা, তারপর যত জোরে পা চলে—। মুখে এক-একবার শুধু অস্ফুট—'কি সব্বনাশ, এখানেও!' শেষে তাহাতেও হইল না, অর্থাৎ আরও খানিকটা হাঁটিয়া যে একেবারে বাড়ি গিয়া উঠিবেন, সে সাহসটুকুও অবশিষ্ট রহিল না। ছকড়ির ডিস্পেন্সারিটা খোলা দেখিয়া আর একবার পিছনে দেখিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়িলেন।

ছকড়ি আর কম্পাউণ্ডার দ্বারিকবাবু একই সঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কি, গাঙুলীকাকা যে, ব্যাপার কি? এ রকম হন্তদন্ত হয়ে? এত রাত্তিরে?

নেমেছে।—বলিয়া গাঙুলী মহাশয় একেবারে কাউণ্টারের ও-পাশে গিয়া বলিলেন, নেমেছে, শিগগির দোর বন্ধ ক'রে দাও, সবগুলো।

নেমেছে কি কাকা?

গাঙুলী মহাশয় একটা ডেক-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, কি? প্যারাশুট। নাববে না? তাদের সুবিধে ক'রে দিলে তারা নাববে না? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে তারা তোমাদের মত? কর ব্ল্যাক-আউট—

দুইজনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, প্যারাশুট? কোথায় কাকা?

ছকড়ি প্রশ্ন করিল, জার্মান প্যারাশুটিস্ট্?

গাঙুলী মহাশয় খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, জার্মানরা এতদূর কি করতে আসবে? ইটালিয়ান। বম্বের কাছে 'পাঠান' জাহাজটাকে কি জার্মানরা ডোবাতে এসেছিল? কিন্তু তুমি আগে দোর-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দাও দ্বারিক। নাঃ, কি দরকার ছিল এ ব্ল্যাক-আউটের বল তো?

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এবং গাঙুলী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া ইহারা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা। দ্বারিকবাবু দুয়ারটা বন্ধ করিতে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া একবার বাহিরে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, রোঁদেব পুলিস আসছে।

দুইজনের মুখে একটু ভরসার ভাব ফুটিল। ছকড়ি বলিল, ডাকুন।

২

গাঙুলী মহাশয় আর গেলেন না, জায়গাটা বুঝাইয়া দিয়া দ্বারিক-বাবুর সঙ্গে দোকানে বসিয়া রহিলেন। ছকড়িকে বলিয়া দিলেন, বেশি কাছে যেও না, বেশি ঘাঁটিও না। আগে দেখ, দেখাই পাও কি না! সেদিনে দেখলে তো খবরের কাগজে, ওদের প্রত্যেকটি লোকের কাছে সাইকেল থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁবু, রেডিও, মেশিনগান কিছুই বাদ থাকে না। আর যদি পাওই দেখা, তো যা বলে মেনে নিও বাপু, কাজ কি?

দূর হইতেই দেখা গেল, গলির মোড়ে ছোটখাটো একটি ভিড় জমিয়াছে। তাহাদের মধ্য দিয়া পুলিস ছকড়ির সঙ্গে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস আসিতেই নালিশে ব্যাখ্যানে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। টের পাওয়া গেল—লোকটা কি জাতি, কিই বা উদ্দেশ্য তাহার কিছুই টের পাওয়া যায় নাই, তবে এইটুকু পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে মাতাল। লোকেরা চারিদিক হইতে নানা রকম প্রশ্ন করিলে কোন উত্তর না দিয়া ওই রকম গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকে। তখন পিছনে কোথা হইতে একটি ছোট্ট কাঁকর আসিয়া তাহার পিঠে পড়ে। ইহাতে লোকটা একেবারে ক্ষেপিয়া যায় এবং এলোপাতাড়ি সবাইকে পিটিবার চেষ্টায় কয়েকবার নিজেই গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া ওইভাবে বসিয়াছে। জাঁদরেল চেহারা আর অদ্ভুত সাজগোছ দেখিয়া কেহ আর কাছে যাইতে সাহস করিতেছে না।

পুলিস একটু দূর হইতেই একবার ঝুঁকিয়া, একবার সিধা হইয়া, ডাইনে বাঁয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বীরের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কোন্ মুলুককা আদমি হ্যায়, কুচভি মালুম নহি কর্ সকা ?

উত্তর হইল, কি ক'রে মালুম হবে ? ওই একভাবে সেই থেকে ব'সে আছে, জিজ্ঞেস করলে না উত্তর দেয়, না কিছু, ক্রমেই মাথাটা যেন কোলে গুঁজড়ে যাচ্ছে।

ছকড়ি প্রশ্ন করিল, যখন উঠে মারতে এসেছিল, তখন কি ভাষায় গালাগালি করেছিল শোনেন নি একটু খেয়াল ক'রে ?

লোকটা বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিল, তাই কি পারে মশাই কেউ ? সে মোদো মাতাল, ছোরা নিয়ে তাড়া করছে—সেদিকে লক্ষ্য না রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে তাই বিভোর হয়ে শুনব ? আপনি যে অবাক করলেন !

ছকড়ি লোকটার পানে কটমট করিয়া একবার চাহিল। অন্য

একজনকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, যখন উঠেছিল, হাতে ভাঁজ-করা ছাতার মত কিছু ছিল ?

বিস্মিত প্রশ্ন হইল, ভাঁজ-করা ছাতা ?

হ্যাঁ, যা নিয়ে আকাশ থেকে নামা যায় ?

আজ্ঞে না মশাই, এমন কিছু দেখি নি। কই, তোমরা কেউ দেখেছ নাকি হে ?

হেল্‌মেট হ্যাটের দিকে দেখাইয়া বলিল, মাথায় ওই ছাতার মত একটা টুপি আছে, ওটা মাথায় দিয়ে আকাশ থেকে নামা যায় তো বুঝুন।

বোধ হয় অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধভাবে ছকড়ির পানে আড়চোখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করেন ?

ছকড়ি তাহার দিকেও এবার কটমটভাবে চাহিয়া পুলিসটাকে কি বলিতে যাইতেছিল, একটি ছোকরা আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ মশাই, আপনি কি বলতে চান, এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুট ধ'রে নেমে এসেছে ?

ছকড়ি বলিল, আপনাদের কি সন্দেহ আছে ?

ছোকরা পিছাইয়া একটু ভিড়ে মধ্যে ঢুকিয়া গেল। প্রশ্ন করিল, কিন্তু প্যারাশুট কোথায় ? আর ওদের সঙ্গেতে ভাঁজ করা সাইকেল, রেডিও-সেট, তাঁবু, মেশিনগান—আরও কি কি সব থাকে ? সেদিন খবরের কাগজে ছবি দেখলাম।

ভিড় আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ছকড়ির চারিদিকে চাপ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। প্যারাশুটের ব্যাপারটা বোঝে কয়েকজন ; যাহারা বোঝে না, তাহারা বুঝিয়া লইয়া শঙ্কিতভাবে নানা রকম জল্পনাকল্পনা করিতে লাগিল। যেমন কিছু কিছু লোক খসিতে লাগিল, তেমনই মুখে মুখে

কথাটা প্রচার হইয়া তাহার চেয়ে অধিক লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। লোকটা যে প্যারাশুট হইতে অবতরণ করিয়াছে—এ সম্বন্ধে অল্প লোকেরই সন্দেহ রহিল। একজন তারের বেড়ায় ছড়ানো চটটাই প্যারাশুট বলিয়া অভিমত দিল; একজন বলিল, অন্তত প্যারাশুটের একটা অংশ হইতে পারে। সবাই যে বিশ্বাস করিল এমন নয়, তবে যাহারা বিশ্বাস না করিল, তাহারাও বেশ খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া ইহাদের প্যারাশুট সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতা লইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মোট কথা, নানা রকম আন্দাজী অভিমতে, শঙ্কিত বিদ্রূপে জায়গাটা গমগম করিয়া উঠিল।

রোঁদের পুলিস লাঠি দিয়া দূর হইতে চটটাকে পরীক্ষা করিতে যাইতেছিল, একজন বলিল, ওসব কিছু ছুঁয়ে-টুঁয়ে কাজ নেই সিপাহীজী, ওদের কোন্‌খানে কি লুকুনো আছে! বোধ হয় ওর মধ্যে থেকেই নাড়া পেয়ে একটা বোমা খ'সে প'ড়ে রাস্তা, বাড়িঘরদোর, মানুষ—স—ব—

পুলিস লাঠিটা সরাইয়া লইল। লোকটা বলিল, হ্যাঁ, কাজ নেই, আমি বলছিলাম, থানায় একটা টেলিফোন—

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, থানার চেয়ে একেবারে লালবাজারে—

একজন গলা বাড়াইয়া বলিল, সবচেয়ে ভাল হয় একেবারে কেল্লায় ফোন ক'রে দেওয়া—Come at once with—

ছকড়ি প্রশ্ন করিল, টেলিফোন এখানে আছে কারও বাড়ি?

ফোন একটু দূরেই তেতলা বাড়িটাতে আছে, কিন্তু দেবে কি ব্যবহার করতে?

পুলিস বীরদর্পে পা বাড়াইয়া বলিল, আলবৎ দেগা।

খানিকটা ভিড় সমেত কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছে, একটা চ্যাংড়া-গোছের ছোকরা বুড়া আঙুল চুষিতে চুষিতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সামনে আসিয়া বলিল, জমাদার-সাহেব, লোকটা 'ওফ' ক'রে একটা আওয়াজ করলে এই মাত্তোর।

ভিড়ের মুখ আবার ফিরিল, পুলিস প্রশ্ন করিল, কোন্ ভাখামে?

'ওফ' শব্দটা বিশেষ কোন্ ভাষার খাস সম্পত্তি বুঝিতে না পারিয়া ছেলেটা একটু থতমত খাইয়া গেল। বুড়া আঙুল চোষা বন্ধ করিয়া একটু যেন চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, হিন্দীতে। আবার কাঁদছেও যেন।

একজন লোক প্রশ্ন করিল, কাঁদছেও হিন্দীতে?

ছেলেটা বলিল, হুঁ, ফোঁপাচ্ছে।

ফোঁপাইতেছে এমন আসামীকে পুলিসে কখনও ভয় করে না; লাঠিটা ঘাড়ে ফেলিয়া বলিল, চলো, দেখে।

ছোঁড়াটা আগে, তাহার পিছনে পুলিস, তাহার ঠিক পিছনে হুকড়ি, ভিড়ের আর সবাই আগে পিছে। ছোঁড়াটা একেবারে সামনে গিয়া নিজের হাঁটুতে দুই হাতে ভর দিয়া লোকটাব সামনে নীচু হইয়া দাঁড়াইল, তাহাব পর ঘাড়টা বাঁকাইয়া আরও নীচু করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, এখনও বোধ হয় কাঁদছে।

তাহার সাহস দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং লোকটা কিছু করিল না দেখিয়া আরও বিস্মিত, খানিকটা আশ্বস্ত এবং বেশ খানিকটা লজ্জিত হইল। পুলিস ছোঁড়াটার পাশে আসিয়া প্রশ্ন করিল, এই, তুম কোন্ হ্যায়, কাঁহা রহতা হ্যায়?

কোন উত্তর হইল না; তবে লোকটা মাথা তুলিল একটু। তখনই অবশ্য নামাইয়া লইল; কিন্তু যাহারা কাছে ছিল, উহারই মধ্যে মোটামুটি

এক রকম দেখিয়া লইল। রাঙা টকটকে মুখ, গোঁফদাড়ি কামানো, হেল্‌মেট টুপির নীচে কয়েকটা কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ—যাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ তাহাদের মনে হইল, চুলের রঙটা একটু যেন পিঙ্গল।

মোট কথা, প্যারাশুট লইয়া নামুক আর নাই নামুক, লোকটা যে ভিন্‌দেশী এবং ইউরোপীয়, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় একটি লোক তারের বেড়ার চটটাও টানিয়া লইল। না, সেটাও প্যারাশুট নয়, কাপড়ের যাহাতে গাঁটরি বাঁধা হয় সেই রকম নিরীহ আটপৌরে চটই। পুলিসও দেখিল।

আরও কড়া সুরে হুকুম হইল, বোলো, কৌন হ্যায় তুম, কাঁহা ঘর হ্যায় ?

লোকটা হঠাৎ আর একবার মুখটি তুলিয়া স-কারবহুল কি একটা কথা যেন বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই ঘাড়টা আবার লুটাইয়া পড়িল, এবং কথাটা ক্রমেই অস্ফুট হইতে হইতে মুখে মিলাইয়া গেল।

একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া ইংরেজীতেও নানা ভাবে প্রশ্ন করিল। কোন উত্তর নাই।

ছকড়ি বলিল, ওতে হবে না, একে ভাষা বুঝতে পারছে না, তায় বেজায় মদ খেয়ে রয়েছে। ওকে থানায় নিয়ে চল। কাল ধাতস্থ হ'লে কোন জার্মান বা ইটালিয়ান কয়েদী ধ'রে নিয়ে এলেই বাছাধনের জাতকুল বেরিয়ে পড়বে। তবে আমি ব'লে দিচ্ছি, ও ইটালিয়ান, আগেকার গ্রীক-রোমানদের মত পোশাক ওর। আমার মনে হচ্ছে যে, মদ খাওয়া ওর একটা ভান মাত্র ; অন্ধকারের সুযোগে ঘুরে ঘুরে সন্ধান নিচ্ছিল, আলো জ্বালা মাত্রই একটু আড়াল দেখে ব'সে পড়েছে। যা হোক, নিয়ে চল থানাতেই।

না যেতে চায়, বেঁধে নিয়ে চল, দড়ি সঙ্গে আছে ?

আশ্চর্য, পুলিস ধরিয়া তুলিবার সময়ও লোকটা কোন বেগ দিল না। শুধু গভীর শোকের একটা বুকভাঙা 'ওফ' শব্দ করিয়া বুকের উপর মাথাটা গুঁজিয়া দিল। পুলিস তাহার মাথায় হেল্‌মেট টুপিটা খুলিয়া লইতে যাইতেছিল, ছকড়ি তাড়াতাড়ি বারণ করিয়া উঠিল, বলিল, থাক্ জমাদার-সায়েব, ওদের হ্যাটের ভেতরই যে কি অস্ত্র লুকুনো আছে বলা যায় না, বোধ হয় তুললেই একটা দুম ক'রে শব্দ হয়ে সমস্ত ভিড পরিষ্কার ক'রে দেবে ; যেমন আছে থাক্ আপাতত।

কয়েদী লইয়া ভিড়টা আবার সচল হইল। নিতান্ত কৌতূহলবশেই দুই-একজন সেই ডানপিটে চ্যাংড়াটার খোঁজ লইল ; কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

## ৩

থানার ফটকের বাহিরে ভিড়টাকে আটকাইয়া দিয়া তিনজনে থানার মধ্যে প্রবেশ করিল—পুলিস, কয়েদী এবং ছকড়ি। অফিস-ঘরে দারোগাবাবু একটা সবুজ শেড দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পের সামনে বসিয়া মাথা গুঁজিয়া একরাশ জরুরী কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত আছেন, পুলিস গিয়া এত্তালা দিল—একটা বিদেশী মাতাল রাস্তায় বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিল, ধরিয়া আনা হইয়াছে।

মোটাসোটা, ঢিলাঢালা-গোছের খুব পুরানো দারোগা ; নূতন রায় সাহেব হইয়াছেন, সাহেব মাত্রকেই বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখিতে হয়। কথা বলেন মেজাজের তারতম্য অনুযায়ী—বাংলা, হিন্দী কিংবা ইংরেজীতে ; মেজাজটা উষ্ণ-শৈত্য মিশ্রিত থাকিলে ভাষাও দেন

মিশাইয়া। একটু শঙ্কিতভাবে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, :বিদেশী মানে? সায়েব? অংরেজ?

উত্তর হইল, না, ইংরেজ নয়, তবে কটা চামড়া বটে। কোথাকার লোক তাহা টের পাওয়া যাইতেছে না। একে মদ খাইয়া আছে; তায় ভাষা যেন একেবারেই এক নূতন ধরনের। প্রশ্ন করিলে উত্তরও দিতেছে না, এক-আধটা কথা ফসকাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, পোশাক কি রকম?

পুলিস পোশাক যথাযথ বর্ণনা করিল। দারোগা একবার কাগজের রাশির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া খানিকটা ক্লান্তি আর বিরক্তির সহিত বলিলেন, লে আও সামনে।

পুলিস জানাইল, একজন বাঙালী ডাক্তারবাবুও সঙ্গে আছেন। সে বলে, লোকটা বোধ হয় আকাশ হইতে নামিয়াছে।

একে কতকগুলা দরকারী কাজের মধ্যে নূতন উপদ্রবে মনটা খিঁচড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই আজগুবি কাহিনীর অবতারণা,—প্রায় এই সময়েই আবার খবরের কাগজেরা একটা গাঁজাখুরি চালাইয়াছে যে, উত্তর-বেহারে কোথায় নাকি মৎস্য-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দারোগা রাগিয়া বলিলেন, যো এসা বোলতা হ্যায় ওভি দারু পিয়া, উসকোভি ঠিগুি গারদমে দেও।

কয়েদী প্রবেশ করিতেই শেডটা ঘুরাইয়া দিয়া দারোগা তাহার উপর আলো ফেলিলেন; হেল্‌মেটের সোনালী চক্রটা ঝকঝক করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তো মুখে কথাই ফুটিল না। তাহার পর অনেকবার ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া ইংরেজীতে প্রশ্ন করিলেন, কি জাত তুমি? রাস্তায় কি করছিলে?

নির্বাক, নিস্পন্দ। পা দুইটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া, উভয় বাহুতে

বুকটা জড়াইয়া বীরের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। শুধু মাথাটা বুকের উপর গোঁজা। মুখের গৌরবর্ণ সুবার উচ্ছ্বাসে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! প্রশ্ন হইল অবশ্য ইংরেজীতেই।—

কি নাম তোমার? বাড়ি কোথায়?

সেই চাপা গোঁজড়ানো কণ্ঠে মাতালের চাপা উচ্চারণে একটা শব্দ হইল, যেটা বাংলায় কতকটা গিরীশ-এর মত শুনিতে। যেন গ-এ, র-এ, শ-এ জড়াইয়া জিবে মিলাইয়া গেল। দারোগা মনোযোগের ভঙ্গীতে ঘাডটা বাড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু কোন উত্তর হইল না। কি ভাবিয়া একবার বাংলাতেও প্রশ্ন করিলেন, কোন উত্তর নাই; হিন্দীতে,—তথৈবচ। তখন ভাষা ছাড়িয়া সঙ্কেত ধরিলেন, ইটালিয়ান? জার্মান? ফ্রেঞ্চ? রাশিয়ান? যুগোশ্লাভ?

হাল ছাডিয়া দিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, ভ্যালা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

পুলিশটাকে বলিলেন, নিয়ে যা একে লক-আপে; থাক্, লক-আপে কাজ নেই, কেরানীবাবুকো ঘরমে বৈঠা রাখো। একঠো আরাম-কুর্সি 'পর লেটা দেও। বাঙালীবাবুকো বোলাও।

ছকড়িকে ডাকিয়া আনিল।

প্রশ্ন হইল, কি করেন আপনি?

ডাক্তারি।

বলেছেন—আকাশ থেকে নেমেছে লোকটা?

ঠিক আমি বলি নি, দু-একজন আন্দাজ করেছিল।

আপনি যান, তাদের মাথার চিকিৎসা করুন গিয়ে। আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। নমস্কার।

কলমটা তুলিয়া কাগজে মাথা গুঁজড়াইয়া দিলেন।

ছকড়ি একটু অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় অন্য একজন পুলিস আসিয়া এত্তালা দিল, মোটরে করিয়া জন পাঁচেক লোক আসিয়াছে, খুব জরুরী দরকার, দেখা করিতে চায়। দুইজন আওরৎও সঙ্গে আছে।

দারোগাবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, ভ্যালা ফ্যাসাদ! ক্রমাগতই—আচ্ছা, জরুরী কাম তো থোড়া বইঠ্‌নে কহো।

পুলিসটা বলিল, আওর সবকা পোশাক, হুজুর, ইস মাতোয়ালা সাহেবকা মাফিক হ্যায়।

দারোগা বিস্মিতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাতাল সায়েবটার মত পোশাক? যাও, বোলা লে আও।

প্রথম পুলিসটাকে বলিলেন, যাও, মাতোয়ালা সাহেবকো লে আও তুম।

লোকটাকে আনা হইলে সে আবার হৃতসম্মান বীরের ভঙ্গীতে ঈষৎ টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইল—মাথা নীচু করিয়া।

পুলিসের সঙ্গে আগন্তুক তিনজন প্রবেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, দিব্যি বাওয়া! আর আমরা ও-দিকে—

টেবিলের উপর একটা রাশভারী ঘুষির শব্দে তাহাদের চৈতন্য হইল যে, তাহারা থানায়—খোদ দারোগার সামনে। একটু জড়সড় হইয়া দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল তিনজনে। দেখা গেল, একটা চ্যাংড়াও ইহাদের পিছনে আসিয়া বারান্দার কপাটের পাশটিতে দাঁড়াইয়া চকচক করিয়া বুড়া আঙুল চুষিতেছে। পুলিসের তাড়া খাইয়া দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুইজনের পোশাক মাতাল সাহেবটার অনুরূপ, শুধু মাথায় হেল্‌মেট হ্যাট নাই। অপরজনের পোশাক একটু অন্য ধরনের, কোমরে নানা

রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরা একটা রঙিন সিল্কের শাড়ি, গায়ে একটা রঙিন ফতুয়া, কানে কুণ্ডল, হাতে বাজুবন্ধ—থিয়েটার-পরিচালকদের মতানুযায়ী আমাদের রাজ-রাজড়ারা আগে যেমন কিম্ভূতকিমাকার একটা সাজ করিতেন, অনেকটা সেই রকম। আওরৎ যাহারা সঙ্গে আসিয়াছে বলিয়া টের পাওয়া গিয়াছিল, তাহারা নামে নাই, মোটরেই আছে। চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবহুল চাকরির মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। নিতান্ত বিমূঢ়ভাবে দারোগা একবার এদিকে, একবার ওদিকে চাহিয়া আগন্তুকদের প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি? বাঙালী? তবে যে আমি তখন থেকে ইটালিয়ান, কি ফ্রেঞ্চ, কি রাশিয়ান—জিজ্ঞেস ক'রে হয়রান হচ্ছি?

এ প্রশ্নের সদুত্তর উহারা কেহই দিতে পারিল না।

একজন বলিল, স্যার, আমরা থিয়েটার করছিলাম—চন্দ্রগুপ্ত—ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত।

ছকড়ি, পুলিস, দারোগা সকলেই একবার যেন নূতন দৃষ্টিতে কয়েদী আর আগন্তুকদের পানে চাহিল। দারোগা চক্ষু দুইটা বড় বড় করিয়া বলিলেন, থিয়েটার হচ্ছিল? হুঁ, তাই তো দেখছি। তা এতদূর পর্যন্ত গড়াল কি ক'রে?

গেরো স্যার, তবে আর বলছি কি! মদনকে দেওয়া হয়েছিল গ্রীক সেনাপতি অ্যান্টিগোনাসের পার্ট। প্রথম অঙ্কের প্রথম সীনেই আলেকজেন্দারের সামনে বেয়াদবি করার জন্যে আলেকজেন্দার নির্বাসিত ক'রে দিলে না স্যার? সেই যে স্টেজ থেকে ঘাড় হেঁট ক'রে বেরিয়ে এসে কোথায় সরল সবার চোখে ধূলো দিয়ে, আর পাত্তা নেই। খোঁজ্ খোঁজ্ রব উঠে গেল। একটু পরেই টের পাওয়া গেল, সেই বেশেই চরণ সা'য়ের দোকানে ঢুকে এক পাঁট মদ সাফ করেছে। তার পরে

যে কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারলে না। থিয়েটার তো মাথায় উঠল স্যার, পরের ছেলে, তায় আবার নেশাখোর, দেখছেনই সামনে। চারিদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হ'ল। প্লে ছাই হবে; বলুন স্যার, এ অবস্থায় ফিলিং আসে? সেকেণ্ড অ্যাক্টে আলেকজান্দারকে অ্যান্টিগোনাসের পার্ট দিয়ে কোন রকমে চাপাচুপি দিয়ে চালাচ্ছি, এমন সময় ওই ছোঁড়াটা গিয়ে হাজির। দেখতে যে রকমই হোক, দেবদূত স্যার, বাঁচিয়েছে আমাদের—কোথায় গেলি রে ছোঁড়া, সামনে এসে দাঁড়া। একেবারে স্টেজে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা স্যার—। 'আপনাদের সব প্লেয়ার ঠিক আছে? সব গ্রীক প্লেয়ার?'—প্রথমটা মনে হ'ল সুকুই। ঘরের গলদ কে প্রকাশ করতে চায় স্যার? আবার ভাবলাম, না; পরের ছেলে, ব্লাক-আউটের পর হুড়মুড়িয়ে ট্র্যাফিক আরম্ভ হয়ে গেছে; মোটর চাপাই পড়বে, কি ট্রাম চাপাই পড়বে। বললাম, অ্যান্টিগোনাসকে নিবাসিত করবার পর আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বললে, ভাবতে হবে না, সে থানায় আছে। শুনতে দেরি স্যার, ট্যাক্সি ক'রে চ'লে আসছি, পোশাক ছাড়বারও তর সয় নি স্যার। ছায়া আর হেলেন সঙ্গে এসেছে, মোটরে আছে। ছায়া আবার ওর মেসো স্যার, মানে—মদনা হচ্ছে ছায়ার শালী-পো।—এই স্যার ব্যাপার সংক্ষেপে। এখন দয়া ক'রে ছেড়ে দিন গরিবের ছেলেকে। অনেক কষ্টে ওর বাপকে রাজি করেছিলাম, ছাড়তে চায় না; বলে, ছেলেকে আমার বকিয়ে দেবে তোমরা! বুঝুন স্যার! ওকে আমরা বকাব! এখনও দশ বছর ওর পায়ের তলায় ব'সে শিখতে পারি। এবারটা দেন খালাস, এই স্যারের সামনে নাক-কান মলছি, ও ছেলেকে আর কখনও— আর তুইও যে মদনা, মদ গিলে রাস্তায়—

মদনা একটু একটু টলিতেছিল, সামলাইয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইবার

চেষ্টা করিয়া এতক্ষণে মুখ খুলিল। রক্তজবার মত চক্ষু দুইটি পিটপিট করিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, মদনার হিসাব ঠিক আশে শম্রাট। নির্বাসিত হয়ে বেরিয়ে এসে লজ্জায় অপমানে মুখ নীচু কর্‌রে বশ্‌শে ছিল; রামচন্দ্রের মত বেহায়া নয় তো যে বুক ফুলিয়ে টহল দিয়ে বের্‌ড়াবে। জিজ্ঞেস কর্‌র ডাক্তারবাবুকে, জিজ্ঞেস কর্‌র জমাদার শায়েবকে, কোন খুঁত পেযেশ্‌ল পার্ট করার মধ্যে? ডেকে ডেকে হয়রান হযে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যান্টিগোনাস স্পিকটি নট। নির্বাসিত গ্রীকসেনাপতি বাওয়া, লজ্জায় অধোবদন হয়ে বশ্‌শে আছি; দণ্ড তুলে নাও, শুডশুড ক'রে আবার উঠব গিয়ে। এই, একে বলে পার্ট করা, বুজরুকি কর্‌রে বেছে বেছে রাজা-উজিরের পার্ট নিয়ে চেয়ার ঘামালেই হ'ল না। চল এবার। তা হ'লে আশ্‌শি দারোগাবাবু, গুন্নাইট শ্যার।

# নোংরা

## ১

হাবুল মফস্বল কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় এম. এ. পড়িতে আসিতেছে। জোড়াসাঁকোয় তাহার কাকার বাড়ি; কয়েক দিন হইতে সেখানে একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বউয়ে-ঝিয়ে, ছেলে-মেয়ের পরিবারটি একটু বড়, সতর্কতা সত্ত্বেও একটু অপরিচ্ছন্নতা আসিয়াই পড়ে। গৃহিণী বলিতেছেন, আমি উদয়াস্ত খিটখিট ক'রে হার মানলাম, এইবার তোমরা জব্দ হবে। সে এমন শুচিবেয়ে ছেলে নয়, একটু কোথাও ময়লা দেখলে হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাবে!

বধূ নিজের দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুইটি আর ছোট দেওর-ননদগুলিকে খেলায়-ধূলায়, সাজে-গোজে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করাইতেছে; একটু এদিক-ওদিক হইলেই শাসাইতেছে, ওই গাড়ির শব্দ; দেখ্ তো র‍্যা, বোধ হয় হাবুল ঠাকুরপো এল। শিশুমহলে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় বেশ সুফলও পাওয়া যাইতেছে।

স্কুলগামী ছেলেমেয়ে পাঁচটি। তাহারা পড়ার ঘরদুয়ার ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, বইয়ে সাদা কাগজের মলাট দিয়া, এক প্রকার সশঙ্ক আগ্রহের সহিত হাবুলের প্রতীক্ষা করিতেছে; ওদিকে তাহাদের স্কুলে পর্যন্ত হাবুলদাদার অলৌকিক পরিচ্ছন্নতার সংবাদ প্রচার করিয়া সেখানেও একটু বিস্ময়ের গুঞ্জন তুলিয়াছে। বড় মেয়েটি আবার একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ, চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া সহপাঠিনীদের বলিতেছে, এত্তোটুকু ধুলো কি বালি একটু দেখুক দিকিন হাবুলদাদা তোমার গায়ে, এই একরত্তি, হুঁ মশাই! পরিণামটুকু তাহাদের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে।

ঠিক এতটা না হইলেও ছেলেটি এ বিষয়ে একটু বাতিকগ্রস্ত বটে। আসিল, দিব্য ফিটফাট; ট্রেনে, জাহাজে যে এই বারোটি ঘণ্টা কাটাইয়া আসিল, চেহারায় তাহার চিহ্ন খুবই কম, পরিচ্ছদে নাই বলিলেও চলে, জুতা জোড়াটি পর্যন্ত কখন এরই মধ্যে কেমন করিয়া ঝাড়িয়া ঝকঝকে করিয়া লইয়াছে।

ব্যাগটা রাখিয়া, কাকীমাকে প্রণাম করিতে ঝুঁকিয়া হঠাৎ একটু পাশে সরিয়া গেল। বলিল, একটু স'রে এস এদিকে কাকীমা, একটু যেন নোংরা ওখানটা।

ছেলেমেয়েরা সসম্ভ্রম কৌতূহলে এক স্থানে ভিড করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বড মেয়েটি আগাইয়া গিয়া চারিটি আঙুল দিয়া জায়গাটা মুছিয়া দেখিল, তকতকে শানের উপর একটু জলের সঙ্গে সামান্য একটু যেন ময়লা। সরিয়া আসিয়া, চোখ বড় করিয়া সবাইকে দেখাইয়া, সেটুকু কাগজে মুছিয়া রাখিতে গেল, সহপাঠিনীদের দেখাইবে—হাবুলদার প্রমাণ।

হাবুল প্রশ্ন করিল, বউদি কোথায় কাকীমা? সেই দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলাম। সামনে আসতে লজ্জা হচ্ছে নাকি তাঁর?

বউদি সে ভাবের উৎকট রকম লাজুক নয়। রান্নাঘর হইতে হাত-মুখ মুছিয়া আসিতেইছিল, মাঝপথে ননদের সপ্রমাণ রিপোর্ট পাইয়া, ফিরিয়া গিয়া একবার আরশিটা দেখিয়া লইতেছিল। একটু দেরি যে হইয়া গেল, তাহার কারণ, সুন্দরী স্ত্রীলোকের আরশির সামনে দাঁড়াইলে একটু দেরি হইয়া যায়ই। শাশুড়ীর ডাকে আসিয়া হাজির হইল। একটি মিষ্টি হাসি দিয়া দেবরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এস ভাই, ভাল আছ তো?

মন্দ নয়।—বলিয়া হাবুল পায়ের ধূলা লইল, এবং সত্যই ধূলা

লাগিয়াছে কি না, একবার ত্বরিতে দেখিয়া লইয়া হাতটা কপালে ঠেকাইয়া হাসিয়া বলিল, ভাগ্যিস কাকীমা ডেকে দিলেন, নইলে মোটে আছি কি না সে খোঁজই নিতে বড়! অন্যায় বললাম কাকীমা?

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, ওই আরম্ভ করলি! উনি তো এসেছিলেনই বাপু।

বউদি বলিল, না ভাই, আমি এক টেরেয় ওদিকে একটু কাজে ছিলাম; কেউ এলে-গেলে ওদিক থেকে টের পাওয়ার জো নেই।

কাজ, রন্ধন তো?

পেটুকের জাত তোমরা, শুধু ওইটিকেই চেন বটে, কিন্তু তা ছাড়া আমাদের আর কাজ নেই নাকি?

আঁচলের কোণে মসলার ছোপ লাগবে আর কোন্ কাজে?

বধূ লজ্জিতভাবে আঁচলের দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিল; এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও অপযশটুকু লাগিয়াই গেল। আচ্ছা চোখ তো!

ননদ আসিয়া পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গোপনে আঁচলটা তুলিয়া ধরিয়া বধূর দিকে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ইস, আমাদের তো চোখেই পড়ে না!

হাবুল বলিল, তা হোক, তোমার বউ কিন্তু কাকীমা, ছেলেমেয়েগুলিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছে।

কাকীমা বলিলেন, তা বলতে নেই বাপু, সেদিকে বেশ নজর আছে।

স্বীয় প্রশংসায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া বধূ বলিল, দাঁড়াও, যশ কতক্ষণ টেঁকে দেখ।

ছোটদের মধ্যে মৃদু একটু চাঞ্চল্য পড়িল, তাহাদের প্রশংসা হইতেছে। ও জিনিসটা তাহাদের বরাতে সচরাচর জোটে না। একজন

নিজের পরিষ্কার জামাটির উপর হাত বুলাইয়া নূতন করিয়া একটু ঝাড়িয়া লইল। দেখাদেখি পাশেরটিও তাহাই করিল এবং ক্রমে পদ্ধতিটা সংক্রামক হইয়া উঠিল। একটি ছোট মেয়ের হাতে একটি ধূলিমলিন পেয়ারা লুকানো ছিল। সেটি সে তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল এবং দেহ ও পরিচ্ছদ দুইটিই পরিষ্কার রাখিবার উৎসাহে ফ্রকের মাঝ-বরাবর হাতটা বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইল। ইহাতে যখন সকলে হাসিয়া উঠিল, মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বধূকে জড়াইয়া তাহার হাঁটু দুইটির মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিল।

ছাড়্, আমার কাপড়ও খাবি এই সঙ্গে?—বলিয়া বধূ মেয়েটিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হওয়ায় দেবরের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখলে তো, সোজা এই ভূতপেত্নীদের সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে থাকা ঠাকুরপো? বলছ তো—

অতি-পরিচ্ছন্নতাটা যে এ বাড়ির স্বাভাবিক অবস্থা নয়, হাবুল সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এটাও আঁচিয়া লইয়াছিল যে, তাহারই পরিচ্ছন্নতা-বাতিকের জন্য পরিবারটি একটু সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, তা তোমার যে এত পরিষ্কার-বাই, তা আমার জানা ছিল না বউদি। দাদার ছোট মেয়ে বুঝি ওটি? এস তো আমার কাছে মা, মা তোমার মেমসাহেব, নেবে না।

ভাজ ব্যস্তভাবে মানা করা সত্ত্বেও পেয়ারা-রসসিক্ত মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। ছেলেরা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, এত বড় অঘটন তাহারা জন্মে দেখে নাই।

কাকীমা বলিলেন, ওরে, ওর জুতোর ধূলোয় তোর জামাটা গেল হাবু, নামিয়ে দে। ওমা! তোর সে অমন শুচিবাই গেল কোথায়?

হাবুলের সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করিতেছিল, মরিয়া হইয়া মেয়েটির

পেয়ারা-চিবানো মুখে একটা চুম্বন দিয়া বলিল, সেসব চিরকাল থাকবে নাকি কাকীমা? সে ছিল একটা রোগ, যখন ছিল তখন ছিল।

বড় মেয়েটি একটু নিরাশ হইয়া পড়িল, হায়, তাহার পূজার প্রতিমার ভিতরে খড়!

২

হাবুল দিন-পাঁচেক কোন রকমে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিল, তাহার পর নবাগমনের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেলে নিজমূর্তি ধারণ করিল।

কলেজ হইতে আসিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া মাঝে মাঝে নাক উঁচু করিয়া শরীরে, কাপড়ে কিংবা ঘরে কোথায় অতি-সূক্ষ্ম ময়লা আছে তাহাই উপলব্ধি করিতেছিল। খুড়তুতো বোন শৈল—সেই স্কুলের ছাত্রী বড় মেয়েটি—আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা আনব দাদা?

তোর নখ দেখি?

শৈল হাত দুইটি উপুড় করিয়া সামনে ধরিল। ঘটনাক্রমে নখ ছিল না, শৈল আজই ক্লাসে বসিয়া দাঁতে খুঁটিয়া শেষ করিয়াছে। হাবুল বলিল, যাও; জেনে রেখো, নখের ময়লা বিষ; পেটে গেলে—

শৈল বলিল, তা জানি, ম'রে যায় লোকে।

ভগ্নীর স্বাস্থ্য-জ্ঞানটা তাহার চেয়েও এত উৎকট রকম প্রবল দেখিয়া হাবুল হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না। একটু থামিয়া বলিল, হুঁ, জার্ম কাকে বলে, জান?—রোগের বীজাণু?

শৈল ভাবিতে লাগিল।

কিসে একজনের শরীর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আর সুবিধে পেলে তাকে মেরেও ফেলে অন্যজনের শরীরে রোগ নিয়ে যেতে পারে?

শৈল আর একটু ভাবিল, তাহার পর হেঁয়ালির উত্তর দেওয়া গোছের করিয়া বলিয়া উঠিল, ডাক্তারে।

হাবুল বিরক্ত হইয়া বলিল, কোন্ বিদুষী তোমাদের হাইজিন পড়ান? জারম এক রকম খুব ছোট পোকা, এত ছোট যে একটা সূচের ডগায় লক্ষ লক্ষ থাকতে পারে; তারা যত রকম রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়, বুঝেছ তো? এখন, এদের থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদের কি করতে হবে?

সূচ কিনব না।

হাবুলের ধৈর্য চরম সীমায় পৌছিয়া গিয়াছিল, তবুও সংযতকণ্ঠে বলিল, পরিষ্কার থাকতে হবে, কেন-না ধুলো কাদা, পচা জিনিস—এইসব নানান রকম ময়লাতে এদের জন্ম আর বৃদ্ধি। টিটেনাস কাকে বলে, জান?—ধনুষ্টঙ্কার?

অর্জুনের—

না না, অর্জুনের ধনুষ্টঙ্কার নয়; সে এক রকম রোগ। যা, চা-টা নিয়ে আয়।

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বউদিদি নিজেই চা লইয়া আসিল। হাবুল বলিল, একটা সাধারণ রোগের নাম পর্যন্ত জানে না, এরা পরিষ্কার থাকার মানে কি বুঝবে বল তো বউদি? কাজেই, তুমি সর্বদা খড়্গহস্ত হয়ে থাকলেও কোন ফল হচ্ছে না; আমি ঠিক করেছি, এদের সবাইকে একত্র ক'রে আমি রোজ বিকেলে খানিকটা ক'রে লেক্‌চার দোব। শৈল, সবাইকে ডেকে আনবি।

বউদিদি বলিল, রোগের নাম মুখস্থ করবার জন্যে?

শুধু রোগের নাম কেন? সৌন্দর্যের দিক থেকেও তো পরিষ্কার থাকার একটা মূল্য আছে! ওই, ওই দেখ না, তোমার জ্যেষ্ঠ রত্নটি—

এই একটু আগে কেমন ফুটফুটে দেখাচ্ছিল—ভূত সেজে এল দেখ না! শৈল, যা, ওকে বাইরেই ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে আয়। যা যা, এক্ষুনি এসে ওর মাকে জড়িয়ে ধরবে। হুঁঃ, এদের রোগের কথা বললে কি বুঝতে পারবে? এদের বলতে হবে, বিশ্রী দেখায়। ছেলেপুলে মানুষ করা সোজা নাকি যে— আচ্ছা, তুমি প্রসূতি-বিজ্ঞান পড়েছ বউদি?

নামও শুনি নি; নাও, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে লেক্‌চার শুনিয়া বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল, এবং হাবুলকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাপারটা চলিতে লাগিল বলিয়া তাহার দুর্ভোগটা বাড়িল বই কমিল না। তাহাদের মধ্যে, কোন্ রকম ময়লায় কি জার্ম্ বৃদ্ধি পায়, সেই লইয়া তর্ক হয়; ময়লার আধারটি—পুরানো ন্যাকড়া, ময়লা কাগজ, পচা কি ছাতা-ধরা কোন জিনিস হাবুলের নিকট হাজির হয়। সময় নাই, অসময় নাই, প্রায়ই দুই-তিনজনে মিলিয়া একজনকে ধরিয়া হাজির করিতেছে—কাপড়ে কি শরীরে কোথায় একটু ময়লা আছে—হাবুলের কাছে বামালসুদ্ধ নালিশ। হাবুলের পড়ারও ক্ষতি হইতেছে, তাহা ছাড়া এই সব টানা-হিঁচড়ানিতে তাহার ঘরের পরিচ্ছন্নতাও কিছু বৃদ্ধি পায় না। সে আশা করিতেছে, এদের অজ্ঞতাটা দূর হইলে এবং সৌন্দর্যের জ্ঞানটা একটু ফুটিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে; ওদিকে আক্রোশের ভাবটা বাড়িয়া যাওয়ায় ওরা সব ক্রমাগতই পরস্পরের জামাকাপড় নানা ফন্দিতে নোংরা করিয়া মকদ্দমা সাজানোয় হাত রপ্ত করিতেছে।

একমাত্র শৈল সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। সে দাদাকে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, দেবতার মতই তাহাকে সুদূরে রাখিয়া সসম্ভ্রম

পরিচ্ছন্নতার সহিত পূজা করিতেছে, যত রকম ময়লায় যত রকম রোগ হইতে পারে, অবিচল নিষ্ঠার সহিত তাহাদের নাম মুখস্থ করিতেছে এবং তাহার দেবতার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটিগুলিকে কল্পনা এবং ভাষায় মণ্ডিত করিয়া তাহার কয়েকটি মুগ্ধ সহপাঠিনীদের মধ্যে ভাগবতরস বিতরণ করিতেছে।

এদিকে সংবাদ এই। ওদিকে কাকা এবং হাবুলের খুড়তুতো বড় ভাই ভিতরে ভিতরে চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন; অবসরমত দুইজনের মাঝে মাঝে এই সমস্যা লইয়া পরামর্শও হইতেছিল। অবশেষে একদিন কাকা বলিলেন, হাবুল, তুই দেখতে পাচ্ছি পাড়ার স্যানিটারি ইন্সপেক্টার দাঁড়িয়ে গেছিস, এ তো কাজের কথা নয়। একটা বছর বাদে তোকে অমন শক্ত এগ্‌জামিন দিতে হবে, তুই লেখাপড়া করবি কখন? আমি বলি, তুই তেতলার কোণের ছোট ঘরটা নে। দিব্যি নিরিবিলি ঘর; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসিস, সেখানে কোন রকম বালাই জুটবে না।

হাবুল বলিল, তা বেশ, কিন্তু এদের আমি অনেকটা ঠিক ক'রেও এনেছিলাম কাকা।

বারান্দার ও-কোণে বড় নাতিটির আবির্ভাব। বাঁ হাতে একটা সাবান, ডান বগলে একটা ভিজা বিড়ালছানা ছটফট করিতেছে। কাকা সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, তা দেখছি। যাক, তুই ওপরেই গিয়ে থাক্। চাকরটাকে ব'লে দিচ্ছি, খাট, আলমারি, টেবিল সব দিয়ে আসুক।

৩

কাকার প্রতি একটু রাগ হইল, কিন্তু উপরে গিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটুকু কাটিয়া গেল। মাঝারি-গোছের ঘরটি, সামনে প্রশস্ত তেতলার ছাদ। সকালের ঝোঁকে হাবুল সমস্ত স্থানটি চাকর আর ভক্ত শৈলর সাহায্যে ঝকঝকে তকতকে করিয়া লইল, এবং কলেজ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল, যেখানকার যেটি অনাহত শ্রীতে ঠিক সেইখানেই বিরাজ করিতেছে, ঘরের কোণে যত্ন করিয়া সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন জাব্‌মের আধার জড়ো করা নাই এবং বিছানার উপরও কোনও শিশু হাবুলকে নিজের সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা দেখাইবার আগ্রহে জুতার ফিতা বাঁধিতেছে না, তখন সে সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

দুই দিন পরে আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়িল। ছেলে-মেয়েগুলি প্রকৃতই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। হাবুল যে উপরে আছে এবং যে কোন মুহূর্তেই নামিয়া আসিতে পারে, এই ধারণাটিতে অনেক বেশি কাজ হইতেছে। মোট কথা, সে নাই বলিয়াই একটি অটল গাম্ভীর্যের কাল্পনিক মূর্তিতে সবার সামনে বিরাজ করিতেছে। আহারের জন্য কিংবা কলেজ হইতে আসা কি কলেজে যাওয়ার সময় যখন সবার প্রত্যক্ষ হয়, তখন সবাই সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিয়া তটস্থ হইয়া থাকে।

দেবতারা দূরে থাকিয়া বৎসরে এক-আধবার আমাদের মধ্যে আনাগোনা করেন—এই বন্দোবস্তই ভাল, আমাদেরই একজন হইয়া থাকিলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

বাড়ির বাহিরেও হাবুলের যশ এই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্বদা দেখা যায় না বলিয়া ছেলেমেয়েদের কল্পনায় কিছু আটকাইতেছে

না। শৈলকে কোন সখী প্রশ্ন করিলে শৈল অতিমাত্র গম্ভীর হইয়া বলে, নীচেতেই তিনি ভারি থাকেন কিনা আজকাল !

তুই যাস না ওপরে ?

রক্ষে কর ভাই ; ত্রিসীমানার মধ্যে পা দেওয়ার জো আছে ?

কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। তেতলার ছাদে, সিঁড়ির ঘরের সঙ্গে লাগোয়া আর একটি ঘর আছে। আকারে ঠিক চতুষ্কোণ নয়, খানিকটা গিয়া একটা ফালি বাঁকিয়া গিয়াছে, ঘরটা দাঁড়াইয়াছে উল্টানো ইংরেজী L-অক্ষরের মত। পূর্বে কাঠকুটা থাকিত ; সম্প্রতি শৈল এটি দখল করিয়াছে। ছাদের এ কোণটায় তাহার ঘর, মাঝে পনরো-ষোল হাত জায়গা, তাহার পরই হাবুলের ঘরটি।

শৈলর সহসা উপরে উঠিয়া আসার কারণটা বুঝিয়া উঠা যায় না ;—হইতে পারে, সে পরিচ্ছন্নতাসূত্রে হাবুলদাদার সহিত একটা সম-আভিজাত্য অনুভব করে বলিয়া একই স্তরে থাকিতে চায় ; হইতে পারে, তাহার পুতুলের সংসার বাড়িয়া গিয়াছে, এবং নীচে দুইটি ভাইপো ভাইঝি এবং ছোট বোনটির লোলুপ দৃষ্টি এড়ানো ক্রমেই সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। মোট কথা, সখীদের নিকট যাহাই বলুক, শৈল সমস্ত দুপুরটা আজকাল উপরেই—হাবুলের ত্রিসীমানার মধ্যেই কাটায়। তবে এটা হয় খুব লুকাইয়া, হাবুলকে ব্যাপারটা জানানো হয় নাই। তাহার কারণ বলিতে গেলে শৈলর খেলাঘরের সঙ্গিনী নৃত্যকালীর কথা পাড়িতে হয়।

প্রথমত শৈলর সহিত নৃত্যকালীর সখিত্বটা সম্ভব হইল কি করিয়া, সেই একটা সমস্যা ; সেটাকে নিতান্ত একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইলেও হাবুলের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তির পরও সখিত্ব যে কি করিয়া বজায় আছে, সে তো একেবারেই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মেয়েটি যৎপরোনাস্তি নোংরা। সমস্ত অবয়বটি ধূলামাটিতে এতই প্রচ্ছন্ন যে, তাহার আসল রঙটি যে কি, বলা একটু কঠিন। আত্মীয়েরা কুণ্ঠিতভাবে বলে, শ্যামবর্ণ; যাহাদের নিন্দায় আনন্দ আছে, তাহারা প্রমাণ করিয়া দেয়—কালো। মাথাটা একটা আগাছার জঙ্গলের মত, চুল খুব ঘন, কিন্তু যত্নের অভাবে বাড় নাই। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো একরাশ স্তবক পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া পিঠের অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। খোঁপা হয় না, তবে কালেভদ্রে ঘাড়ের উপর অর্ধ-চন্দ্রাকারের দুইটা টানা সুস্পষ্ট বেড়াবেণী দেখা যায়। দুই-এক দিন থাকে, তাহার পর কখন গ্রন্থি খুলিয়া গিয়া বিশৃঙ্খলভাবে এলাইতে এলাইতে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। দেখিলে মনে হয়, মাথার পিছনে কবে কি হইতেছে, মেয়েটির সে লইয়া মোটেই মাথাব্যথা নাই।

সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে, আর ফলপাকড়ের অত্যন্ত ভক্ত, এবং খেলা ও দুনিয়ার ফলপাকড় হইতে আহৃত ধূলা, কাদা, রস-কষ প্রভৃতি যত রকমের নোংরা সব হাতে-মুখে, কাপড়ে-চোপড়ে জমা করিয়া বেড়ায়। সৌন্দর্যচর্চার মধ্যে স্নানটা মাঝে মাঝে করে; তাহাতে ময়লাগুলি গায়ে ভাল করিয়া বসিয়া যায়।

স্বভাব-নোংরা মেয়েদের মাঝে মাঝে একটু অসুখ-বিসুখ করা ভাল, মা-বোনের যত্ন-আত্তি পায় তাহা হইলে—একটু নজর পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে নৃত্যকালীর সে বালাই নাই; সে অটুট স্বাস্থ্য এবং অসংস্কৃত শরীর ও বেশভূষা লইয়া দূরে দূরেই কাটাইয়া দিতেছে।

গুণের মধ্যে মেয়েটির স্বভাব বড় নরম, অন্তত তাহার চোখ দুইটি এত নরম যে, তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটি কর্তৃত্বের ভাব উপভোগ করা যায়। খেলাঘরের জগতে এ একটা

মস্তবড় লোভনীয় জিনিস। শৈল বলিল, তোমার ছেলে ভাই, হাবুল-দাদার মত তিনটে পাস দিয়ে চারটে পাসের পড়া করছে ব'লে যে আমার ন হাজার টাকা তোমার ছিচরণে ঢালতে হবে, সে আমি পারব না। আমার মেয়ে সুন্দর, তার একটা কদর নেই? আমি বরাভরণ-টরন নিয়ে পাঁচটি হাজারের ওপর উঠছি না; এইতেই তোমায় রাজি হতে হবে।

অথচ এই কয়দিন আগে, এই নৃত্যকালীকেই শৈলর অপোগণ্ড ছেলেটি নগদ এগারো হাজার টাকা দিয়া লইতে হইয়াছে।

অন্য সঙ্গিনী হইলে বাঁকিয়া বসিত, অন্তত ঠেস দিয়া দুটা কথা বলিত তো নিশ্চয়। নৃত্যকালী সঙ্গে সঙ্গে চুলের গুচ্ছ বাঁয়ে হেলাইয়া বলিল, হব রাজি।

অনুমান হয়, এই সব কারণেই, হাজার নোংরা হইলেও নৃত্যকালী অপরিহার্য। নোড়ানুড়ি লইয়া খেলা চলে, তাহাতে পরিষ্কারও বেশ থাকা যায়; কিন্তু যতই অপরিষ্কার হউক না কেন, কাদা লইয়া খেলায় একটা বিশেষ সুখ এবং সুবিধা আছে, যেমনটি ইচ্ছা ভাঙা-গড়া চলে।

নৃত্যকালীকে কিন্তু রাখা হয় খুব সঙ্গোপনে। ঘরেব যে ফালিটুকু ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, নৃত্যকালী চুপিচুপি আসিয়া সেই দিকটায় বসিয়া থাকে। হাবুল যদি সি ড়ি দিয়া উপরে যায় কিংবা নীচে আসে, ওর অস্তিত্বের খবরই পায় না। শৈলর কড়া হুকুম আছে, যেন ভুলিয়াও কখন হাবুলদাদার ঘরের দিকে না যায়, কি জোরে শব্দ না করে।

বলে, তা যদি কর জলার পেত্নী, তো হাবুলদাদা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে আলসে ডিঙিয়ে তোমায় নীচে ফেলে দেবে, আর তোমার সঙ্গে খেলার জন্যে আমার দশা যে কি করবে, ভেবেই পাই না।

হাবুলের অশুচিতার ভয়ে ঘর ছাড়িয়া কম যাওয়া-আসা করার জন্যই হউক অথবা যে জন্যই হউক, প্রায় মাস-খানেক বেশ কাটিল। তাহার পর নৃত্যকালী একদিন হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেল।

যদি বলা যায়, হাবুলই ধরা পড়িল, তাহা হইলেও বড় একটা ভুল হয় না। ব্যাপারটা ঘটিল এই রকম।—

বৈশাখের দুপুরবেলা। হাবুলদের কলেজ গরমের ছুটিতে বন্ধ হইয়াছে। হাবুল ঘরে বসিয়া একটা কবিতার বই পড়িতেছিল; হঠাৎ একটা ঘর-ছাড়ানো ভাবে মনটা কেমন হইয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া দুইটা নারিকেলগাছের মাথা একত্র হইয়া ঘরের আড়ালে যেখানে একটি নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে, সেইখানটায় দাঁড়াইল।

স্তব্ধতাটুকু বেশ লাগিল।—ঝিরঝিরে বাতাস দিতেছে, তাহাতে বিশ্রান্ত পল্লীর এখান ওখান হইতে কতকগুলা চাপা স্বর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। সামনা-সামনি খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ির খোলা জানালা দিয়া দেখা যায়, একটি মেয়ে মেঝেয় বসিয়া উবু হইয়া একান্ত মনে কি লিখিতেছে। চুলগুলা মুখের দুই পাশ ঢাকিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে। ডান দিকে একটা একতলা বাড়ির চিলেকোঠার দেওয়ালে দুইটা পায়রার খোপ আঁটা; ভিতরের পায়রাগুলা ব্যস্ত, খোপের উপরে দুইটা পায়রা গায়ে গায়ে সাঁটিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে। হাবুল মাঝে মাঝে এই দম্পতিটিকে দেখিতেছিল, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল; লিপিনিরতাকে লইয়া যে কি ভাঙাগড়া করিতেছিল, সে-ই জানে।

সহসা দেখিল, চিলেকোঠার পাশের ঘরটি হইতে বাহির হইয়া শৈল নীচে নামিয়া গেল।

তাহার বড় কৌতূহল হইল, শৈলী আবার ওখানে করে কি?

খেলাঘরের বাই আছে নাকি? সে যে একটা মস্ত নোংরামির ব্যাপার! কই, এতদিন তো জানিতে দেয় নাই, বা রে শৈলী!

দেখিতে হয়। হাবুল অগ্রসর হইয়া, দুইটা সিঁড়ি বাহিয়া ঘরটিতে প্রবেশ করিল; ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চক্ষুস্থির।

যতদূর নোংরা হইতে হয় একটি মেয়ে মেঝেয় পা ছড়াইয়া এবং বালি-ঝরা নোনা-ধরা দেওয়ালে নিশ্চিন্তভাবে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। পাশে এক তাল কাদা; হাতের আঙুলগুলা কাদা দিয়া কি একটা গড়িতে ব্যস্ত, তেলো দুইটা শুকনা কাদায় সাদা হইয়া গিয়াছে; বাঁ গালে কানের কাছটায় সেই রকম একটা বড় দাগ, বোধ হয় হাত দিয়া ঘাম মুছিয়া থাকিবে। আঁচল ভূমিতে বিছানো, তাহার উপর কতকগুলা রাংচিত্রের পাতা আর ছোট ছোট আগাছার ফল, তাহাদের নীল বেগুনে রসে আঁচলটায় ছোপ ধরিয়া গিয়াছে; এক পাশে তেল-লঙ্কা-মাখানো থেঁতো-করা খানিকটা কাঁচা আম।

হাবুলের ছায়ায় ঘরটা একটু অন্ধকার হইতেই মেয়েটি মুখ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

হাবুল ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শৈল কোথায়?

মেয়েটি উত্তর দিতে পারিল না, শুধু জিব দিয়া শুকনা ঠোঁট দুইটি একটু ভিজাইয়া লইল এবং আঁচলটা একটু টানিয়া লইল। হাবুল প্রশ্ন করিল, তোমার নাম কি?

চুপচাপ। মুখের সেই সাদা দাগটা ঘামে ভিজিয়া একটি তরল কাদার রেখা গালের মাঝামাঝি গড়াইয়া আসিল। মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, একটু একটু করিয়া রাঙিয়া উঠিতে লাগিল।

হাবুলের কৌতুক বোধ হইতেছিল, উত্তরের আশা না থাকিলেও প্রশ্ন করিল, তুমি এত নোংরা কেন?

ইহাতে মেয়েটি একটু গুটিসুটি মারিয়া গেল। বোধ হয় শৈলর সতর্কতার কথা মনে পড়িল, এইবার বুঝি তাহা হইলে আলিসা ডিঙাইয়া ফেলিয়া দেয়!

হাবুল ঠায়-নতদৃষ্টি এই জড়ভরতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। কেন, বলা শক্ত; আরও বলা শক্ত এইজন্য যে, অমন দারুণ নোংরামির মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে কোনও বিকারের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। একটু পরে হঠাৎ কি যেন মনে হইল, আর দাঁড়াইল না। দুয়ার পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, হ্যাঁ, দেখ, আমি যে এসেছিলাম, কিংবা তোমাদের খেলাঘরের কথা জানি—এ কথা শৈলকে ব'লো না। বলবে না তো?

মেয়েটি বলিল, না।

উত্তর পাইয়া হাবুল আর একটু দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, পুতুল খেলছিলে বুঝি?

কোনও উত্তর হইল না।

শৈলর সঙ্গে পড় বুঝি?

উত্তর নাই। এদিকে মনের মধ্যে কি রকম একটা গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রশ্নও যোগাইতেছিল না। যাইবার জন্য ফিবিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি রোজ এসো, আসবে তো?

মেয়েটি সাহস করিয়া ঘাড় পর্যন্ত নাড়িল না, বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াই হাবুল বলিল, আমি কিছু বলব না, আসবে তো?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। এমন সময় সিঁড়ির নীচের ধাপে পায়ের শব্দ হইল। হাবুল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

৪

তাহার পরদিন হাবুল জানালাটি অল্প খুলিয়া সিঁড়ির দিকে উৎকণ্ঠিত-ভাবে চাহিয়া রহিল এবং শৈল এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া নামিয়া গেলে নোংরা ঘরটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল, মেয়েটি নাই। আরও দুই দিন নিরাশ হইয়া সে বুঝিল, নিজের অপরিচ্ছন্নতার অপরাধে সে ভয় পাইয়াছে। তখন হাবুলের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল এবং নিজের পরিচ্ছন্নতার অপরাধে মনটি বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই ছিল, অনেকক্ষণ পরে শৈল আসিলে ডাক দিল। শৈল ক্ষণেকের জন্য চোখের একটু আড়াল হইয়া মুঠার মধ্য হইতে কি গোটা-কতক জিনিস এক পাশে ফেলিয়া দিয়া হাতটা শেমিজে মুছিয়া লইল এবং শেমিজটা কাপড়ে ভাল করিয়া ঢাকিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখটি শুকাইয়া গিয়াছে।

হাবুল আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, আমার ভয়ে খেলার জিনিসগুলো বুঝি ফেলে দেওয়া হ'ল? খেলা একটু চাই বইকি, তাতে রাগ করব কেন? শুধু অপরিষ্কার না হ'লেই হ'ল—বেশি রকম অপরিষ্কার। মাটির পুতুল গড়তে জানিস?

শৈল মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

জানতে হয়; সে একটা শিল্প যে—চারুশিল্প! তোদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ জানে না?

শৈল একটু ভাবিল। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, নেত্য বেশ জানে, অনেক রকম।

তার কাছে শিখে নিলেই পার। নেত্য আবার কে? নৃত্যধন?

না, নেত্যকালী, আমার সই—গঙ্গাজল। বড্ড নোংরা যে, মিশতে ঘেন্না করে।

হাবুল একটু হাসিয়া, কৃত্রিম রোষের সহিত চোখ দুইটা বোনের মুখের উপর ফেলিয়া বলিল, এই বুঝি শিক্ষা হচ্ছে তোমার? কাউকে ঘেন্না করতে আছে, তাও আবার নিজের সইকে? বরং তাকে পরিষ্কার হতে শেখাও না—সর্বদা কাছে রেখে।

শৈল একটু মাথা নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর বাহির হইয়া গেল। হাবুল আবার তাহাকে ফিরাইয়া বলিল, তা ব'লে যেন আমার ঘরের দিকে কাউকে এনো না, খবরদার। নোংরা হ'লে আমার কাছে গঙ্গাজলেরও খাতির নেই, ব'লে দিলাম।

পরের দিন জানালার অল্প ফাঁক দিয়া তাহার প্রায় ঘণ্টা-খানেক একভাবে চাহিয়া থাকিবার পর শৈল ছাদে আসিল। একবার সিঁড়ির দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া অদৃশ্য কাহাকে থামিবার জন্য ইশারা করিল এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হাবুলের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দেখিল, হাবুল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পর আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া গিয়া নৃত্যকালীকে সিঁড়ি হইতে ইশারায় ডাকিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল। হাবুলের ঘুম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া, আবার ঘণ্টা-খানেকের একটি দীর্ঘ যুগ জানালার ফাঁকে চাহিয়া থাকিবার পর হাবুল দেখিল, শৈল কি জন্য নীচে নামিয়া গেল। তখন হাবুল শৈলর চেয়েও নিঃশব্দপদক্ষেপে খেলাঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিল, কান দুইটিকে যথাসম্ভব সিঁড়ির নিম্নতম ধাপের কাছে মোতায়েন করিয়া রাখিল।

নৃত্যকালী মাটির তাল হইতে খানিকটা কাটিয়া লইতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। কেন, তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানেন। আজ তাহার চোখে ভয়ের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না, শুধু একটা অবোধ কৌতূহলের ভাব। শাড়িটা আজ একটু যেন ফরসা, তাহাতে ধূলা-

কাদার ছোপ আরও স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া আছে। কাঁধে অসংলগ্ন বেড়াবেণী লতাইয়া আছে।

হাবুল বলিল, শৈলকে খুঁজতে এসেছিলাম; কোথায় গেছে বলতে পার?

নীচে গেছে।

উত্তরটা বোকার মত হইল। উপরে যখন নাই, তখন নীচে তো গেছেই। কিন্তু তাহাতে আবার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকায় হাবুল খুশিই হইল। জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে গেছে বলতে পার?

পারি।

নিজের অদৃষ্টে প্রসন্ন হইয়া হাবুল প্রশ্ন করিল, কি করতে?

আরও কাদা মেখে নিয়ে আসতে, আর খ্যাংরাকাঠি।

হাবুলের মনে হইল, স্বরটি মিষ্ট। 'কাদা' 'খ্যাংরাকাঠি'—এই রকম নোংরা কথাগুলাও এত মিষ্ট লাগিল! বলিল, কাদা সেই তোমাদের বাড়ি থেকে তো? এ বাড়িতে তো নেই।

হ্যাঁ।

হাবুল থেবড়ি খাইয়া সামনেটিতে বসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, স্থানটুকু বেশ পরিষ্কার ছিল না। বলিল, তুমি বেশ পুতুল গড়তে পার, না?

নৃত্যকালী মাথাটা একটু নীচু করিয়া ঠোঁটের এক কোণে লজ্জিত-ভাবে একটু হাসিল।

হাবুল বলিল, আমায় একটি গ'ড়ে দিতে হবে।

অবশ্য শুধু বলিবার সুখটুকুর জন্যই বলিল, কেন না ভগ্নীকে মৃৎশিল্পে উৎসাহিত করিলেও, পুতুলের যা সব নমুনা সামনে পড়িয়া ছিল,

সেগুলিকে চারুশিল্পের উৎকর্ষ বলিয়া মনে করে, এতটা দুর্দশা তাহার তখনও হয় নাই।

মেয়েটি মুখের উপর বাঁ হাত চাপিয়া আর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভালভাবেই হাসিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া লইল, দেখা গেল, ডান গালের নীচে আঙুলের ডগার কাদায় তিনটি দাগ লাগিয়া গিয়াছে। হাবুল বলিল, ও কি হ'ল? ইয়েতে যে দাগ লেগে গেল!

নৃত্যকালী বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিতেই বলিল, ইয়েতে —মানে—ইয়ে—তোমার গালে আর কি। না, হয় নি, আর একটু মোছ, আর একটু—ওই পাশটায় এখনও রয়েছে, সমস্তটা টেনে মুছে দাও দিকিন, আঃ, রয়েছে যে এখনও একটু—

মোটেই আর কিছু ছিল না এবং অবর্তমান কাদা মুছিতে স্থকুমার গালটির যে অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে হাবুল ভিন্ন আর যে কেহই দয়া অনুভব করিত। হাবুল বলিল, আমি না হয় দোব ঠিক ক'রে?

কোঁচার খুঁট তুলিয়াছিল, বোধ হয় দিতও; কিন্তু নীচে যেন শৈলর স্বর শোনা গেল। হাবুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, সেদিন যে এসেছিলাম, বল নি তো শৈলকে?

নৃত্যকালী মাথা নাড়িল, না।

দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া হাবুল বলিল, আর হ্যাঁ, আর এখন যে ওকে খুঁজতে এসেছিলাম, সে কথাও ব'লে কাজ নেই, ভাববে— একটু খেলছি, তাতেও হাবুলদাদার এসে বাগড়া দেওয়া—

৫

মাঝের চার-পাঁচ দিনের এদিককার ইতিহাস আর দিলাম না; আশা করি, আন্দাজ করিয়া লইতে কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপর দিকে খবর এই যে, হাবুল আবার অপরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যেন আরও সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। বউদিদিকে বলিল, তোমরা গুরুজন, বলা ঠিক হয় না; কিন্তু তোমরা যদি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক, ছেলেমেয়েরা একটা আদর্শ পায়। এই ধর, তুমি যদি সর্বদা একটা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে থাক—

বউদিদি বলিল, রক্ষে কর ভাই! বরং তুমিই একটি আদর্শ বিয়ে ক'রে নিয়ে এসে আলমারিতে সাজিয়ে রাখ না কেন?

নিজের কথাটা ঠাট্টায় উডাইয়া দিলেও দেবরের খুঁতখুঁতানির চোটে বউদিদিকে আবার কচিগুলার দিকে কড়া নজব দিতে হইল। তাহাদের সন্ত্রাসটা ছিলই, আবার একচোট উগ্রতরভাবে জাগিয়া উঠিল। শৈল নৃত্যকালীকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিল, তোকে ব'লে ব'লে হার মানছি পোড়ারমুখী, কিন্তু যদি একদিন ঘুণাক্ষরেও হাবুলদাদার নজরে প'ড়ে যাস তো তোর যে কি দুর্গতি ক'রে ছাড়বে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমি তো তোকে এনে ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে থাকি। মুয়ে আগুন, আবার ঠোঁট চেপে হাসি! কোত্থেকে যে হাসি আসে পোডার মুখে, তা তো বুঝি না—

যেদিন নৃত্যকালী আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছে, ঘরে ঢুকিয়াই চাপা গলায় প্রশ্ন করে, হাবুলদাদার ঘরের ওদিকে যাস নি তো?

নৃত্যকালী বলে, নাঃ।

শৈল বলে, খবরদার! আর দরকারই বা কি আমাদের ওদিকে যাবার ভাই? তুমি বাপু, খুব পরিষ্কার আছ তো আছ; আমরা দুটিতে না হয় নোংরাই; থাক এক কোণে তোমার ঘেন্না নিয়ে। কি বল্ ভাই গঙ্গাজল?—এই ভাবে নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য যেমন এক দিকে শাসায়, অপর দিকে তেমনই আবার নৃত্যকালীর আত্মসম্মান জাগ্রত করিবারও চেষ্টা করে।

নৃত্যকালী বলে, হুঁ।

মেয়েটি আজকাল বেশ প্রতারণা শিখিয়াছে। কালই প্রায় ঘণ্টা-খানেক হাবুলের ঘরে গিয়া গল্পসল্প করিয়াছিল। শৈল বাহিরে কোথায় গিয়াছিল বলিয়া হাবুল ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

এর পরে আরও দুই দিন কাটিল। হাবুল অত্যন্ত কবিতা পড়িতেছে এবং বাকিটা সময় নীচে আসিয়া চারিদিকে অপরিচ্ছন্নতা আবিষ্কার করিয়া জর্জরিত হইয়া উঠিতেছে। বলিতেছে, তোমরা সব শেষ পর্যন্ত আমায় বাড়িছাড়া না ক'রে ছাড়বে না দেখছি, আমার অদৃষ্টে লেখাই আছে হস্টেল—

দুপুরবেলা। আজ শৈলদের স্কুলে প্রাইজ-বিতরণ। সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইতেছে, দুয়ারের সামনেই নৃত্যকালীর দেখা। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, যাবি না ইস্কুলে প্রাইজ দেখতে?

নৃত্যকালী নাসিকাটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভাল্ লাগে না।

শৈল বলিল, মুয়ে আগুন। কি ভাল লাগে তবে, শুনি?

নৃত্যকালী তাহাকে কাটাইয়া গেলে, হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল, ওমা! তুই যে আজ এসেন্স মেখেছিস লা! পেত্নীর ভাবন দেখে বাঁচি না!

কই, ধ্যাৎ!—বলিয়া নৃত্যকালী ভিতরে চলিয়া গেল।

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া হাবুলের কাকীমা শুইয়া ছিলেন,

ভাড়াটেদের নূতন বউটি পাকা চুল তুলিতেছিল, পুত্রবধূ উপুড় হইয়া শুইয়া একটা নাটক পড়িয়া শুনাইতেছিল। নৃত্যকালীকে দেখিয়া বলিল, নেত্য, একটু জল গড়িয়ে দিয়া যা তো দিদি, আর পারি না উঠতে।

নৃত্য জল দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। ভাড়াটেদের বউটি বলিল, মেয়েটি নোংরা তাই, নইলে—

কাকীমা বলিলেন, হ্যাঁ, বেশ ছিরি আছে। আর নোংরাই কি থাকবে চিরদিনটা গা? বয়েস হয়ে আসছে—যা শুচিবেয়ে আমাদের হাবুলটা, নইলে ইচ্ছে ছিল—

পুত্রবধূ কিছু বলিল না; ঠোঁটের কোণে একটি অতি-সূক্ষ্ম হাসি চাপিয়া অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া ছিল; বইয়ে চোখ ফিরাইযা আনিয়া বলিল, হুঁ, শোন—

হাবুল নিরাশ হইয়া খেলাঘর হইতে বাহির হইতেছিল; দেখিল, সিঁড়ির দরজায় নৃত্যকালী দাঁড়াইয়া; প্রশ্ন কবিল, খেলবে না?

নৃত্যকালী প্রশ্ন করিল, সই আছে?

হাবুলও যেন শৈলর স্কুলে যাওয়ার কথাটা মোটেই জানে না, এই ভাবে উত্তর করিল, আছে বোধ হয় নীচে, আসবে 'খন; তুমি ততক্ষণ চল না ও ঘরে। বাপ রে, কি গরম এ ঘরটায়!

ঘরে গিয়া হাবুল টেবিলের সামনে চেয়ারটিতে বসিল; নৃত্যকালী একটু দূরে, পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বুঝি ইস্কুলে যেতে ভাল লাগে না নৃত্য?

নৃত্য হাসিল মাত্র।

কি ভাল লাগে?

কথাটা বড় ব্যাপক, বোধ হয় মিলাইয়া দেখিয়া উত্তর হাতড়াইতে-ছিল; হাবুল প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমার কাছে আসতে? নৃত্য একবার চোখ তুলিয়া লজ্জিতভাবে ঘাড নাড়িল, হ্যাঁ।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, কেন? বলতে পার?

সইয়ের দাদা ব'লে।

হাবুল বলিল, আমারও তোমার কাছে থাকতে ভাল লাগে নৃত্য।

একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল, কেন তা জিজ্ঞেস করলে না?

নৃত্যকালী চোখ তুলিয়া চাহিতে বলিল, বোনের সই ব'লে।

কথাটার মধ্যে কোথায় কি ছিল, নৃত্য খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মুখটা ঢাকিতে গিয়া আঁচলটা নীচে পড়িয়া গেল। তখন হাবুল, যে হাবুল একদিন প্রণাম করিতে গিয়া সামান্য একটু ময়লার জন্য কাকীমাকে সরাইয়া লইয়াছিল, সেই শুচিবিলাসী হাবুল, পরম আগ্রহসহকারে ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটি উঠাইয়া লইল এবং তাহাতে শুচিতার নিতান্ত অভাব থাকিলেও প্রায় বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার পাড়টি তো!

মেয়েটি আজ বেশি হাসিতেছে; আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ভাল কোথায়? কালো নাকি ভাল হয়?

একরঙা, কোন-রকম-নক্সাবিহীন কালো পাড়। একে কালোই, ময়লা কাপড়ে আবার সত্যই তেমন ভাল দেখাইতেছিল না। হাবুল একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, ভাল, মানে—ভাল, অর্থাৎ—তোমার গায়ে বেশ ভাল দেখাচ্ছে।

সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় অঞ্চলটা মুঠায় ভরিয়া লইয়া নিজের নাকে চাপিয়া ধরিল, বোধ করি অধরেও একটু চাপিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, এসেন্স লাগিয়েছ বুঝি নৃত্য? আমার বড্ড ভাল লাগে, বুঝেছ?

নৃত্যকালী মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল, এবং একটু বোধ হয় বেশি করিয়া বুঝিয়াই বলিল, এবাব থেকে ফরসা কাপড়ও প'রে আসব, আজ দিদি—

হাবুল হঠাৎ এতটা সচকিত হইয়া গেল যে, তাহার হাত হইতে আঁচলটা আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, না না, অমন কাজ ক'রো না। সবাই জানে, আমি নোংরা দু-চক্ষে দেখতে পারি না, নিশ্চিন্দি আছি, পরিষ্কার হতে গেলেই সর্বনাশ! ভাববে, মেয়েটা হঠাৎ কেন— তুমি বরং কাপড়টা কেচে এস্সেসের গন্ধটাও ধুয়ে ফেলে দিও।

ছেলেমানুষ, অবুঝ, তাহাকে এমনই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বোধ হয় সেইজন্য টেবিলের উপর হইতে নৃত্যর হাতটা—আলতা আর পুঁইফলেব নীল ছোপ-ধরা হাতটা—তুলিয়া লইয়া নিজের গালে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছ? ফেলবে ধুয়ে? আর, কখনও পরিষ্কার হতে যাবে না? হ'লে ভয়ঙ্কর রাগ করব কিন্তু আমি।

# হোমিওপ্যাথি

## ১

শিবু খুড়ো দিবানিদ্রা উপভোগ করিয়া বেশ বেলা করিয়াই উঠিলেন। হাত-মুখ ধুইয়া কাঁধে ভিজা গামছাটি ফেলিয়া রকের কিনারায় গিয়া বসিলেন এবং চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কোথায় সব, এক ছিলিম পাব নাকি ?

খুড়োর পরিচয়টা একটু দিয়াই আরম্ভ করি তাহা হইলে। কবে যে বিশেষ কাহার খুড়ো ছিলেন, গ্রামের কেহ বলিতে পারে না, তবে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার মুখেই ওই এক সম্পর্কের বুলি। এই আমাদের কথাই ধরি না। কাকা 'শিবু খুড়ো' বলিতেন। আমি জ্ঞান হওয়ার পর দু-একবার 'ঠাকুরদা' বলিবার চেষ্টা করি ; কিন্তু এমন অস্বস্তিকর শোনায় আর নিজেকে এমন গ্রামের বাহিরের লোক বলিয়া বোধ হয় যে, সে প্রয়াস ছাড়িয়া দিই। এই তো আমার অবস্থা। ছেলেটাও সেদিন আসিয়া বলিল, বাবা, শিবু খুড়ো বলেন যে—। বললাম, বেরো, ব্যাটার সম্পর্কজ্ঞান দেখ না !

যা হোক, শিবু খুড়ো রকের কিনারায় আসিয়া বসিলেন। রাঙাখুড়ী পিতলের প্রদীপ আর পিলসুজ মাজিতেছিলেন, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল ; তামাকের ফরমাশ শুনিয়া আরও খানিকটা তেঁতুলের ছিবড়া লইয়া মাজা জিনিস দুইটা আর একবার কষিয়া কষিয়া মাজিতে শুরু করিয়া দিলেন। খুড়ো একবার আড়চোখে দেখিয়া নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলেন ; কারণ, তাঁহার তামাক সাজিয়া লওয়া তো দূরের কথা, নিজের জলটি পর্যন্ত গড়াইয়া লইবার হুকুম নাই।

খুড়ী বলেন, আমি যেদিন ম'রে তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব, সেদিন থেকে নিজে সব ক'রো—আশ মিটিয়ে; তদ্দিন আর এ লোক-দেখানো কেন?

খুড়ো, বিশেষ করিয়া কলিকালে সংসারের অসারতা সম্বন্ধে গুনগুন করিয়া একটি গান গাহিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে পিলসুজ মাজার শব্দটা বেশি ঝাঁজালো হইয়া গেল দেখিয়া থামিয়া গেলেন। তখন তাঁহার মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া গেল, এবং মরিয়া হইয়া খুক-খুক-খুক করিয়া তিনবার একটু কাশিলেন। খুড়ী একবার আড়চোখে চাহিয়া আবার কাজে লাগিলেন।

খুড়ো আবার বুকটা চাপিয়া ধরিয়া চার-পাঁচবার কাশিলেন; বলিলেন, এবার কাশিটা যেন জাঁকিয়ে এল, দিব্যি ক'রে পাড়বে আর কি!

খুড়ী সামনাসামনি হইয়া ফিরিয়া অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, যখন রোগ না থাকবে, তখন তো 'উঃ, গেলাম গো, মলাম গো' করবে; এখন সত্যিই যখন কাশিটা হয়েছে একটু, যাও না একবার নবীন ডাক্তারের কাছে। রাতটা যদি বেড়েই থাকে, নয় একবার ডেকে পাঠাই।

কিসের জন্যে? ওরা সব কি বিশ্বাস করে, আমার কিছু হয়েছে? এই সারা জন্মটা কিছু না কিছু একটিতে ভুগছিই; ওরা কি কখনও বলেছে—হ্যাঁ, শিবু খুড়ো, এই অসুখটা তোমায় কাবু করেছে বটে? আসবে, সেই কাঁকড়াবিছের মত অস্তরটা দিয়ে একবার এখানে টিপবে, একবার ওখানে টিপবে, তারপর 'কই খুড়ো, তোমার তো কিছুই দোষ নেই'—আরে বাপু, আমার কি দোষ? তোরা পারবি নি রোগ ধরতে, আর আমার হবে দোষ?

সে যদি বলে—কোন রোগ নেই তো তাই মেনে নিতে হবে, অত বড় একটা ডাক্তার। তোমার আবার খুতখুতুনি রোগও তো আছে!

ছাই ডাক্তার, অ্যালোপ্যাথিতে আছে কি যে, বড় ডাক্তার হবে? হ্যাঁ, সে কথা কবিবাজি সম্পর্কে বলা চলে। সেই কোন্ ছেলেবেলা অনুকূল কবরেজ শুধু একবার নাড়ীটি টিপে ব'লে দিয়েছিল—সারা জীবনটা নানান খানায় ভুগবে, বাস্, তারপর থেকে নাগাড়ে জের টেনে চলেছি, একটি না একটি লেগেই আছে। সেসব প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। খক-খক-খক—

খুড়ী তামাক সাজিয়া আনিয়াছিলেন, বলিলেন, ধর। আগুনটা ভাল ধরে নি, একটু ফুঁ দিয়ে নাও, ছিষ্টির কাজ প'ড়ে রয়েছে। না, দাও, কাজ কি ওটুকু উবগারেতে, আমিই ধরিয়ে দিচ্ছি। কাঁধ থেকে ভিজে গামছাটা নামিয়ে কেতাত্ত কব দিকিন, এই সব অত্যাচারেই, আর সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমিয়ে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়েছে। হবে না!

ওইঃ, ওইখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না। ডাক্তারে এসেও ওই কথাই বলবে, বিদ্যেবুদ্ধিতে মেয়েমানুষের সামিল কিনা। অথচ যার রোগ সে বলছে, না, ওই শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়েছে ব'লেই সন্ধ্যে পর্যন্ত উঠতে পারি না। কিন্তু কে শোনে, নিজের কথাই পাঁচ কাহন। এই সব দেখে-শুনেই তো শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথি বইটা কিনলাম। হ্যাঁ, একটা শাস্ত্র বটে! পাওয়া গেল বইটা? খোঁজ না, দেখি একবার কি ওষুধ বলে এমন অবস্থার! খক-খক-খক—

কি! আবার তুমি ব'স তো তোমার সেই জগদ্দল বই আর মাকড়শার ডিম ভরা শিশি নিয়ে, কি কাণ্ডটা করি দেখ তো! বই গেছে, আপদ গেছে; রাজ্যির রোগ বিদেয় হয়েছে। থাকলেই পাতা

ঘেঁটে ঘেঁটে মিলিয়ে মিলিয়ে হরেক রকম রোগ জড়ো করবে। আমার শরীরটাও তো ওই ক'রে পাড়বার চেষ্টা করেছিলে।

শিবু খুড়ো চুপ করিয়া গেলেন। বুকটা চাপিয়া খুব জোরে কয়েকবার কাশিয়া বলিলেন, হু-হু ক'রে বেড়ে চলেছে; এইখানটায় যেন একটা ব্যথাও উঠছে ব'লে বোধ হচ্ছে।

রাঙাখুড়ী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, তা হ'লে নবীন ডাক্তার কাল এসে একবার দেখুক, কচি খোকার মত বায়নাক্কা চলবে না, এই ব'লে দিলাম।

আর নবীন ডাক্তার যদি তোমার মত এসে বলে, ও কিছু নয়, রাত্তিরবেলা ঘুমিয়ে একটু শ্লেষ্মা হয়েছে?

রাঙাখুড়ীর বিদ্রূপটুকু ধরিতে দেরি হইল না; অধর দংশন করিয়া বলিলেন, বটে! তাহার পর সহজভাবেই বলিলেন, তা হ'লে নিশ্চিন্দি হব, বুঝব, এ তোমার সেই চিরকেলে বুজরুকি।

তুমি নিশ্চিন্দি হবে আমি ম'লে।—ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কিন্তু খুড়ো আর সেখানে বসিতে সাহস করিলেন না; হুঁকা লইয়া হনহন করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

রাঙাখুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, দেখ, বাড়তে বাড়তে মুখ বেড়েই যাচ্ছে। যত মনে করি, সামনে সাবিত্রীর বেরতোটা আসছে, কাজ কি কথা ক'য়ে; কিন্তু তোমার ইচ্ছে নয় যে, কেউ মুখ বুজে থাকে। বলি, মরার ভয় দেখাও কাকে গা? 'ম'লেই নিশ্চিন্দি হও'! হ্যাঁ, হইই তো; এস, এইবার মুখ খুলেছে, আজই মর না—ওঃ, বড় সুখের সংসার, বড় সোহাগের সোয়ামী! আমার আবার ঘটা ক'রে সাবিত্রীর বেরতো, ঢাক পিটিয়ে লোক-হাসানো! যম কোন্ সাহসে তোমায় নেবে? তারও গেরস্তর ঘর, একেবারে উস্তম-কুস্তম হয়ে যাবে না?

ভাবলাম, বেরতোটা আসছে, ক্রমাগতই ঘাটের রুগীর মত খক-খক করবে কেন, দেখুক ডাক্তার একবার। ও—ম্মা!

## ২

তাহার পরদিন বিকালে রাঙাখুড়ী ঘুঁটে দেওয়ার জন্য গোবরের তাল মাখিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বাম হাতে আঁচল ধরিয়া চক্ষু মুছিতেছিলেন, এমন সময় নবীন ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, কি গো রাঙাখুড়ী, খুড়ো আবার কি হিড়িক লাগিয়েছে?

খুড়ী বাম হাতের উলটা দিক দিয়া মাথার কাপড়টা ঠিক করিয়া লইলেন, কহিলেন, কে জানে বাপু, কাল বিকেল থেকে তো কাশতে আরম্ভ করেছেন, আর ক্রমাগতই 'এবার আর ব্রতর যোগাড় ক'রে কি হবে' এই বুলি। রোগ আছে কি নেই, শুধু মনের সন্দোতে এ রকম গাল-পাড়া কার সহ্যি হয় বল তো বাছা? তাই অভিরামকে বললাম, নবীনকে একবার আসতে বলিস। যাও, দেখ একবার।

নবীন ডাক্তার ভিতরে গিয়া ডাকিল, খুড়ো, কোথায় আছ গো?

এই যে ভাই, এস, হঠাৎ কি মনে ক'রে?—বলিয়া শিবু খুড়ো রকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আব যে যাহাই করুক, তিনি কাহাকেও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাষণ করেন না।

প্রশ্ন শুনিয়া নবীন একটু থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু খুড়োকে সে কিছু আজই দেখিতেছে না। সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, না, এই এদিক দিয়ে একবার পালেদের ওখানে যাচ্ছিলাম, রাঙাখুড়ী বললেন, তোমার নাকি একটু কাশি হচ্ছে কাল থেকে, তাই—

কাশি!—বলিয়া খুড়ো যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। আর তুমি

এত বড় ডাক্তার হয়ে সেটা বিশ্বাস ক'রে নিলে? আমার কখনও অসুখ হ'তে দেখেছ তোমরা?

নবীন ডাক্তার মনে মনে হাসিয়া বলিল, না, অমন নীরোগ শরীর তো দেখাই যায় না। আমি রাঙাখুড়ীকে সেই কথাই তো বলছিলাম। বললেন, তবুও তুই একবার দেখে আয় বাপু; বাজে খকখকানি শুনে শুনে আমার পিত্তি জ্ব'লে খাক হয়ে যাচ্ছে।

খুড়ো অত্যন্ত বিরক্তভাবে মুখটা একটু কুঁচকাইয়া রহিলেন; বলিলেন, না না, ওসব মেয়েলী কথায় কান দিও না। আমার আবার অসুখ! আর অসুখ হ'লেই বা কবি কি বল,—সংসারে কে কার?

সে কি কথা খুড়ো? তবে হ্যাঁ, রাঙাখুড়ীর আবার একটু রোগ-বাই আছে—মেয়েমানুষ কিনা। আচ্ছা, তবে আসি।—বলিয়া নবীন বাহির হইয়া যাইতেছিল, খুড়ো খক-খক করিয়া দুইবার কাশিলেন। নবীনের ঠোঁটে একটু চটুল হাসি দেখা দিল, পিছন ফিরিয়া যাইতেছিল বলিয়া খুড়ো সেটা দেখিতে পাইলেন না। দাঁড়ায় না দেখিয়া খুড়ো আরও জোরে তিন-চারবার কাশিলেন, এবং তাহাতেও ফল হইল না দেখিয়া অস্ফুটস্বরে ডাক্তারকে 'হারামজাদা, বদমায়েস' বলিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, এই রকম এক-আধবার কাশছিলাম, কি রকম বোধ হচ্ছে বল তো? তোমার কানটা এই বয়সেই যায় বুঝি, একটু নজর রেখো।

নবীন হাসি সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, খুব সহজ কাশি খুড়ো; না ব'লে দিলে কানেই লাগে না, এর জন্যে রাঙাখুড়ী যে কেন ভেবে মরছেন—

আচ্ছা, যখন এসেছ, দেখবে তো একবার দেখে নাও তোমার সেই আদাড়ে যন্ত্রটা নিয়ে—কেন যে ওগুনো ব্যবহার কর তোমরা, বুঝতে পারি না।

নবীন আর একটা হাসি কোনমতে চাপিয়া বলিল, তা হ'লে চল একবার ঘরে।

খুড়োকে বিছানায় শোয়াইয়া নবীন স্টেথোস্কোপ দিয়া বুক পিঠ চারিদিক পরীক্ষা করিল। দুষ্টামি করিয়া সত্য কথাটাই বলিল, দেখছি, তোমার কথাই ঠিক খুড়ো ; হার্টের অ্যাক্‌শন দিব্যি চলছে, কোনও দোষ নেই বুকে।—বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্টেথোস্কোপটা গুটাইয়া-সুটাইয়া পকেটে পুরিল।

খুড়ো শুইয়া শুইয়াই দুই-তিনবার কাশিলেন, তাহার পর অনেক দিনের রুগীর মত নাক-মুখ সিঁটকাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া একবার পকেটের যন্ত্রটার দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, কত দিয়ে কিনেছিলে ?

তেরো টাকা দিয়ে।

একে জিনিসগুলোই ভুয়ো, তারপর আবার সস্তার মাল। ডবল নিউমোনিয়া হ'লে ওতে কিছু সাড়া পাও ? আমার যেন মনে হচ্ছে, বুকে হয়েছে একটা কিছু। তা থাক্, ও তোমাদের কর্ম নয়, একবার অমর্ত কবরেজকে ডাকতে হচ্ছে। তাদের এসব ভড়ং-টড়ং নেই, নাড়ী দেখেই ধ'রে দেবে 'খন।

কাকে ডাকতে হচ্ছে ?—বলিয়া হাতের আঙুলের গোবর পরিষ্কার করিতে করিতে রাঙাখুড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া উগ্র শাসনের স্বরে বলিলেন, নবীন যা বলে, তাই হবে ; অন্য কবরেজ-বদ্যি বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে পাবে না, এই ব'লে দিলাম।—বলিয়া ত্রিসীমানার নিশানা-স্বরূপ দেওয়ালে একটা গোবরের বৃত্তাংশ টানিয়া তাঁহার বিধান সম্বন্ধে রোগীর মতামত জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

বলা বাহুল্য, রোগী কোন মতামত দিল না। রাঙাখুড়ী ডাক্তারের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি রকম দেখলে বাবা? সত্যি, না, আমার হাড়-জ্বালানো বুজরুকি? আমার তো মনে হয়, এতটুকুকে এতখানি করা হচ্ছে।

খুড়ো দুইবার জোরে কাশিয়া হাঁপাইয়া বলিলেন, না, বুজরুকি—দেখতে পাচ্ছ না?—বলিয়া বুকটা চাপিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আবার কাশিলেন।

ডাক্তার রাঙাখুড়ীরই সমর্থন করিয়া বলিল, সামান্য একটু যেন সর্দি হয়েছে ওপরে ওপরে। একটা ওষুধ দিচ্ছি; কাশিটা শুকনো না থেকে নরম হয়ে যাবে 'খন।

হ্যাঁ, দাও, খান। আমার মিছিমিছি ঢঙ অসহ্যি, চোপোর দিন মিছামিছি গালাগালও অসহ্যি। কেন গা, কিসের জন্যে?

ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া বলিল, এইটে দুবার ক'রে খেও। আর খুড়ো, তামাকটা একটু কমাও এ কটা দিন, তার পরে তো আছেই।

শিবু খুড়োর পিত্তি জ্বলিয়া যাইতেছিল, বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার হাত থেকে বেরিয়ে আবার আমি বেঁচে থাকলে, তবে তো? সাবিত্রীর কাজ অনেক সোজা ছিল, তাকে তো আর তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় নি। যমকে ঠেকানো অনেক সোজা।

খুড়ী গর্জিয়া উঠিলেন, দেখ! তাহার পর বাঁ হাতে নবীনের হাতটা খপ করিয়া ধরিয়া বলিলেন, ওঠ, এক্ষুনি ওঠ; এ পাপপুরীতে এসে মিছিমিছি গাল খেয়ে মরছ গা! ওর কি কিছু হিতাহিত-জ্ঞান আছে? চোখের একটু পরদা আছে? মরবার সাধ হয়েছে তো মরুক, ওইখানে প'চে গ'লে মরুক; কার ব'য়ে গেছে? বেরতো নিয়ে

কথায় কথায় এত ঠেস দেওয়া কিসের? আহা, ভারি আমার সত্যবানের মত সোয়ামী, সোয়াগ ক'রে সাবিত্রীর বেরতো করতে বসেছি! মুয়ে আগুন আমার, মুয়ে আগুন আমার বেরতোর, আর মুযে আগুন তার, যে—

খুড়ো রাঙাখুড়ীর দিকে চাহিয়া খক-খক করিয়া তিনবার কাশিলেন। ডাক্তার বলিল, আর থাক্ খুড়ী; ওষুধটা যেন খাওয়ানো হয় ঠিক রকম।

৩

শিশির ঔষধ কয়েক দাগ শেষ হইয়াছে। খুড়ো যে সেবনের দ্বারাই শেষ করিয়াছেন, রাঙাখুড়ী এ কথা বিশ্বাস করেন না। সর্দিটা আরও একটু বাড়িয়াছে। খুড়ী বলিতেছেন, নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে কুপথ্যি করেছ, কোনও গুণে তো ঘাট নেই।

খুড়ো বলিতেছেন, অ্যালোপ্যাথি ওষুধটাই একটা মস্ত বড় কুপথ্যি যে।

খুড়ী বলিলেন, কিংবা বোধ হয় দাগের দাগ ঢেলে নিযে ফেলে দিচ্ছ; তুমি সেও পার।

খুড়ো উত্তর দিলেন, তা যে করি নি, তার প্রমাণ অসুখটা বেড়ে গেছে; কমে নি।

খুড়ী রাঁধিতেছিলেন। আর কিছু না বলিয়া কড়াটাতে খুন্তির গোটাকতক ক্রুদ্ধ ঘা দিয়া অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত হাতটা ধুইয়া ফেলিলেন। ঘর হইতে শিশিটা বাহির করিয়া ক্রোধকম্পিত হস্তে হড়হড় করিয়া খানিকটা ঔষধ গেলাসে ঢালিয়া কৃত্রিম শান্ত স্বরে বলিলেন, খেয়ে ফেল।

খুড়ো অকৃত্রিম শান্ত ও করুণ স্বরে বলিলেন, প্রায় আড়াই দাগ যে!

রাঙাখুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, দেখেছি আড়াই দাগ। অনেক দেখে দেখে চোখ দুটো ক্ষ’য়ে গেছে বটে, কিন্তু কানা হই নি একেবারে। নাও। নেবে? না—

খুড়ো ভয়ে ভয়ে বলিলেন, এই দাও না; আমি শুধু বলছিলাম, পুরো তিন দাগ ক’রে দিলে হ’ত না? হিসেব ঠিক থাকত।—বলিয়া একটুও মুখ বিকৃত না করিয়া ভাল ছেলের মত দুই দাগ ঔষধ গিলিয়া ফেলিলেন; তাহার পর আবার কহিলেন, নবীন নেহাত মন্দ ডাক্তার হয় নি, কি বল? খক-খক-খক—একটু যেন বেড়েছে আজ।

রাঙাখুড়ী বলিলেন, মন্দ হতে যাবে? অমন নামডাক বেরিয়েছে কি অমনই?

হুঁ। তবে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কিনা, রোগ সারাতে পারে না, এই যা। তা সে তো আর ও-বেচারীর দোষ নয়। এই দেখ না, সর্দিটা বেড়ে গেছে, বললাম; তা বললে, আয়োডাইড দিয়েছি কিনা, সর্দিটাকে নরম করবে একটু। অথচ আমি জানি, আসলে তা ব্যাপার নয়। তুমি দেখছি বড় অত্যাচার কর নিজের শরীরের ওপর; এখনও স্নান কর নি বুঝি? আবার সামনে অমন পাহাড়-পানা ব্রতটা আসছে।

রাঙাখুড়ীর মেজাজ জল হইয়া গেল; বলিলেন, নাও, তুমি সুভালয়-ভালয় সেরে ওঠ বাপু, তখন আমার বেরতো আর অর্চা।

তুমি পড়লেও তো আমার মনেও এই কথাই হবে? না, ছেলেমানষি রাখ; আগে নেয়ে নাওগে। কদিনে যেন আধখানা হয়ে গেছ।

যাই; হ্যাঁ, কি বলছিলে? সর্দিটা কেন বেড়েছে?

নবীন তো বলছে, আয়োডাইড দিয়েছি, তাই একটু নরম হয়েছে সর্দিটা। অথচ আমি জানি, কি ব্যাপার; কাল অমাবস্যা গেল, তাই

একটু রস বৃদ্ধি হয়েছে। এসব কথা কবরেজ হ'লে সট ক'রে ধ'রে ফেলত। শাস্ত্র তো কবিরাজি, নাড়ীটা টিপলে, তারপর অনর্গল রোগের কুলুজি আওড়ে গেল ; আর দ্বিতীয় কথাটি—না, আমি অমর্ত কবরেজকে ডাকতে বলছি না ; তবে শত্রুরও যশ গাইতে হয়।

তোমার কবরেজকে যদি বিশ্বাস হয় তো না-ডাকবেই বা কেন ? আগে বললেই হ'ত। সত্যিই তো বাপু, রোগ কোথায় কমবে, না, বেড়েই যাচ্ছে। অথচ প্রায় আড়াই দাগ ওষুধ একসঙ্গে দিব্যি খেয়ে ফেললে। তুমি আমায় বল, অথচ নিজের শরীর সম্বন্ধে তোমারই নিজের কোন চাড় নেই ; তা হক-কথা বলব বাপু, হ্যাঁ।

যাঃ, মাছ চড়িয়ে এসেছিলে বুঝি ? গেল বুঝি পুড়ে। ওই তো একমুঠো খাওয়া তোমার, তাতে মাছটা গেল পুড়ে ! একবার নয় দেখব জেলেপাড়ায় ?

না, তোমার আর অসুখ-গায়ে বেরুতে হবে না। ঠাকুর দয়া ক'রে আমার পোড়া মাছটুকুই জন্ম জন্ম বজায় রেখে যান—এই ভিক্ষে ( চক্ষে অঞ্চল দিলেন )। তোমার সাবুটুকু আগে দিই, তবে নাইব। তা হ'লে বাপু, আসুক অমর্ত কবরেজ একবার ; ও আদাড়ে ওষুধ আর খেয়ে কাজ নেই। কি যে আমার অদিষ্টে আছে, মা সতীরাণীই জানেন।

দিনটা বেশ অভঙ্গ শান্তিতে কাটিল। রাঙাখুড়ী ক্রমাগতই খুড়োর চিকিৎসা সম্বন্ধে সমস্ত অভিমতে সায় দিয়া গেলেন, এবং খুড়ো সকরুণ কাশি এবং তাঁহার প্রতি চিকিৎসা-জগতের নিদারুণ কাহিনীর দ্বারা খুড়ীর করুণা উদ্রেক করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার দিকে খুড়ো মনের শান্তিতে বিছানায় শুইয়া শুইয়া তামাক টানিতেছিলেন, বাহিরে অমৃত কবিরাজের গলা শোনা গেল, খুড়ো !

খুড়ো আপনি আপনি বলিলেন, বাব্বাঃ! খবর পেয়েছে কি

ছুটেছে, কেউ তো আর ডাকে না ওদের! এক গেলেন তো আর এক জ্বালাতে এলেন! ডাকিলেন, এই যে, এস। তাহার পর র‍্যাপারটা টানিয়া লইয়া বিরক্তভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অমৃত কবিরাজ ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, রাঙাখুড়ী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কি, অসুখটা কি?

খুড়োর কাশি আসিতেছিল, প্রাণপণে চাপিয়া সেইরূপ অবস্থাতেই বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, দেখই না বাপু; তোমাদের তো আবার সেই গুমরটুকু ষোল আনা আছে যে, নাড়ী দেখেই হাঁড়ির খবর পর্যন্ত ব'লে দিতে পার। আমায় আর তবে বকাও কেন; একে কোমরের বেদনায় মরছি—

অমৃত কবিরাজ বাড়িটার সহিত খুব পরিচিত ছিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, রাঙাখুড়ী গেলেন কোথায়?

অসুখ তার নয়, আমার।—বলিয়া খুড়ো উঠিয়া বসিয়া খক-খক করিয়া কাশিয়া বলিলেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে শুয়ে শুয়ে; কদিন থেকে সর্দিতে ভুগছি, নবীন ডাক্তার অত বড় অ্যালোপ্যাথ, সে-ই হার মেনে গেল তো তোমাদের গাছগাছড়ায় কি করবে বল? বাঁ হাত, না, ডান হাত দেখবে?

কবিরাজ বিনাবাক্যব্যয়ে খুড়োর বাঁ হাতটা তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল, একটু পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ, দুটো দিন উপোস দিতে পার?

খুড়ো বিরক্তভাবে চাহিয়া বলিলেন, কেন, দিনান্তে ছটাক-খানেক যে সাবু খাচ্ছি, সেটা কি ভূরিভোজন হয়ে যাচ্ছে নাকি? বল তো তাও বন্ধ ক'রে দিই; তোমাদের আশ মেটে, গিন্নীরও আমার জন্যে বাজে মেহন্নৎ একেবারে জন্মের মত ক'মে যায়। না বাপু, তোমাদের

এ কর্ম নয়। গিন্নীকে একশো বার বললাম, ওগো, এ কালরোগে ধরেছে, একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর। কে শোনে? একবার কবিরাজিটা দেখ্‌ই না! আরে বাপু, কবিরাজি তো তুমিও করতে পার। ক্রমাগত মাসখানেক ধ'রে উপোস করাও আর জোলাপ দাও—উপোস করাও আর জোলাপ—

খুড়ী আধা-ঘোমটা টানিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, খাটের দিকে চাহিয়া কবিরাজকে প্রশ্ন করিলেন, কি রকম দেখা·হ'ল?

তেমন কিছু নয়; একটা উপোস দিলেই শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে; একটা বড়িও দিয়ে যাচ্ছি। খুড়ো কিন্তু উপোসের নামে—

খুড়ো তাড়াতাড়ি জুড়িয়া দিলেন, মহাখুশি। তা তোমার খুড়ীও জানেন, উপোস পেলে আমি রাজত্বও চাই না, অমন জিনিস আছে? —বলিয়া কথা যাহাতে না বাড়ানো হয়, সেজন্য অমৃত কবিরাজের দিকে মিনতির দৃষ্টিতে চাহিলেন।

খুড়ী দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, খাওয়া তো কিছুই নেই; এক চুমুক ক'রে সাবু খান; এর ওপর আবার উপোস! আমি তো বলছিলাম, শুকনো শুকনো কিছু যদি একটু খেতে দিতে—। শরীরে কিছু নেই ভুগে ভুগে, দুনিয়ার অরুচি।

অমৃত কবিরাজ মনে মনে বলিল, তোমাদের অন্ত পাওয়া দায়। প্রকাশ্যে কহিল, তা উপোস যে নেহাতই দরকার, তেমন কিছু নয়। ঘি মরিচ দিয়ে দুটো চিঁড়েভাজা খেতে পারেন। কিংবা—খুড়ো, কি খেতে মন যায় বল দিকিন?

খুড়ো উৎফুল্লভাবে 'গরম গরম' বলিয়া আরম্ভ করিতে যাইতে-ছিলেন, খুড়ী বলিয়া উঠিলেন, পোড়া কপাল আমার, উনি এক্ষুনি ব'লে বসবেন, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিছরি আর নেবুর শরবৎ হ'লে ভাল হয়। আর

মেলা লোভ বাড়িয়ে কাজ নেই। অভিরামকে সঙ্গে দিচ্ছি, ওষুধটা তা হ'লে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

খুড়ো ভগ্নোৎসাহ হইয়া করুণভাবে কয়েকবার কাশিলেন। 'গরম গরম' কি তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস হইল না, কবিরাজ চলিয়া গেলে রাঙাখুড়ীর মন যোগাইবার জন্য বলিলেন, ভাগ্যিস তুমি ছিলে, নইলে উপোস করিয়েই আমার দফা—

খুড়ী কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত বলিলেন, কেন, উপোসটা কি খারাপ জিনিস, না, ডাক্তার-বদ্যিরা মুখ্যু ?

খুড়ো থতমত খাইয়া বলিলেন, না, উপোস জিনিসটা তো খুবই ভাল ; আমিও তো—

খুড়ী আরও একটু রাগিয়া বলিলেন, ভাল ব'লে কি তোমার এই কাহিল শরীরে এখন শোভা পায় ?

খুড়ো ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া 'না—সে আমি—তোমার গিয়ে' করিতেছিলেন।

ধমক দিয়া খুড়ী বলিলেন, আর থাম বাপু, জ্বালিও না।

খুড়ো চুপ করিয়া রহিলেন, একটু পরে বলিলেন, হোমিওপ্যাথির সেই বইটা পাওয়া গেল ?

খুড়ী বিছানাটা গুছাইতেছিলেন, গম্ভীরভাবে বলিলেন, গেল।

এ 'গেল'র অর্থ বুঝিতে খুড়োর বাকি রহিল না। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, শাস্ত্রটা উঁচুদরের ; ওটা বের করতে কত লোকে যে প্রাণপাত করেছে—

খুড়ী সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ; তাহার পর স্থির কণ্ঠে বলিলেন, তা হ'লে আসল কথাটা বলব ? তোমার মত হাজার লোকেও

প্রাণপাত করলে সে শাস্তোর আর বের করতে পারবে না, তাকে অনেক দিন উনুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছি।

৪

ভগবানের 'চিড়িয়াখানা'য় এক প্রকৃতির মানুষ আছে, যাহারা অসন্তুষ্ট থাকিলেই ভাল থাকে। পৃথিবীর সর্বপ্রকার শুভ-অশুভ, সর্বপ্রকার আনন্দ-উৎসবের দিকে তাহারা সমানভাবে নাসিকা কুঁচকাইয়া সারাটা জীবন যদি কাটাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই ভাবে, সার্থকতার চরম হইল। প্রকৃতি দেবী তাঁহার এই রকম খুঁতখুঁতে সন্তানদের লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়েন এবং সাধ্যমত তাহাদের হাতের কাছে বিশেষ করিয়া সুখের এবং স্বস্তিব সরঞ্জাম আগাইয়া দিয়া মন যোগাইবার চেষ্টায় থাকেন; কিন্তু ফল হয় ঠিক উলটা। তাহারা নিজের মনের তিক্তরসে সব জিনিসই জরাইয়া লইয়া মুখটা চিরকালই বিকৃত করিয়া থাকে। মাঝে পড়িয়া বিশ্ব-সংসারের আনন্দ-উপকরণের খানিকটা অপচয় ঘটে মাত্র। স্নেহান্ধ সকল মায়ের মতই প্রকৃতি-মায়ের এ ভুলটা রহিয়াই গেল।

আমাদের খুড়ো ঠিক এই প্রকৃতির লোক। কিছুরই অপ্রতুল নাই, অথচ অসন্তোষেরও সীমা নাই। খুড়োর কাণ্ডকারখানা দেখিলে এই রকমই মনে হয় যে, বিধাতার ভাল-মন্দ সমস্ত বন্দোবস্তই নিরপেক্ষভাবে পণ্ড করিবার অভিসন্ধি লইয়াই তাঁহার জীবন। সব ছাড়িয়া তাঁহার এই শরীরের কথাই ধরা যাক না। অসুস্থ থাকাটা যেমন কেহই পছন্দ কবে না, সেই রকম তিনিও করেন না; কিন্তু সুস্থ থাকিলে আরও চটিয়া যান। এইজন্য, যেমন অষ্টপ্রহর ডাক্তার-বৈদ্য না

হইলে চলে না, সেই সঙ্গে ইহাও সমানভাবে সত্য যে, ডাক্তার-বৈদ্য দেখিলেই তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে এবং কথায় কথায় তাহাদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য সজাগ থাকেন। শুধু বাক্যের দ্বারাই নহে, কায়মনের দ্বারাও, অর্থাৎ প্রায়ই নিজের বিবেক এবং কখন কখন নিজের স্বাস্থ্য বলি দিয়াও—

আসলে কোন রোগই ছিল না খুড়োর, শখের কাশি কাশিয়া যাইতেছিলেন। রাঙাখুড়ী যে সেই আড়াই দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন, সেই হইতে একটু কাশি হইয়াছিল। কবিরাজী ঔষধ খাইয়া সেটুকুও সারিয়া গেল। অবশ্য কাশি সেই রকমই চলিয়াছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজির নিন্দা। খুড়ী থাকিলে বাড়ে, কাশির জ্বালায় তিনি তো পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়াছেন।

বিকালবেলা। রাঙাখুড়ী বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিতে অনেকক্ষণ লাগিবে। খুড়ো সুস্থ শরীরে নিশ্চিন্ত মনে কাশি-টাশি বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া তামাক টানিতেছেন এবং টানের ফাঁকে ফাঁকে কখনও নীচু গলায়, কখনও বা ভাবের আধিক্যে গলা উঁচু করিয়া দেহতত্ত্ববিষয়ক একটা রামপ্রসাদী গাহিয়া যাইতেছেন। অমৃত কবিরাজ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। রাঙাখুড়ী আছ নাকি?—বলিয়া একটা হাঁক দিতে যাইতেছিল, কিন্তু খুড়োর অসমসাহসিক গান শুনিয়া বুঝিল, খুড়ী বাড়ি নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিল, তাহার পর নিঃশব্দে দুয়ার পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ একেবারে সামনাসামনি হইয়া কহিল, এই যে খুড়ো, ভাল আছ দেখছি, কাশিটা তো একেবারেই নেই।

পরাজয়ের ক্ষোভে খুড়োর প্রথমটা বাক্যস্ফূর্তি হইল না। মূঢ়ের মত একটু চাহিয়া সামলাইয়া লইবার জন্য একবার কাশিয়া লইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার গিয়ে একটু যেন আজ—

কবিরাজ শেষ করিতে না দিয়াই বলিল, না, একটু কেন? বেশই ভাল আছ। আমি এই প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর এসে বাড়িতে ব'সে আছি কিনা; ভাবলাম, সাড়াশব্দ নেই, এরা সব কোথাও গেছেন নিশ্চয়, একটু ব'সে যাই। তা কই, অত যে কাশি ছিল তোমার, একবারও তো শুনতে পেলাম না। কেউ ফিরছে না দেখে উঠছিলাম, এমন সময় তোমার গান কানে গেল, দিব্যি শ্লেষ্মালেশহীন গলা!

খুড়োর নিজের এই অসতর্কতার জন্য আত্মধিক্কারে মনটা ভরিয়া গিয়া মুখটা বিকৃত হইয়া গেল।

তখন ভাবলাম, বাবা, গঙ্গাধর সেনের নিজের বিধান মিলিয়ে তোয়ের করা ওষুধ, এর আর নড়চড় হবার জো আছে!

খুড়ো মুখটা নামাইয়া শুনিতেছিলেন; কুটিল আড়চোখে একবার দেখিয়া আবার চক্ষু নামাইয়া লইলেন; শুধু বলিলেন, হুঁ, তা একদিনের ফলে কিছু বোঝা যায় না, কালও একবার এস।

দরকার হবে না, রোগের গোড়া মেরে ফেলেছি খুড়ো, গঙ্গাধর সেনের নিজের গড়া সূত্র—'শ্লেষ্মায়াং পিত্তযুক্তায়াং'—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি একেবারে। আর আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন কিনা, 'অমৃত' নাম নিতে অজ্ঞান হতেন।

খুড়ো মুখ টিপিয়া একটু মাথা নাড়িলেন। নাম নিতে অজ্ঞান হতেন! আর মলেন বুঝি হাতের ওষুধ খেয়ে? যাক, তুমি কাল একবার এস। কাশিটা হঠাৎ চাপা পড়ল, আমি তেমন ভাল বুঝছি না, বোধ হয় চিকিৎসার কোন দোষ হয়েছে।

তা নয়, আসব 'খন একবার বেড়াতে বেড়াতে। আজ রাত্তিরটা একটু সাবধানে থেকো।

খুড়ো একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, অত বড়াইয়ের পর

তেরাত্তিরের ভয় ঢুকল নাকি? তোমাদের কবিরাজিকে চিনতে পারলাম না দাদা।

অমৃত কবিরাজ হাসিয়া জবাব দিল, আমাদের কবিরাজি কিন্তু তোমাকে— এই গিয়ে, তোমার অসুখকে টপ ক'রে চিনে ফেলেছে খুড়ো। কেমন, নয়? আচ্ছা, আসি।

খুড়ো বলিলেন, এস। কবিরাজ পিছন ফিরিলে, চাপা গলায় বলিলেন, বেটা গোয়েন্দা কোথাকার! আচ্ছা র'স, জান কবুল।

তাহার পর অসাবধান নিজেকে এবং দাম্ভিক গঙ্গাধর-শিষ্যকে জব্দ করিবার জন্য উঠিলেন। ভাঁড়ার-ঘরের তাকে একটা বড় বাটিতে এক বাটি দই ছিল; তাহার প্রায় অর্ধেকটা সাবাড় করিয়া, বেরাল গিয়া যাহাতে তাঁহার কীর্তি ঢাকা দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দুয়ারটা খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিলেন। তাহাব পব তামাক সাজিয়া, আর যাহাতে ভুল না হইযা যায় সেই মতলবে, হুঁকায় মুখ দিয়া সুদে আসলে কাশি শুরু করিয়া দিলেন।

খানিক বাদে রাঙাখুড়ী ফিরিলেন, প্রশ্ন করিলেন, কি বললে অমর্ত কবরেজ?

খুড়ো খুব জোরে কাশিতে কাশিতে ভাঙা ভাঙা কথায় বলিলেন, কাশির আওয়াজ শুনতেই পেলে না।

খুড়ী কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তাহার পরেই রান্নাঘরের খোলা দোরে চক্ষু পড়িল, ওই গো, সব্বনাশ হয়েছে!— বলিয়া ছুটিলেন।

দইয়ের ছত্রাকার! বিড়ালটা ইতিমধ্যে কখন আসিয়া বাটি ফেলিয়া দই ছড়াইয়া খুড়োর দোষ নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছে।

খুড়ো হুঁকায় দুইটা টান দিয়া বার চারেক কাশিয়া নির্লিপ্তভাবে

একবার চাহিয়া বলিলেন, দোরটা বুঝি খুলে রেখে গিয়েছিলে? তা বেরালের তো আর সর্দি হয় নি যে, কবরেজের শাসন মানতে—

আর শেষ করিতে হইল না; খুড়ী রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া দুইটা হাত ঝাঁকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর তুমি কোন্ চুলোয় ছিলে? একটা বেরাল তাড়িয়েও উবগার জীবনে হ'ল না? কি কাজে এলে? কোথায় গেল অলপ্পেয়ে বেরাল? মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন। পেলে একবার দই খাওয়ার শখটা জন্মের মত ঘুচিয়ে দিই—পাড়ার আবাগীরা বেরাল পুষেছে—নিজেদের পেটে খুদ জোটে না, বেরালের দই-ক্ষীর চাই, যে মুখে দই খেয়েছে, সে মুখে নুড়ো জ্বালব, তবে—

খুড়ো দই-খাওয়া মুখের সম্বন্ধে এ রকম উৎকট গালাগালি আর সহ্য করিতে না পারিয়া সদয়ভাবে বলিলেন, আর থাকগে—আহা, ষষ্ঠীর বাহন—

খুড়ী আরও ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, হক-কথা বলতে ডরি না, বলি আমার আবার ষষ্ঠীর বাহন কি গা? একটাও পেটে ধরলাম? ভারি আমার ষষ্ঠী! তাঁর বাহনকে আবার সোহাগ ক'রে দই-সন্দেশ খাওয়াতে হবে! ভাগাড়ে দোব না অমন দই-খেকো—

খুড়োর মুখে তখনও দইয়ের স্বাদ লাগিয়া রহিয়াছে; আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমার আবার সাবিত্রী-ব্রত কেন গা? এ গালগুলো কি আমার ওপর পড়বে না?

রাঙাখুড়ী একেবারে থ হইয়া গেলেন; চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া ঠাণ্ডা আওয়াজে প্রশ্ন করিলেন, তোমার ওপর পড়বে! কেন শুনি?

খুড়ো সেই মেজাজেই বলিলেন, পড়বে বইকি, একশো বার পড়বে—

রাঙাখুড়ী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমার দোষেই যদি দই খেয়ে গিয়ে থাকে তো বেরালের মুখে আগুন দেওয়ার মানেটা কি? তাকে ভাগাড়ে দিলে কে ভাগাড়ে গেল? আমি কি ঘাস খাই? এটুকু আর বুঝতে পারব না? ভাগাড়ে তো গিয়েই আছি—অষ্টপ্রহর গালমন্দ খেয়ে খেয়ে আর শরীরে—থক-থক-থক—শরীরে আছে কি?—সাবিত্রী-ব্রতর এইবার তো উদ্‌যাপন? যম আসবে, আর দুজনায় ছেঁড়াছিঁড়ি প'ড়ে যাবে—

রাঙাখুড়ী একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া শেষকালে বলিলেন, এই তো? বলি, এই তো? আচ্ছা, রইল এ সংসার। আবার যদি এ সংসারের কোন কথায় থাকি তো আমার অতি বড় কোটি দিব্যি। উড়ে যাক, পুড়ে যাক, যা কিছু হোক।—বলিতে বলিতে রান্নাঘরে আঁচল বিছাইয়া উবুড় হইয়া শুইয়া বর্তমান ঘটনার সহিত নিঃসম্পর্ক নানা কথা তুলিয়া কান্না শুরু করিয়া দিলেন।

খুড়োকে আজ আর জোর করিয়া কাশিতে হইতেছে না—দই যেন কথা শুনিয়াছে। কাশির চোটে রাঙাখুড়ী ত্যক্তবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খুড়োর মনটা খুব প্রসন্ন। কথা-কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। খুড়ী বলিয়াছিলেন, যত ডাক্তার-বদ্যি দেখছে, ততই কি তোমার রোগ বেড়ে যাচ্ছে? পেঁচার সবই উলটো?

খুড়ো উত্তর দিয়াছিলেন, সাবিত্রী-ব্রতের আগে সোয়ামী মরবার কথা কিনা—একের পর এক যমদূত আসছে।

রাঙাখুড়ী কাজের মধ্যে হঠাৎ থামিয়া 'কি!' বলিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্যের সূচনা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাহিরে আওয়াজ হইল, খুড়ো!

এই যে, এস। নাম করতেই হাজির। খুড়ীর দিকে একটু চাহিয়া লইয়া বলিলেন, অমর্ত কবরেজ। যমের সবচেয়ে হুঁশিয়ার চর কিনা।

কেমন আছ আজ?—বলিতে বলিতে অমৃত কবিরাজ ভিতরে প্রবেশ করিল। খুড়ো কাশিতে কাশিতে বিজয়ের পৌরুষে বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিয়া কবিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নাড়ী দেখিয়া অমৃত কবিরাজের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। খুড়ো মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কি গো, গঙ্গাধর স্যানের সূত্র বলে কি? হুঁ হুঁ, আমি বললাম, এ রোগ সারানো তোমাদের কর্ম নয়, তা গঙ্গাধর স্যানই হোন, আর—

অমৃত কবিরাজ গুরুর নামের অমর্যাদা সহ্য করিতে না পারিয়া চটিয়া উঠিল, বলিল, নিশ্চয় কোন অনাচার হয়েছে, এই ব'লে দিলাম, নইলে যে ওষুধ—

খুড়ো বলিলেন, একটা বেরালে কাল রান্নাঘরে দই ছড়িয়ে আমার পা ঘেঁষে চ'লে গিয়েছিল, এই পর্যন্ত তো জানি—

কবিরাজ একটু মৌন থাকিয়া কি ভাবিল, তাহার পর দুই-তিনবার 'তা হ'লে তা হ'লে' করিয়া হঠাৎ খুড়োর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, দইটা খুব টক ছিল কি?

মনে খুব স্ফূর্তি থাকিলে লোকে একটু অসাবধান হইয়া পড়ে। খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়া ফেলিলেন, কই, না। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সে আমি কি ক'রে জানব? বাঃ, এ যে তোমার অন্যায় প্রশ্ন দেখছি, কাকে যে কি মাথামুণ্ডু জিজ্ঞেস কর—

ইহার পরে এ বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। কবিরাজ একবার রাঙাখুড়ীর দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিল, রাঙাখুড়ী একবার খুড়োব দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিলেন, আর খুড়ো কাহারও পানে না চাহিয়া মুখটা গোঁজ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে কবিরাজ বলিল, তা হ'লে এখন ওই ওষুধটাই চলুক রাঙাখুড়ী। ভাল হয়ে যাবে 'খন। আমায় আবার চৌধুরীদের বাড়ি যেতে হবে একটু। গোপাল চৌধুরীর ঠিক এই অসুখ। এই ওষুধ তো তাঁকেও দিচ্ছি, বেশ সেরে উঠছেন। আর সারতেই হবে কিনা। গঙ্গাধর 'সেনের নিজের হাতে গড়া সূত্র।—বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, ঠিক এই সময় লেজ উঁচাইয়া একটা হৃষ্টপুষ্ট বেরাল মন্থর গতিতে বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল, কবিরাজ খুড়োকে প্রশ্ন করিল, এই বেরালটা বুঝি? বেটী মিষ্টি দই খেয়ে খেয়ে চেহারা বেশ বাগিয়েছে তো!

কবিরাজ চলিয়া গেলে খুড়ী উগ্রভাবে খুড়োর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, তাই ষষ্ঠীর বাহনের ওপর এত দরদ! না?

এবং সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিশানায় হাতের কাছের একটা ঘটি নিঃশঙ্ক ষষ্ঠীর বাহনের পিঠের মাঝখানে বসাইয়া বলিলেন, খা দই—মিষ্টি থকথকে দই—

খুড়ো হুঁকাটা হাতে করিয়া ঘরে গিয়া বসিলেন।

এই গেল খুড়োর চিকিৎসার ইতিহাস।

আরোগ্যের ইতিহাসটা এতটা জটিল নয়, তবে কৌতুকজনক বটে, এবং বৈজ্ঞানিকদের বোধ হয় একটু ধাঁধায় ফেলিবে। হাতযশটা লইলেন রাঙাখুড়ী।

দুই দিন হইয়া গিয়াছে। কাশি কমে না, তবে কতটা আসল, কতটা ভেজাল বলা কঠিন। খুড়ো শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উপর খুব জোর দিতেছেন, তাহার সমান্তরালে হোমিওপ্যাথি চলুক, এই তাঁহার মত। নূতন একখানা 'হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা' আসিয়াছে ও একটা ছোট

ওষুধের বাক্স। খুড়ী কোন গোলমাল করেন নাই, এবারে সাবিত্রী-ব্রতর জন্য গোটাকতক বেশি টাকা বাহির করিয়া দিয়া খুড়ো এ বিষয়ে আপাতত তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়াছেন। কাশির আওয়াজে নাক সিঁটকাইতেছেন এবং ক্রমাগতই ছিদ্র অন্বেষণে নিজেকে সজাগ রাখিতেছেন। যা দুই-একটা পাওয়া যাইতেছে, সে সম্বন্ধে সদ্য সদ্য হক-কথা বলিতে না পারায় মনে মনে গুমরাইতেছেন, তবে আশা— একদিন না একদিন এসব কাজে লাগিবেই।

খুড়ো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিলেন। বাহিরের পাট সারিয়া রাঙাখুড়ী একখানা কাঁথা সেলাই করিতে বসিলেন। খুড়ো বার দুয়েক কাশিলে প্রশ্ন করিলেন, কেমন আছ আজ?

মুখটি চুন করিয়া খুড়ো বলিলেন, আর কেমন আছি! এতে যেমন লিখছে, তাতে তো দেখছি, বড জটিল ব্যাধি দাঁড়িয়ে গেছে।

খুড়ীর উত্তরের প্রত্যাশায় একটু থামিয়া বলিলেন, পুরোপুরি ব্রায়োনিয়ার সিম্‌টম।

খুড়ী বইটার উপর আগাগোড়াই চটা, কোন উত্তর করিলেন না।

খুড়ো বলিলেন, চমৎকার শাস্ত্র—

খুড়ী ছোট্ট করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ।

খুব সাদা কথা, সিমিলিয়া সিমিলিবস কিউরেণ্টিস অর্থাৎ বিষস্য বিষমৌষধি, অর্থাৎ কিনা বিষ দিয়েই বিষ তাড়াতে হবে। ধর, তোমার রাজযক্ষ্মা হয়ে—

খুড়ী চোখ পাকাইয়া বলিলেন, কার কি হয়েছে?

খুড়ো কথা ফিরাইয়া বলিলেন, এই ধর—ধর, অমৃত কবরেজের রাজযক্ষ্মা—

খুড়ী ছুচসুতা ছাড়িয়া দিয়া আরও উগ্রভাবে চাহিলেন। খুড়ো

থতমত খাইয়া বলিলেন, ধর—ধর, এই তোমার গিয়ে বেরালটার রাজযক্ষ্মা হয়েছে। তখন দেখতে হবে, এমন কি বিষ আছে, যাতে রাজযক্ষ্মা সুস্থ শরীরে হতে পারে। সেই বিষ রোগীর শরীরে সাঁদ করাতে হবে। অর্থাৎ ভেতরে যে রোগ রয়েছে, বাইরে থেকেও সেই রোগের—

খুড়ী ক্রুদ্ধ হস্তে কাঁথাটা গুটাইয়া ফেলিয়া বইটার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, এক্ষুনি বন্ধ কর বলছি অমন অলুক্ষনে বই—এক্ষনি। আচ্ছা থাক্, পড়, যত ইচ্ছে পড়—

খুড়ো কিছুই বুঝিতে না পারিয়া খুড়ীর দিকে চাহিয়া কাশিলেন। খুড়ী সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ চড়াইয়া, খক-খক-খক-খক করিয়া চারবার কাশিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন।

খুড়ো বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এ কি, তোমারও কাশি হয়েছে যে! কখন থেকে?

এইমাত্র আরম্ভ হ'ল।

তা হ'লে এক দাগ নক্সভমিকা খেয়ে নাও। লক্ষণগুলো একবার—

এই খাচ্ছি দাও।—বলিয়া খুড়ী উঠিয়া ঔষধের বাক্সটা তুলিয়া লইলেন এবং সেটাকে নিজের তোরঙ্গের মধ্যে পুরিয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। চাবিটা আঁচলে এমন করিয়া বাঁধিলেন যে, খুড়োর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ও বাক্স আর এ জন্মে বাহির হইবার নয়।

চুপ করিয়া থাকা অস্বস্তিকর বোধ হইতে লাগিল বলিয়া খুড়ো খক-খক করিয়া দুইবার কাশিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খুড়ী বুকটা চাপিয়া এমন কাশি কাশিতে লাগিলেন যে, খুড়োকে হুঁকা হাতে করিয়া বাহিরে গিয়া বসিতে হইল।

কিন্তু ঔষধ ধরিল। ছয়-সাতবার এই রকম কাশি-বিসের মাত্রা

সেবন করিয়া খুড়োর অসুখটা অনেকটা কমিয়া আসিল। কানের কাছেই কাশির চোটে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত বিলক্ষণই হইল বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহাতে রোগটা কমিল বই বাড়িল না।

তাহার পরদিন খুড়ী ঔষধের মাত্রা চড়া করিয়া দিলেন, অর্থাৎ খুড়োর কাশির অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই প্রথমে কাশিতে কাশিতে উঠিলেন। খুড়োর ঘুম ভাঙিয়া গেলে খুড়োকে তামাক সাজিয়া দিয়া কাশিতে কাশিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কেমন বোধ হচ্ছে?

ভোরের শৈত্যে খুড়োর একটু কাশি আসিয়াছিল, কিন্তু খুড়ীর উগ্র কাশির কথা স্মরণ করিয়া, অতি কষ্টে বেগটাকে দমন করিয়া বলিলেন, না, আজ যেন একটু ভাল আছি ব'লে বোধ হচ্ছে, গলাটা সামান্য খুসখুস করছে একটু।

ওটা কিছু নয়, তামাক খাওয়াটা ছেড়ে দাও দু দিন, ওইজন্যে হয়েছে।—বলিয়া খুড়ী গোটাকতক বিষ-কাশি কাশিলেন।

খুড়ো মুখটা একটু বাঁকাইয়া লইয়া বলিলেন, হুঁ, কাশিটা তামাক খেয়েই তো হয়; আবার যাদের সে অব্যেস নেই, তাদের—

ও পাপ ধোঁয়াও সহ্যি হয় না, কেশে মরে।—বলিয়া খুড়ী সেই উৎকট কাশি কাশিতে লাগিলেন।

খুড়ো নিজের বিদ্রূপের এই রকম উল্টা পরিণতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া এবং কাশির উৎপাত হইতে পরিত্রাণের জন্য হুঁকা লইয়া গটগট করিয়া বাহিরে গিয়া রকে বসিলেন। এ কয়দিনে অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, অথচ কাল হইতে প্রাণ খুলিয়া কাশা হয় নাই; রোয়াকের কিনারায় নিরিবিলিতে পেয়ারা-তলাটিতে বসিয়া, হুঁকায় একটা লম্বা সুখটান দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গলা ছাড়িয়া কাশির স্রোত খুলিয়া দিলেন।

স্রোত বেশি নামিবার পূর্বেই রাঙাখুড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, হ্যাঁ, একটা কথা মনে প'ড়ে গেল ; আমি বলি কি—

আর শেষ করা হইল না। সে যা কাশির বান ডাকিল, তাহাতে পূর্বের স্রোতটি তো চাপা পড়িলই, স্রোতের উৎস-শিলাটিকেও একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল।

খুড়ো হুঁকাটা ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাতটা বারণের ভঙ্গীতে খুড়ীর দিকে বাড়াইয়া এবং মুখটা তাঁহার দিক হইতে ঘুরাইয়া বলিলেন, হয়েছে, হয়েছে গো, ক্ষ্যামা দাও, আমি পাজি, আমি নচ্ছার, আমি আদিখ্যেতা করি, কাশি-টাশি আমার সব বুজরুকি, স-ব স্বীকার করছি, ক্ষান্ত দাও, এই নাক-কান মলছি, আর কক্ষনও কাশব না, সান্নিপাতিক হ'লেও না, বাব্বাঃ, উঃ, কাল সমস্ত রাত—

খুড়ী অনেক কষ্টে থামিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, কি হ'ল আবার—খক-খক—আমি বলি কি, যখন তোমার কাশিটি নেহাতই ছাড়বে না—খক-খক—বাক্সটা না হয় বের ক'রে দোব ? না হয় একটু হোমিওপ্যাথিই খেয়ে দেখ না—খক-খক-খক—বেশ তো, বিষ দিয়েই যদি—

খুড়ো মাথা আর হাতের যুগপৎ ঝাঁকানি দিয়া উগ্রভাবে কহিলেন, হয়েছে, খু-ব হোমিওপ্যাথি খাওয়া হয়েছে, ব্যাগ্যতা করি, যাও এখন, আর অ্যালোপ্যাথি ডোজে হোমিওপ্যাথি তোমায় দিতে হবে না, উঃ, কাল সমস্ত রাত, বাব্বা !

এই অকিঞ্চিৎ ঘটনাটুকুর পর খুড়োকে আর কেহ কাশিতে শুনে নাই।

# অব্যবহিতা

১লা আষাঢ় ১৩৩৭

আমার জীবনের আকাশে যে দুর্যোগ উঠিয়াছিল, তাহা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকুই নহে, খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত মেঘের আড়ালে আজকাল একটা চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে দেখা যায়। অপেক্ষায় আছি, কবে সেটুকু মেঘও বিলুপ্ত হইবে এবং সমস্ত আকাশটা উহারই জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

বাস্তবক্ষেত্রে এই চাঁদের কণাটুকু সরু রাস্তাটার ওপারে ওই পঞ্চম বাড়িটার জানালার ফাঁকে, কিংবা ছাদের আলিসার আড়ালে, কখনও আধখানা, কখনও বা আরও কম, আবার কখনও আলোর আভাসটুকু মাত্রই দেখা যায়। ঠিক যে তৃপ্তি পাই তাহা বলিতে পারি না, অথচ এই ক্ষণিক দর্শনগুলি যে কেবল অতৃপ্তিরই সৃষ্টি করিয়া আমায় বিভ্রান্ত করিতেছে, তাহা বলিলেও মিথ্যাই বলা হইবে। ওই বাড়ির ওই কিশোরী সমস্ত দিন নিজের খেয়ালে বা সংসারের প্রয়োজনে সমস্ত বাড়িটাতে সাধারণভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর পাঁচটা বাড়ির ব্যবধানে থাকিয়াও আমায় সেই অনাড়ম্বর গতিবিধির জন্য অমন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কেন, তাহার তো একটা সমীচীন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। অথচ থাকিতেই হয়। নূতন চাকরি, তবুও ইহারই জন্য কয়েকদিন দেরি হইয়া গিয়াছে, এত কষ্টের পর পাওয়া চাকরি, সাবধান হইতেই হইবে; কিন্তু আপাতত সবচেয়ে বড় কথা—আমার এই পাঁচ-পাঁচটা বাড়ির ব্যবধান যে আর সহ্য হয় না।

কখনও, যখন ও থাকে ছাদের এক প্রান্তে, আর নিম্ন হইতে ডাক

পড়ে, সন্থ! তখন উত্তরে একটা বাঁশীর মত মিঠে আওয়াজে—আসি, যাই, কেন—এই রকম স্বল্পাক্ষরা সঙ্গীতে এ বাড়ির হাওয়াতেও একটা ঝঙ্কার তোলে বটে, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে সে আর কতটুকু?

দুইটি অক্ষরের কাব্য; কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া তো আর মন উঠে না। সন্থ! সন্থ! নিশ্চয় সৌদামিনী—নিশ্চয়ই। হায়, তাই বলিয়া কি সৌদামিনীর মতই এত বিরল-বিকাশ হইতে হয়!

সে যাই হউক, কিন্তু এ নিষ্ঠুর ব্যবধান যে আর সয় না।

১৭ই আষাঢ়

স্বর্গের দুয়ারে বাসা বাধিযাছি। দেবতার অনুগ্রহে মধ্যেকার চারিটা বাড়ির চারি যোজনের ব্যবধান এক কথায় মিটিয়া গিয়াছে। এখন আমি সন্থদের সামনের বাড়িটায়,—মাঝখানে মাত্র সঙ্কীর্ণ গলিটি।

যে দেবতার এই অযাচিত অসীম অনুগ্রহ, তিনি সকালে সামান্য এক মানবের বেশে আসিয়া বলিলেন, মশাই, বলতে বড় কিন্তু হচ্ছি, কথা হচ্ছে, ছোট বাড়িটাতে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে আপনার কাছে এসেছি আপনি দয়া ক'রে যদি অদল-বদল করেন, ছোট বাড়ি ব'লে আপনার একলার কোন অসুবিধেই হবে না। দুটোই একই লোকের বাড়ি। বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বলেন, আপনি রাজি হ'লে তাঁর আপত্তি নেই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দূরে আপনার বাড়িটা? কি জানেন—এ গলি ছেড়ে যাওয়া আমার সুবিধে হবে না।

ছলনাকারী দেবতা বলিলেন, দূর কিছুই নয়; মাঝখানে এই চারটে বাড়ি পেরিয়েই পরের বাড়িটা। আপনার জিনিসপত্র সমস্তই আমি লোক দিয়ে পৌঁছে দোব। খাসা ছোট্টখাট্ট ফিটফাট বাড়িটি!

তা দেখিতেছি, সত্যই চমৎকার বাড়িটি, যেন একটি ফোটা ফুলের মত। সে আর হইবে না? আমার স্বর্গের জ্যোতিষ্কের কল্যাণ-রশ্মি যে সারাক্ষণ তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে।

মেয়েটির রুটিন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। এক নম্বরের কুড়ে—ভয়ানক দেরি করিয়া উঠে। তাহাতে আমি প্রতিবেশী মাত্র, আমারই বিরক্তি ধরে, বাড়ির লোকের তো ধরিবেই। ছোট একটি ভাই আছে, সে তো নামই দিয়াছে 'কুম্ভকর্ণ দিদি'। সকালে গলির পাশের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি, বসিয়া বসিয়া বিভিন্ন কণ্ঠের অনুরাগ শুনি, না বাপু, এ মেয়েকে পারা গেল না; কি অলক্ষুনে ঘুম! হ্যালা. ওঠ্ না, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তোর কি দুর্গতি হবে? ঠাকুরঝি, ওঠ, শ্বশুরবাড়ির জন্যে তোয়ের হওয়া চাই তো? যেদিন খুব দেরি হইয়া যায়, সেদিন একটি বড় স্নেহসিক্ত স্বরও শুনিতে পাই, সদু, ওঠ তো দিদি। তোমরা মেয়েটাকে রাত-দুপুর পর্যন্ত খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললে, কদিনই বা আর আছে তোমাদের এখানে বাপু?

এটি ঠাকুরদাদার কণ্ঠস্বর, সর্বদাই পৌত্রীর আসন্ন বিদায়ের বেদনায় গাঢ়। এ রকম নাতনীগতপ্রাণ মানুষ দেখা যায় না।

এত কাণ্ডকারখানার পর তো বাবু উঠিলেন। তাহার পর সংসারের কাজকর্মে একটু দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ে মিনিটে মিনিটে যেমন 'সদু! ও সদি!' বলিয়া হাঁকাহাঁকি হইতে থাকে, তাহাতে আমার মনে হয়, মেয়েটি ফাঁকি দেওয়ার নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতেই বেশি মনোযোগী। এক-একদিন আবার ঝাঁঝিয়া উত্তর দিতেও ছাড়ে না, খালি 'সদি, সদি, সদি', ম'লেও সদি নিস্তার পাবে না দেখছি!

গলাটা খু-বই মিষ্টি বলিতে হইবে; কেন না, এমন রূঢ় কথাগুলাও এর চমৎকার শোনায়!

ইহার পর কোলের ভাইপোটিকে বাঁকা কাঁকালে লইয়া ছাতের উপর উঠিয়া পাশের বাড়িতে কে সই আছে, আলিসার আড়াল হইতে তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় আমি চেয়ারটা জানালার একেবারে কাছে টানিয়া আনি, কারণ কথাবার্তা যা চলে তাহা একটা শুনিবার জিনিস। অনভিজ্ঞ লোকের ঠিক এই রকম ধারণা দাঁড়াইয়া যাইতে পারে যে, বক্ত্রী একটি সংসারভারনির্জিতা প্রকাণ্ড গিন্নী।—মার দু দিন থেকে শরীরটা কেমন খারাপ যাচ্ছে, দাদা আর বউদির নিত্য ঝগড়ার জ্বালায় আর তো পারা যায় না ভাই, ছোট ভাইটি কোন মতেই বাগ মানছে না, সমস্ত দিন তার টিকিই দেখা যায় না, বাবার সদু ভিন্ন এক দণ্ড চলে না। ঠাকুরদা? উনি নাতনীর হাতের তামাক যে কি চিনেছেন, আর ব'লো না, আমার ভাই, যদি একটু মরবার ফুরসৎ আছে।

এদিকে কয়দিন হইতে মুশকিলে পড়িয়াছি। খুব তো সংগোপনে ছিলাম, কিন্তু একটু অসাবধানের জন্য সে দিনে চোখোচোখি হইয়া গেল। আর কিছু দুঃখ নাই, কারণ সেই একটি মুহূর্তে যাহা পাইয়াছি, তাহা জীবনের অতুল সম্পদ হইয়াই থাকিবে; তবে দুষ্টু সেই অবধি অত্যন্ত সাবধান হইয়া গিয়াছে। গলার সে বাঁশী থামিয়া গিয়াছে, সখীর সঙ্গে সে বিশ্রম্ভালাপ নাই। আর দেখা? কোথায় প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলাম, তাহার বদলে ত্রস্ত সন্দিগ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক-আধটা অতি চপল বিক্ষেপ, তাহাতে কি আর আশ মিটে?

আবার এই নিষ্ঠুর সঙ্কোচ ঘর-দুয়ারেও যেন সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর পাতার মত জানালার দুইটি সবুজ পাল্লা খড়খড়ি সমেত প্রায় বুজিয়াই থাকে। ওই একজনের লজ্জা অমন

মুখর বাড়িটাকে যেন মৌন নতমুখী করিয়া দিয়াছে। পাশের, আমার এ বাড়ি হইতে সর্বদা যেন একটা তপ্তশ্বাস উঠে।

একদিন দুপুরবেলা আপিস হইতে পলাইয়া আসিয়া একটু সুফল পাইয়াছিলাম। বাহিরের ঘরে ঠাকুরদাদার তামাকের সরঞ্জাম করিতে করিতে মাঝে মাঝে সুমিষ্ট রসালাপ চলিতেছিল; চুরি করিয়া খুব শোনা গেল। এই মেয়ে জাতটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অতটুকু বেলায় আমাদের জিবের আড় ভাঙে না, আর ওই একফোঁটা মেয়ে, হদ্দ তেরো হইতে চোদ্দ বছরের মধ্যে হইবে, সমানে ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়া গেল। যাহার হাতে পড়িবে, তাহাকে নাজেহাল করিয়া ছাড়িবে দেখিতেছি।

সে কথা যাক, এ রকম ভাবে আপিস-পালানো তো রোজ চলে না। অথচ মন যে ক্ষেত্রে পলাতক, সে ক্ষেত্রে জড়পিণ্ড শরীরটাকে শুধু শুধু বসাইয়া রাখিয়াই বা ফল কি? এ রকম ভাবে সমস্ত দিন একটু দেখার তৃষ্ণা, একটু কথার তৃষ্ণা লইয়া কত দিন চলিবে?

হে সুন্দরী, একেই তো এই গলির আর ওই দেওয়ালগুলার নির্মম ব্যবধানের বাহিরে ঘুরিয়া মরিতেছি, তাহার উপর আবার এই কঠোর মৌনতার পাষাণভার কেন?

৩০শে আষাঢ়

দারুণ নিরাশায় অবশেষে সাহস আনিয়া দিল। ওর ঠাকুরদার সহিত আলাপ জমাইয়া লইয়াছি।

গিয়া বলিলাম, আমার একটি বন্ধু আসবে আজ দুপুরবেলা। সে সময় আমায় আপিসে থাকতে হবে। দয়া ক'রে যদি এই চাবিটা তাকে দিয়ে দেন—তাকে বলা আছে, আপনার কাছে আসবে। মানে হচ্ছে, নতুন চাকরি, অসময়ে আপিস ছেড়ে আসাটা—বুঝলেন কিনা—

কথাটা আগাগোড়া বানানো। তা যে রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অত সত্য-মিথ্যা বাছিতে গেলে তো মারা যাইতে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যপ্রিয় বলিয়া ইহলোকে যাঁহারা নাম কিনিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও এইরূপ একটি চতুরাকে ভালবাসিয়া নাকাল হইতে হয় নাই। সুবোধ এবং সত্যবাদী বলিয়া আমারও এক সময় যশ ছিল ; এখন দেখিতেছি, তাহা রাখিতে পারিলে হয়।

ঠাকুরদাদা নাকের ডগায় চশমা দিয়া কি পড়িতেছিলেন। নাকটা আরও নীচু এবং চোখটা উঁচু করিয়া আমায় নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সামনের বাড়িটাতে থাক ? তা, কই, দেখি না তো কখনও ?

বলিলাম, থাকি বড় কম ; প্রায় সমস্ত দিনটা আপিসে চাকরি সামলাতেই কেটে যায়, আজকালকার বাজার, জানেনই তো।

কি নাম তোমার বাপু ? নতুন এসেছ নিশ্চয় একলা থাক নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দিন পাঁচ-ছয় হ'ল এসেছি। নামও বলিলাম।

বেশ বেশ, ব'স। তাই তো বলি, আজ সন্তুকে যখন বললাম, ঘোষেরা সামনের বাড়ি থেকে উঠে গেছে, নতুন কারা এল বলতে পারিস ? সে বললে, কই, কাউকেও তো দেখতে পাই না।

মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, একটা শুভ লক্ষণ্ বটে, মিথ্যা বলাটা তাহা হইলে ও তরফেও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, সন্তু কে ? সেই যে ফরসাপানা ছোট ছেলেটি স্কুলে যায় দেখি ? মুখে একটুও বাধিল না ; সন্তুর প্রসঙ্গটা উঠিয়াছে, একটু চালাইতেই হইবে।

ঠাকুরদাদা হাসিয়া উঠিলেন। এত হাসিলেন যে আমার ভয় হইল, বুঝি চতুরালি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বলিলেন, না, সে সন্তু হতে যাবে

কেন? সে আমাদের ঝড়ু; সদু হচ্ছে ওর বোন। অমন মেয়ে দেখেছ কি না বলতে পারি না, আর কিছু নয় তো, গড়ন ওরকম—ওরই বের জন্যে দিন দেখতে তো এই পাঁজি নিয়ে বসেছি। এই দেখ না, শ্রাবণ মাসে দুটো দিন আছে। (পাঁজিটা আমার দিকে ঠেলিয়া দিলেন) না, তোমার বুঝি আবার আপিসের তাড়া—

নিজের বাঞ্ছিতার জন্য পাঁজি দেখা ইহার পূর্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না। লজ্জাকে এতদূর পর্যন্ত পরাভব করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, মোটেই বসবার উপায় নেই; এখন তা হ'লে আসি; দয়া ক'রে চাবিটা—

সে তুমি নিশ্চিন্দি থেকো।—বলিয়া বৃদ্ধ আমায় কবাট পর্যন্ত আগাইয়া দিলেন; আবার বলিলেন, মাঝে মাঝে এসো, এই তো একই বাড়ি।

বলিলাম, নিশ্চয় আসব; আমার তো সঙ্গীর বড়ই অভাব।

বৃদ্ধ বলিলেন, তা যদি বললে, সঙ্গীর অভাব আবার সব অভাবের ওপরে, জানি কিনা। আমার বুড়ো বয়সের সঙ্গী হয়েছে নাতনীটি। তা বলতে কি, এক দণ্ড যদি তাকে না দেখেছি, কি তার কথা না শুনেছি, তো সে আর কি বলব! তোমারও তো ঠিক সেই রকমই হয়?

বলিলাম, হ্যাঁ, হয় বইকি। উত্তর দিয়া কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধের প্রশ্নটাও বেথাপ্পা হইয়াছে, আমার উত্তরটাও।

কথাটা কিন্তু সত্য, যেন প্রাণের কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কয়টা দিন যে কি গিয়াছে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নাই, আপিস যাইতে পা উঠে না, জানালাটির পাশে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছি, কখন ছাতে ভিজা নীলাম্বরী শাড়িটি

মেলিয়া দিতে আসিবে; ওই কৃপণ বদ্ধ জানালার সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া কখন একটু তরল আওয়াজ ভাসিয়া আসিবে, ঠাকুরদাদার ঘরে কখন কলহাস্যের ঢেউ উঠিবে, সেই আশায়। বৈষ্ণব ভিখারী নিত্যই আসে, তবে আপিসের সময় উতরাইয়া গেলে। তবুও কখনও কখনও বসিয়া থাকিতাম। দ্রুততালে মন্দিরা বাজাইয়া গান গাহিবে—

( প্যারীর ) দরদ ভেল জীবন-নিধি
সঙ্গোপনে মরমে ধরে
সখীরেও নাহি কহয়ে কিছু বাণী
( প্রেমের কথা প্রকাশ করে না, বুকের ব্যথা পুষে রাখে,
প্রকাশ করে না )

প্রথমে দরজার কাছে আসিয়াই শুনিত, কিন্তু সেই চোখোচোখি হওয়া অবধি জানালাটি ঠেলিয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি দেখিতে পাইতাম না বটে, তবু অন্ধের মত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। গান শেষ হইয়া গেলে ভিখারী বাদ্যযন্ত্রে দুইটা বড় ঘা দিয়া বলিত, কই গো দিদিমণি, এক মুঠো দিয়ে দাও লক্ষ্মীমণি, আবার অন্য বাড়ি আছে।

লক্ষ্মীমণি ক্ষণিকের জন্য বাহির হইত, দুইটি ভিখারীকে একসঙ্গে তৃপ্ত করিয়া আবার ত্বরিতে চলিয়া যাইত।

ওর ঠাকুরদাদা ঘরে থাকিলে বৈষ্ণব বাবাজীর জ্যোতিষজ্ঞানভাণ্ডের মুখটা খুলিয়া কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে হইত। সেসব প্রশ্নও বাঁধা, তাহাদের উত্তরও প্রায় একই। ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিতেন, গোঁসাইজী, তারপর, মেয়েটার বরের ভাগ্যি কেমন দেখছেন?

গোঁসাইজী বলিত, ওই যে বললাম দাঠাকুর, মা আমার শাপভ্রষ্ট দেবকন্যে; ও আর দেখতে আছে!

ঠাকুরদাদার মুখটা আনন্দের হাসিতে ভরিয়া উঠিত। বলিতেন, না না, সে ভাগ্যি কি আমরা করেছি? তারপর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িতেন; প্রশ্ন হইত, আচ্ছা, বর জুটতে এত দেরি হচ্ছে কেন বলতে পারেন? আমি ওখানটা বুঝতে পারি না।

বাবাজী বলিত, ঠিক ওইজন্তেই; এক যে-সে এসে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেলেই তো হ'ল না দাদাঠাকুর। তবে আমি দেখলাম খড়ি কেটে—বর রথে চড়েছে, আর দেরি নেই।

ঠাকুরদাদাব তখনকার মত সন্দেহটা মিটিয়া যাইত। বৈষ্ণব খানিকটা ফৌজদারী বালাখানার তামাক কিংবা দুইটা পয়সা লইয়া 'জয় রাধেশ্যাম' বলিয়া বিদায় হইত।

এই রকম ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারগুলি সমস্তই আমার অন্তরের বিরহ-ব্যথায় করুণ হইয়া উঠিত। এক-একদিন ভিখারী চলিয়া গেলেও চেয়ারেব হাতলে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম। সকালে নাওয়া-খাওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইত, এ সময় আপিস যাওয়াটাও ঠিক তেমনই একটা বাজে কাজ বলিয়া মনে হইয়া মনটাকে সারা জীবনটা সম্বন্ধেই নিশ্চেষ্ট নিশ্চল করিয়া দিত। ঝকঝকে তকতকে মনোরম ঘরে বসিয়া থাকিতাম, সামনে কোমল শয্যা, আলনায় ভদ্রোচিত কাপড়-চোপড়, প্রয়োজনাতিরিক্ত দুই-একটা শৌখিন দ্রব্যও সাজানো থাকিত; আপিসে সাহেবের অপরিমিত প্রীতিদৃষ্টিও ছিল; কিন্তু কিছুতেই স্বাদ ছিল না, এবং এসবের তুলনায় দুইদিন আগে যে রাস্তায় রাস্তায় সেই নিরুদ্দেশভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো, সেটাকে তেমন বিশেষ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইত না। মনে হইত, আর যাহাই হউক, তাহার মধ্যে একটা বিশাল স্বাধীনতা ছিল। তখন অমৃতের সন্ধানও পাই নাই, আর সে কারণে, এই দারুণ অভাবের

কঠোর যন্ত্রণাও ছিল না। এক কথায়, আমার কাছে দুঃখের স্মৃতিতে আর দুঃখ ছিল না এবং প্রত্যক্ষ সুখের মধ্যেও সুখ ছিল না ; সদুর বিরহ-ব্যথা আমার অতীতকালের যন্ত্রণা, বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যতের আশা-নিরাশা—সমস্তকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। যেন বন্যার জলে সব একাকার করিয়া দিয়াছে, ফুলের বাগানও ডুবিয়াছে, কাঁটার বনও ডুবিয়াছে, আছে খালি দিগন্তপ্রসারিত গাঢ় জলরাশি।

তাই বলিতেছি, সে যে কি যন্ত্রণায় কয়টা দিন গিয়াছে, তা অন্তর্যামীই জানেন।

৭ই শ্রাবণ

ঠাকুরদাদাকে সেই তো ভাব করিয়া চাবি দিয়া আসিলাম ; বিকালবেলা দেখা করিতেই বলিলেন, কই ভায়া, তোমার বন্ধু তো এলেন না ? আমি সমস্ত দিন এইখানে ঠায় ব'সে, জলখাবার-টাবারও আনিয়ে রাখলাম, কিন্তু কই ?

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম ; একটা মিথ্যা কথা বলিয়া সমস্ত দিন বৃদ্ধকে এতটা কষ্ট দিলাম ! আসল কথা, এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, এ সম্ভাবনাটাই মনে উদয় হয় নাই। ইহার উপর উনি যে আবার আতিথ্যের আয়োজন করিয়া বসিবেন, তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই ; তা হইলে না হয় মিথ্যা কথাটার উপর আর একটু জুড়িয়া দেওয়া যাইত যে, আগন্তুক বন্ধুর জন্য ঘরে সমস্ত আয়োজন সারিয়া রাখিয়াছি।

সমস্ত দোষ সদুর, ও আমার মন লইয়া যে কি জাদু করিয়াছে, ওই জানে।

ঠাকুরদাদা বলিলেন, তা হ'লে তোমায়ই এনে দিক, একটু জল খেয়ে নাও। না, সে হয় না ; তবুও তোমার বন্ধু না খেয়ে তুমি খেলেও

আমাদের একটা সান্ত্বনা থাকবে। সদু, ও সদু! বলি, ও বড়গিন্নী! এটি আমার পাতানো সম্বন্ধ। শেষের কথাগুলি বৃদ্ধ বড়গিন্নীর টীকাস্বরূপ আমায় বলিয়া স্মিত হাস্য করিলেন।

ঝড়ু দুয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, কি?

বলি, সে কোথায়?

ঝড়ু দুয়ারের পিছনে তাকাইল।

ঠাকুরদাদা বলিলেন, হয়েছে; নিজে আড়ালে থেকে বুঝি তোমায় চর পাঠিয়েছেন? বল, সেই খাবার, জল, পান সব নিয়ে আসতে। ঝড়ু আর একবার অন্তরালে তাকাইয়া বলিল, বলছে—তুই আন্‌গে।

কেন? ও, হয়েছে।—বলিয়া ঠাকুরদাদা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তোমায় লজ্জা, বুঝেছ ভায়া? আমার এতক্ষণ ঠাওরই হয় নি।

বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া, সঙ্কোচে জড়সড, লজ্জায় রাঙা-মুখ নাতনীকে ধরিয়া আনিয়া আমার হাত-তিনেক দূরে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, পাশের বাড়ির লোক, ছেলেমানুষ; ওকে আবার এত লজ্জা? এইবার লজ্জা ভাঙল তো? যাও, খাবার নিয়ে এস। কই হে ভায়া, তুমিও যে দেখছি আবার মুখ নীচু ক'রে রইলে! সব সমান।

এটা গেল প্রথম পরিচয়ের কাহিনী। এখন আর সদু আমার সামনে আসিতে জড়সড হয় না, আমিও উহাকে কাছে পাইলে নিজের হাতের চিরপরিচিত দশটি আঙুল লইয়া গবেষণায় ব্যস্ত থাকি না। ছাতে নীলাম্বরীটার খাতির বাড়িয়া গিয়াছে। সদু একবার তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিংড়াইয়া খুব পরিপাটী করিয়া ভাঁজ খুলিয়া শুকাইতে দেয়; তাহার পর শুকাইল কি না, সে তদারকও মাঝে মাঝে করিয়া যায়। আমার সহিত এ সময় প্রায়ই দেখা হয়; কখনও হাসিয়া চলিয়া

যায়, কখনও ছোট ভাইয়ের কথা পাড়ে—আজ ঝড়ু ঠিক সময়ে পড়তে গিয়েছিল শৈলেনদা? কিংবা ওকে খুব শাসনে রাখবেন, অথবা ওই রকম গোছের একটা কিছু—বলিবার মত কথার অভাবে যা আপনিই ঠোঁটের গোড়ায় আসিয়া পড়ে।

এদিকে সেই অকরুণ জানালা দুইটিও দরদী হইয়া উঠিয়াছে, দুই হাত ভরিয়া আমায় শব্দ-রূপের সম্ভার বিলায়। সকালে ঝড়ু যখন আমার কাছে পড়ে, সদু আসিয়া মাঝে মাঝে জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়ায়। কয়েকটি নিয়মিত প্রয়োজন থাকে;—প্রথমত ঝড়ুকে খাবার খাইবার জন্য ডাকা, তাহার কিছু পরে আমার চা লইয়া আসিবার জন্য ফরমাশ করা, এবং সবশেষে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানের সময় হইয়াছে, এই সব খবর দেওয়া; যদিও তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না, কারণ আমার কাছেও ঘড়ি থাকে, এবং ও-বাড়ির ঘড়িটা ঢংঢং করিয়া যখন বাজে, তখন ঝড়ুর সতর্ক কর্ণে সবচেয়ে আগে তাহার খবর পৌঁছায়।

মাঝে মাঝে গিয়া ঠাকুরদাদার কাছে বসি। প্রায় দেখি, হুঁকা হাতে করিয়া, নয় পাঁজিটা খুলিয়া, না হয় সদুর ঠিকুজিটা মেলিয়া গভীর মনোনিবেশের সহিত ঝুঁকিয়া চাহিয়া আছেন। বলেন, ভাবনার কথা নয়, শৈলেন ভায়া? ঠিকুজিতে লিখছে, 'ত্রয়োদশবর্ষপ্রাপ্তৌ' বিয়ে হয়ে যাবে; তা, কোন লক্ষণ কি দেখতে পাচ্ছ? তুমিই বল না। বাপকে বললে বলে, সময় হ'লেই হবে। দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে।

আমি বিজ্ঞের মত বলি, না, নিশ্চিন্দি থাকাটা আর তো কোনমতেই উচিত হয় না।

এ সমর্থনটুকু পাইয়া ঠাকুরদাদার উৎসাহ ও আমার প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। বলেন, এই তো সমঝদারের মতন কথা। ওরা

সব বলবে, ছেলেমানুষ। হ্যাঁ হে শৈলেন, তেরো বছরের মেয়ে ছেলে-মানুষ হ'ল? তুমিই বল না। তেরো পেরিয়ে গেছে কোন্ দিন, এবার চোদ্দয় পড়বে। ব্রহ্মজ্ঞানী নয়, খ্রীশ্চান নয়—

বলিতে গিয়া কথাটা একটু জড়াইয়া গেলেও আমি বলি, না, ছেলে-মানুষ তো আর মোটেই বলা চলে না।

ঠাকুরদাদা মাথা কাত করিয়া চোখ বড় করিয়া বলেন, মো-টেই আ-র বলা চলে না। ঠিক, আমারও এই কথা। না ভায়া, ওই যে বললাম, তুমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা কর। একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে, তা কিছু মনে ক'রো না। আমায় তো দেখছই, বাতে পঙ্গু, জ্যান্তে ম'রে আছি। বেশ ভাল ক'রে দেখেছ তো মেয়েটাকে? একেবারে নিখুঁত ক'রে বর্ণনা করবে। না হয়, নিজেই এসে দেখে যাক, কাজ কি? দেখি, একবার চোখে দেখলে কোন্ শালা না বিয়ে ক'রে থাকতে পারে।

বৃদ্ধের মুখটা বিজয়ের গৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠে এবং এইরূপ সময় সদুর ডাক পড়ে তামাক দিয়া যাইবার জন্য। আমায় চাপা গলায় বলেন, খুব লক্ষ্য ক'রে দেখ তো ভায়া, গড়ন থেকে নিয়ে ইস্তক চলনটি পর্যন্ত কোনও জায়গায় কোনও দোষ চোখে পড়ে কি না!

সদু আসিয়া কলিকা তামাক টিকা লইয়া যায়। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে এবং জলন্ত টিকায় মাঝে মাঝে টোকা মারিতে মারিতে ফিরিয়া আসে। কোন দিন নিঃসংশয় চিত্তে এ কথা সে কথা তুলিয়া একটু দেরি করে; কোন দিন বা অহেতুকভাবেই লজ্জিত হইয়া পড়ে, তাড়াতাড়ি হুঁকাটা ঠাকুরদাদার হাতে দিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া বাহির হইয়া যায়।

আমি কিছু দেখি, বাকিটুকু জীবন্ত কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া

লই। সেটুকু সময়ের মধ্যে ঘরের হাওয়ায় যে কি একটা মধুর বিপর্যয় হইয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না। চলিয়া গেলে ঠাকুরদাদা হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে দিতে আমার পানে আড়চোখে চাহেন। বলেন, কি রকম দেখলে বল দিকিন ?

প্রথম প্রথম বেজায় লজ্জা করিত, হয়তো বলিতাম, মন্দ কি, কিংবা খুব জোর—ভালই তো। আজকাল কখনও কখনও একটা বিশিষ্ট অভিমতও দিই, বলি, রঙটা এদানি যেন একটু আরও মাজা-মাজা বোধ হচ্ছে না ? অথবা চলনটা যেন একটু ভারিক্কে হয়ে এসেছে না ? আপনি কি বলেন ? ওর ঠাকুরদাদার সামনে কখনও কখনও একটু লুকোচুরি, বেহায়াপনা আজকাল বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

ঠাকুরদাদা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠেন, তোমার চোখ আছে ; আমি তো ঠিক ওই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলাম।

এক-একদিন ঘরে ঢুকিতেই ঠাকুরদাদা প্রশ্ন করেন, কি ভায়া ? কাজ কিছু এগুল ? তোমার গিয়ে. সেই ছেলেটির কি হ'ল ?

ঠাকুরদাদার তাগিদের ঝোঁক সামলাইবার জন্য একটি কাল্পনিক পাত্রকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। এক হিসাবে নেহাত কাল্পনিকও নহে। এক বছর এম. এ. পড়িয়া কলেজ ছাড়িয়া এখন চাকুরিতে ঢুকিয়াছে ; বাড়ির অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়—মোটা ভাত, মোটা কাপড়টা চলিয়া যায়। ছেলে দেখিতে শুনিতে চলনসই, যেমন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে হইয়া থাকে।

ঠাকুরদাদার প্রশ্নের উত্তরে বলি, সে পাত্র তো প্রায় হাতের পাচ ঠাকুরদা ; আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ধ'রে পড়লেই হবে। ওর চেয়ে ভাল যদি পাওয়া যায় তো দেখতে দোষ কি ?

ঠাকুরদাদা বলেন, সে কথা হাজার বার বলতে পার ; নাতনী

আমার রাজা-রাজড়ার ঘরের বেমানান হবে না। তবে, এ পাত্রও বা মন্দ কি শৈলেন? বলছ, তিন-তিনটে পাস, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। আচ্ছা, গায়ের রঙটা কেমন হবে বল দিকিন—ওর সঙ্গে মানাবে তো? দাঁড়াও, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার; সামনেই এনে দিচ্ছি, আর একবার ভাল ক'রে দেখেই বল না। সদু, অ দিদিমণি!

সদু আসে, ঠাকুরদাদার মিথ্যা অছিলা শুনিয়া চলিয়া যায়। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পাত্রের রঙটা মনে করিবার চেষ্টা করি। ঠাকুরদাদ অসহিষ্ণুভাবে নানান রকম আভাস দিতে থাকেন, আচ্ছা, সদুর চেয়ে কত ময়লা? যদি পাশে দাঁড় করানো যায় তো উনিশ-বিশ—আঠার-বিশ? ধর, তোমার গায়ের রঙ হবে?

আমি পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি নিজের হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলি, হ্যাঁ, তা হ'লেও হতে পারে।

তা হ'লে তুমি ঠিক ক'বে ফেল। সত্যি বলতে কি শৈলেন ভায়া, আমার কেমন যেন ছেলেটি মনে লেগেছে। থাকতে পারে ওর চেয়ে ঢের ভাল পাত্র; কিন্তু আমার মন যেন বলছে, ওই আমার সদুর বর।

আমি আজকাল খুবই বেহায়া হইয়া পডিয়াছি; কিন্তু ইহার পর আর লজ্জা দমন করিয়া ব.সয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে; আমি উঠিয়া পড়ি, বলি, তা হ'লে তাই দেখব; এখন তবে আসি।

বৃদ্ধ এক-একদিন আমায় বুকে চাপিয়া ধরেন। শিশুর মত সারল্যে ভরা চক্ষু দুইটি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ছলছল করিয়া উঠে। বলেন, ভাই, আর জন্মে তুমি কে ছিলে আমাদের যে, এ জন্মে এই দুদিনেই এত আপনার হয়ে পড়েছ? পরের মেয়ের জন্যে কে এত দেকদারি ঘাড়ে করে বল দিকিন?

২রা ভাদ্র

আর গলির ব্যবধানটিও নাই। আমি গলি পারাইয়া আজকাল সদুদের পাশের বাড়িটিতেই আছি।

এটুকু ঠাকুরদাদার স্নেহের প্রসাদ। একটা বিপদ আসিয়া পড়িয়াছিল, যা বোধ হয় আমায় আমার স্বর্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিত। ঠাকুরদাদার স্নেহে সেটা একটা সম্পদে পরিণত হইয়া আমায় একেবারে স্বর্গের সীমানার মধ্যেই তুলিয়া লইয়াছে।

আমার বাড়িওয়ালা উপরে একটা ঘর তুলিয়া দ্বিগুণ ভাড়ার নোটিস দিয়া গেল। সেদিন ঠাকুরদাদার কাছে যখন গেলাম, মুখটা বোধ হয় বিমর্ষ ছিল। তিনি সমস্ত কথা না শুনিয়া ছাড়িলেন না। শুনিয়া, সদুকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে বলিয়া আমায় কহিলেন, র'স, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিই।

বুদ্ধির গোড়ায় ভাল করিয়া ধোঁয়া পড়িলে বলিলেন, হয়েছে, এ আর শক্ত কথা কি ?

সদু দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, ঠাকুরদাদা একটা ঠাট্টা করিতে সে বেচারা দুড়দুড় করিয়া পলাইয়া গেল। ঠাকুরদাদা একটু হাসিয়া চুপিচুপি আমায় বলিলেন, কথাটা একটু গোপনীয়। বলি কি— তুমি আমাদের এই পাশের বাড়িটাতে চ'লে এস ; দু মাস থেকে মিছিমিছি ভাড়া গুনছি।

আমি কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরদাদা বলিলেন, দেখ ভায়া, মেয়েটার বিয়ে যে খুবই কাছে, এ কথায় তুমি সন্দেহ ক'রো না। তা যদি হ'ল—আমাদের এই একটি বাড়িতে কি কুলুবে সে সময় ? কুলুবে না। আচ্ছা, তা হ'লে আমি তখন বাড়ি পাচ্ছি কোথায় ? এই সব ভেবে-টেবে,

মিত্তিররা ছাড়বার পর থেকে পাশের বাড়িটা ধ'রে রেখেছি। মন্দ কাজ করেছি? তুমিই বল না। ছেলেকে বলি নি। বললেই, বাজে খরচ বাজে খরচ ক'রে রদ ক'রে দেবে। ভূ-ভারতের মধ্যে আর কেউ জানে না। জানে এক বাড়িওয়ালা আর আমি, আর এই তুমি জানলে।

আমি তো স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, অথচ এই বৃদ্ধ এ কি কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিয়াছেন! মনে হইল, বলি, ঠাকুরদা, যখন এতই নিশ্চয় তুমি, তা হ'লে বোধ হয় নিজেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ।—বলিয়া লঘু বিদ্রূপের ঘায়ে সাংঘাতিক ভুলটা ভাঙিয়া দিই। কথাটা ঠোঁটেও আসিয়াছিল, এবং কর্তব্য হিসাবে বলিয়া ফেলাও উচিত ছিল; কিন্তু পারিলাম না। দেখিলাম, অপরিসীম বিশ্বাসভরে এই শিশু-বৃদ্ধ নিজের সত্য-মিথ্যা ধারণাগুলি লইয়া জীবনের অবসান-দিনে একবার পুতুল-খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; যুক্তির রসায়ন সে অন্ধ-বিশ্বাসের উপর ঢালিয়া তাহাকে গলাইয়া দেওয়া নিতান্ত হৃদয়হীনের কাজ বলিয়া বোধ হইল।

তাহা ছাড়া অন্তরের মধ্যে প্রিয়সান্নিধ্যের যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এখানে আর অস্বীকার করি কেন? এ কথাও ভাবিয়াছিলাম যে, আমি ভাড়াটি দিয়া দিলে এই পরিবারটির এই নিরর্থক খরচাটাও বাচিয়া যাইবে; কিন্তু ঠাকুরদাদাকে এড়াইয়া তাহা যে পারিব, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আলাদা আছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্নিগ্ধ পরিবারটির সহিত এক হইয়া গিয়াছি বলিলেও চলে। সবাই এই নিঃসঙ্গ প্রবাসীকে অন্তরের প্রীতি ও স্নেহ দিয়া আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছে। এই গ্রহণের মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেহ একবার একটু থমকিয়া ভাবিয়া

দেখিল না; সবাই যেন সব সময়ের জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছে। আমিও দ্বিধাহীন পদে সেই দুয়ার-পথে এমন সহজে প্রবেশ করিয়া এমনই সহজে মিলিয়া গেলাম যে, অপরিচয়ের রেখাটা যে কখন অতিক্রম করিয়া আসিলাম, তাহার জ্ঞানই নাই।

চরম সৌভাগ্যের কথা এই যে, সদু আমার এই অকিঞ্চন গৃহখানিতে পা দিয়াছে।

আরশির গায়ে যে ওই ফুলকাটা পরদা, সেটা সদুরই হাতের নিদর্শন, বাক্সগুলার উপর যে রঙিন কাপড়ের ঢাকনা, সেগুলিও সেই পদ্মহস্ত-খানির কমসৃষ্টি। আমার ব্যবহারের জিনিসগুলার মধ্যে যে এমন শ্রী লুকানো ছিল, তাহা সদু স্পর্শ করিবার পূর্বে জানিতে পারি নাই। দুপুরবেলা আমি যখন আপিসে যাই, চাবিটা সদুর জন্য ঠাকুরদাদার কাছে দিয়া যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঘরটিতে যেন সৌন্দর্যের আরও কয়েকটি নূতন পাপড়ি খুলিয়াছে।

সকালবেলা ঝড়ু যখন পড়ে এবং আমি হেলানো-চেয়ারে বসিয়া নানান কথা ভাবিতে থাকি, সে সময় সদু প্রায়ই আসে—কখনও হাতে একটা ঘর-সাজানোব জিনিস লইয়া, আবার কখনও মুখে মিষ্টি অনুযোগ লইয়া—কোন্ জিনিসটা একটু অগোছ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, কোন্ জিনিসটা কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কোন্ জিনিসটা ব্যবহার করিবার প্রণালী ঠিক বুঝি নাই—এই সব।

আমি কখনও কখনও বলি, ব্যাটাছেলে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া অগোছালো—

মেয়েদের এই পরোক্ষ প্রশংসাটিতে সুন্দর মুখখানি লজ্জায় একটু রাঙা হয় এবং একটু নুইয়া পড়ে। সদু বলে, অমন কথা বলবেন না শৈলেনদা, তা হ'লে এই যে ছেলেটি দেখছেন, ও বাড়িতে একটি

জিনিসও গোছানো থাকতে দেবে না ; একেই তো গোছাতে গোছাতে আমার প্রাণান্ত।

এই রকমের কথাবার্তায় ভাই-বোনে কখনও কখনও একটু কলহ হইয়া পড়ে। দুইজনেই যখন আমায় মধ্যস্থ মানিয়া বসে, আমি পড়িয়া যাই সে এক মহা সমস্যায় ; দুইজনেরই পিঠ ঠুকিয়া আর কবে সুবিচার হইয়াছে ? সদুর সপক্ষে রায় দিলে ঝড়ু গরগর কবিতে থাকে। কেন কে জানে, তাহাতে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িতে হয়। ঝড়ুর সপক্ষে বলিলে সদু খানিকক্ষণ একেবারেই কিছু বলে না, তখন মনে হয়, এর চেয়ে একটু লজ্জা পাওয়া বরং ছিল ভাল।

কাল আপিস হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম, শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। সদু উপরের ছাদে কি করিতেছিল, এমন সময় পাশের ছাদে সেই সখীটি আসিয়া দাঁড়াইল। একটু অভিমান এবং বিদ্রূপের স্বরে বলিল, আর যে বড় দেখি না ভাই, আমাদের ভুলে গেলে নাকি ?

সদু হাসিয়া বলিল, তোমার ওই এক কথা ভাই, যদি জানতে, কি খাটুনিটা—। বলিয়া সেই পুরানো ফর্দ আওড়াইতে যাইতেছিল। সখীটি বাধা দিয়া বলিল, তার ওপর আবার একটি নতুন লোকের ঘরকন্নার ঝক্কি নিয়েছ।—বলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া আবার বলিল, না ভাই, রাগ ক'রো না, তোমার বউদি বলছিলেন, তাই জানলাম।

আলসের উপর একটি বুনো ফুলের লতা ছিল ; একটি ফুল তুলিয়া সদু সঙ্গিনীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল, লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, তোমরা সব সমান, কেউ কম যাও না।

সখীটি ইহার পর আরও সরিয়া আসিল এবং তাহার পর যে কথাবার্তা হইল, সে আর শোনা গেল না।

বোধ হয় এইজন্য আজ সকালে আসে নাই; অনেকক্ষণ পথ চাহিয়া ঠাকুরদাদার ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইতে হইয়াছিল। তাও কি সেখানেও একটু দেখা দিল? লজ্জা-রোগটা চাগাইলে আর নিস্তার নাই।

বিকালে আসিয়াছিল; একটু লজ্জিত-লজ্জিত ভাবটা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ সকালে একবারটিও আস নি কেন সদু? 'একবারটি' কথাটার উপর একটা বেয়াড়া রকম ঝোঁক পড়িয়া গেল।

সদু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটা ঢোঁক গিলিয়া মাথাটা নত করিয়া ফেলিল। কানের সোনা দুইটি গালের উপর পড়িয়া ঝিকমিক করিয়া উঠিল।

একটু দেখিলাম, তাহার পর বলিলাম—কি করিয়া যে বলিলাম তাই ভাবি—বলিলাম, তুমি একটু না আসাতে সদু, আমার সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেছে।

মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। একবার ঘাডটা উঁচু করিয়া চোখ দুইটি তুলিয়া তখনই আবার নত করিয়া লইল। আর একটি এই চকিত দৃষ্টির আশায় অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম; পুরস্কৃত হইতাম কি না কে জানে, তবে ঝড়ুটা বাদ সাধিল। ঘরের ভিতর ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পড়া করিতেছিল, মহম্মদ তোগলকের পাগলামি সম্বন্ধে একটা ছাইপাশ প্রশ্ন করিয়া সব মাটি করিয়া দিল।

২২এ অগ্রহায়ণ

অনেক দিন কিছু লিখি নাই। একেবারে সদু-ময় হইয়া আছি; একটুও কি ফুরসৎ আছে আর? মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবেরাও গঞ্জনা দেয়। যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহারা বলে, হ্যাঁ রে, তুই হেন যে আড্ডাবাজ, তাকেও পর্দানশীন ক'রে ফেলেছে একেবারে! কেউ সাত পুরুষে আর বিয়ে না করে।

সদুকে এই সব অভিমতের কথা যখন শুনাই, সে কৃত্রিম অভিমানে বলে, থাক না তুমি বন্ধুদের নিয়ে। পায়ে কি শেকল আঁটা আছে?

বলি, আছে যেন একটা।

হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলে, আছে যেন একটা! তা সে কি আমি পরাতে গিয়েছিলাম?

না, শিকলটা আমি নিজেই পরিয়াছি। সে খুব সংক্ষিপ্ত কথা। শিকলটা গড়িতেই যা দেরি হইয়াছিল; পরিবার সময় এক কথাতেই পরা হইয়া গেল।

ইদানীং সব ছাড়িয়া ঠাকুরদাদা সেই হাতের পাঁচ ছেলেটির জন্য বড় তাগাদা দিয়াছিলেন। তাহার রাশি, গণ, মেল ইত্যাদি যোগাড় করিতে করিতে কয়েক দিন কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু শেষে আর কোন-মতেই রুখিয়া রাখা গেল না। বাড়ি গিয়াছে, কাজের ভিড়, প্রভৃতি কয়েকটা অছিলা পর্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন একদিন নিরুপায় হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতেই হইল।

সেদিন যে কি মুশকিলেই পড়িয়াছিলাম, বিধাতাই জানেন। দশটা, এগারোটা, বারোটা বাজিয়া গেল, কাহারও দেখা নাই; কেই বা দেখা দিবে? ঠাকুরদাদা এক-একবার গলিতে উঁকি মারিয়া আসিয়া উদ্বিগ্ন-ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন, আমি ক্রমেই মূঢ়ের মত নির্বাক হইয়া আসিতেছি, কি করিয়া সামলাইব? শেষকালে বৃদ্ধ আর থাকিতে পারিলেন না; আমার হাত দুইটা ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ শৈলেন, তুমি কি বুড়ো ঠাকুরদাদাকে মিছে আশা দিয়ে পরিহাস করছ ভাই? অনেকে এমনও করে। অশ্রুতে দুইটি শীর্ণ গাল প্লাবিত হইয়া গেল।

ইহার পরেও সঙ্কোচ করিয়া থাকা মহাপাতক। আমি মাটির দিকে

চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, ঠাকুরদা, আমিই মস্ত বড় একটা মিছে আশা ক'রে ব'সে আছি ; আমায় ক্ষমা করুন। আমি নিজের সম্বন্ধেই এতদিন ব'লে এসেছি।

সব লিখিয়া রাখা অসম্ভব এবং বিশেষ প্রয়োজনও নাই ; মোট কথা, ঠাকুরদাদা একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তিনি যে আমার কথা এতদিন ভাবেন নাই, এইটিই তাঁহার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল, এবং এই সমস্যা পূরণের ভার উলটাইয়া আমার উপর পড়িল।—হ্যাঁ হে শৈলেন, এমনটা কেন হ'ল বল দিকিন ?

আমি বলিলাম, কি জানেন ঠাকুরদা, আলোর নীচেই অন্ধকার ; বড় কাছে থাকায় আমি সেই অন্ধকারে প'ড়ে ছিলাম বোধ হয়।

সম্ভব। তা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে লব, প্রেম, কত কি হচ্ছে, কই, ঘুণাক্ষরেও তো জানতে পাবি নি !

সেসব আমরা কেউ অত বুঝি-টুঝি না ঠাকুরদা ; আমিও না, আপনার নাতনীও না। সেকেলের চাল ধ'রেই ব'সে আছি।

সম্ভব। না হ'লে এত সেকেলেমানুষ-ঘেঁষা হতে না দুজনেই। কিংবা এও তো হতে পারে যে, ওই যে বললে আলোর নীচেই অন্ধকার, সেইজন্যেই হাতের কাছে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, কিছু দেখতে শুনতে পাই নি।—বলিয়া চশমার উপর দিয়া আমাব দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদাদার অত্যাচারে তাডাতাড়ি মাস-খানেকের ছুটি লইতে হইল, এবং ইহারই একটি সার্থক দিনে সদু আর আমার মধ্যকার ক্রমসঙ্কীর্ণায়মান ব্যবধান একেবারেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

# "কস্মৈ হবিষা বিধেম ?"

আলোচনাটা রেলগাড়ি হইতে আধ্যাত্মিকতায় গড়াইয়া পড়িল।

শুভেন বলিল, ও জিনিসটা আমাদের দেশের নদী-নালাগুলোকে শৃঙ্খলিত ক'রে ম্যালেরিয়ায় দেশটাকে জর্জরিত ক'রে দিয়েছে, এখন সেদিক থেকে ফুরসুৎ পেয়ে ধর্ম নিয়ে পড়েছে।

তারাপদ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, ধর্ম নিয়ে ?

শুভেন উত্তর করিল, ধর্ম নিয়ে। না বিশ্বাস হয়, আজ একবার হাওড়া স্টেশনটা ঘুরে এস। পূজোর ছুটি আরম্ভ হয়ে গেল তো? সমস্ত কলকাতার লোককে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত; স্পেশাল ট্রেন, ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট, বিজ্ঞাপনের চটকটাও লক্ষ্য ক'রো,—চ'লে এস সব—অভাবনীয় কন্‌সেশন—ভুবনবিখ্যাত তাজ দেখবে চল, শারদ-জ্যোৎস্নাস্নাত তুষারস্বপ্ন দেওয়ান-ই-খাস, জব্বলপুরের মর্মরশৈল, অজন্তা, ইলোরা। পূজো রইল শিকেয় তোলা, রেলের ডাকের কাছে মায়ের ডাক? বাড়ির পূজো তো উঠেই গেছে বলা চলে, আসর রেখেছে বারোয়ারি। মা এখন সর্বজনের ঘর থেকে মানে মানে বেরিয়ে এসে, সার্বজনীন নামে কোন রকমে টিকে আছেন; তবে লৌহদানবের সঙ্গে কম্পিটিশনে এটুকুও বজায় থাকবে কি না বলা যায় না। আরও গোটাকতক স্পেশাল, ডুপ্লিকেট, ভাড়া সম্বন্ধে আরও একটু কন্‌সেশন,—দেখবে, সার্বজনীন বারোয়ারিতলাগুলোও ফাঁকা মাঠ হয়ে গেছে।

তারাপদ বলিল, তোমার যে পূজোর ওপর অর্থাৎ বাড়িতে প্রতিমার সামনে ব'সে পূজোর ওপর এ রকম গভীর আস্থা, এটা আমার জানা ছিল না।

শুভেন উত্তর করিল, পূজোর ছুটিটির ওপর ষোল আনা আস্থা থাকবে আর পূজোটির ওপর থাকবে না, এর আমি মানে বুঝি না। আসল কথা, পূজোর আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে আমরা স'রে যাই ব'লেই পূজোর ওপর আস্থা ক'মে আসছে। সেই কথাই আমি বলছিলাম। এই স'রে যাওয়ার সুবিধে ক'রে দিয়েই রেলগাড়ি আমাদের সর্বনাশ সাধন করছে।

তারাপদ বলিল, শুভেনের নিজের মতেই লৌহদানবকে যখন পেরে ওঠা যাবে না, তখন তার কথা যাক। বাকি থাকে পূজো, প্রার্থনা—এই সব। এ সম্বন্ধে ।ক আমরা সকলেই শুভেনের সঙ্গে একমত ?

শৈলেন বলিল, তোমার মতটা কি শুনি আগে ?

আমার মত, আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক।

শুভেন টিপ্পনী করিল, বিশ্বমানবতার স্বপ্নবিলাসী ! রাধানাথ ?

রাধানাথ ডান হাতের আস্তিন গুটাইয়া উপর-হাতে বাধা গোটাকতক মাদুলি মেলিয়া ধরিল, তাহার পর আস্তিনটা আবার যথাপূর্ব নামাইয়া দিয়া টীকাস্বরূপ বলিল, এগুলোকে পূজোও বলতে পার, প্রার্থনাও বলতে পার। অবশ্য সবাই ফলপ্রদা নয় ; রূপোরটি—মা শীতলা বাঁচিয়েছিলেন, বাঁচানোয় যে কৃতিত্বও ছিল, তা মুখের দাগগুলো দেখেই বুঝতে পারবে, যমরাজ এই গরিবের প্রাণটুকুর জন্যে কি খোঁড়াখুঁড়িটা লাগিয়েছিলেন। তামারটি—ওলাইচণ্ডী, শাশুড়ীর সুপারিশ। কিছু ফল এখনও পাই নি ; সম্প্রতি একটা শর্ত পেশ করেছি, যদি আবার এই শীতকালটায় বাতে উপদ্রব না করে তো ষোড়শোপচারে পূজো দিয়ে মাদুলিটা সোনার ক'রে দোব, দেখি কি হয় ! তবে খতিয়ে দেখেছি, মোটের ওপর শত-করা পঞ্চাশটা প্রার্থনা পূর্ণ হয়। জীবনভোর প্রার্থনা ক'রেই কেটে গেল ব'লে কোন্ অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা সেগুলো পূর্ণ হয়, সে তত্ত্বের কথাটা অবশ্য

ভেবে দেখবার সময় পাই না। আর একটা মজা দেখি, এটা বোধ হয় মাত্র আমারই জীবনের একটা বিশেষত্ব, দেখেছি, সেই শক্তি প্রার্থনাগুলি অন্‌টারুনেট্‌লি মঞ্জুর করেন, একটি তথাস্তু, পরেরটি নৈব চ। অবশ্য ভুল হয়ে যায়, তবুও যতটা পারি প্রার্থনাগুলিকে রেগুলেট ক'রে চলবার চেষ্টা করি। যেমন ধর, পূর্ণ হবার পালা জেনে এই সেদিন প্রার্থনা করেছিলাম, মা, অন্তত পাঁচটা টাকাও মাইনে বাড়িয়ে দাও। জানই তো, গত মাস থেকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশে উঠেছি। এর পরেরটি মঞ্জুর হবে না, দেবী বোধ হয় বেশি আশকারা দিতে চান না; তাই প্রার্থনা করেছি, মা, যেন শত পুত্র লাভ করি, বেশ পৌরাণিক গোছের প্রার্থনা; কিন্তু ও ধৃতরাষ্ট্রেরই পোষায়, পঁয়ত্রিশ টাকায় তো অতবড় হেঁপা সামলানো যায় না। এ প্রার্থনা মঞ্জুরও হবে না। বেশ নিশ্চিন্দি আছি। এর পরের প্রার্থনা করব, গিন্নীর বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার মন হোক, গেছেও অনেক দিন। তার পরের প্রার্থনাটা হবে ( শুভেনের পানে চাহিয়া ) শুভেনের রেল-দানবকে বিনষ্ট করবার জন্যে।

শুভেন রাগতভাবে চাহিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তারাপদ বলিল, বাকি রইলে শৈলেন তুমি। এ সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাটা জানতে পারলে মন্দ হ'ত না।

শৈলেন বলিল, আমায় আপাতত দিন-কতকের জন্যে রেহাই দিলে পারতে, কেন না, আমি এখন ওই দুটোর মধ্যে দোল খাচ্ছি, কোন একটা মীমাংসায় পৌছতে পারি নি।

শুভেন বলিল, তবুও বল না শুনি। আরে, সন্দেহ-দোলায় তো আমরা সকলেই দুলছি। মানুষমাত্রেরই দোলায় আগমন, ঘোড়ায় যাত্রা, ছত্রভঙ্গ ক'রে।

শৈলেন বলিল, আমি তোমার দেবতাও মানি, আবার দেবতা

মেনেও তারাপদর বিশ্বমানবতা মানতে বাধা দেখি না ; কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মানতে হচ্ছে ব্যক্তি-মানবকে অর্থাৎ রাম-শ্যাম-যদুকে, যে দেবতা আর বিশ্বমানব দুইকেই আড়াল ক'রে নিজেকে প্রকট ক'রে দাঁড়িয়েছে। দেবতাও আছেন, বিশ্বমানবও নিতান্ত কবি-কল্পনা নয় ; কিন্তু পূজো করতে হ'লে আর সবকে ছেড়ে এই ব্যক্তি-মানবকেই আগে করব। কেন না দেখা গেছে, তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে দেবতার ভোগ থেকেও কেটে দেওয়ার তার ক্ষমতা আছে ; অথচ দেবতার ক্ষমতা নেই যে, তার কাছে মাথা তোলেন। তোমরা চটছ নিশ্চয়, কিন্তু অকস্মাৎ সেদিন শিলা-দেবতার পূজো করতে গিয়ে এই মানব-দেবতার পূজো ক'রে ফেলে একটু প্রত্যক্ষ ফল পেয়েছিলাম, সেই থেকে আমার ভক্তিটা একটু যেন এই দিকে ঢলেছে। আমরা পূজো করি বিজেতার ( বা বিজেত্রীর )। ধর, ছিন্নমস্তক এবং শূলবিদ্ধ না হয়ে, মহিষাসুরই যদি মার বাহুটাতে শিঙ বিঁধে তাঁকে কাবু করতে পারত, পূজোটা কাকে দিতে আজ—তা ভয়েই হোক, বা ভক্তিতেই হোক ? মহিষাসুর-বেশে দেবতার কাছে হেরেছিল যে দানব, সে এখন মানব-বেশে দেবতাকে দাবিয়ে রেখেছে, নানারূপে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ক'রে। পূজোয় আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু পূজোটা দোব আমি কাকে, তাই নিয়ে আমি একটা সমস্যায় পড়েছি, একটু পরিবর্তন ক'রে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, কস্মৈ হবিষা বিধেম—দেবায় দানবায় বা ? হবিঃ আমি কাকে দোব ? দেবতাকে, না, দানবকে ?

রাধানাথ বলিল, শৈলেনের কথাটা নেহাত ফেলবার নয় ; পূজো যদি লেগে যায় তো প্রত্যক্ষ ফল দিতে মানুষের মত কেউ নয়, তবে মানুষের হাঁ-টা বেশি বড়, অল্পে মন পাওয়া যায় না। পাশের বাড়িতেই শুনলাম, সুবিনয়ের ঠাকুমা সওয়া পাঁচ আনা মানত ক'রে নাতিটিকে

মা-কালীর মধ্যস্থতায় ম্যাট্রিক পাস করিয়ে নিয়েছেন, এদিকে ডালিতে সওগাতে আমার প্রায় টাকা দশেক বেরিয়ে গেল, ভাইটিকে নিতে পারবেন কি না—সে উত্তরটি বড়বাবুর কাছে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। বোঝ কাণ্ডটা, দশ টাকা আর কোথায় সওয়া পাঁচ আনা, তফাতটা দেখ একবার।

শৈলেন মুখ হইতে সিগারেটটি সরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি ঠাকুরের চেয়ে পৌনে আট আনার বেশি পূজোতেই তৃপ্ত হলেন, অবশ্য চাকরি দেন নি, কেন না, তাঁর হাতে চাকরি ছিল না, তবে যা কিছু হাতে ছিল তার মুখ্যাংশ যে আমায় দিয়েছিলেন, এ কথা স্বীকার না করলে অধর্ম হবে।

তারাপদ কাঁকালে একটা বালিশ টানিয়া লইয়া অর্ধশয়ান হইয়া বলিল, তবে একটু সবিস্তারে বল। এত অল্পেই যিনি কল্পবৃক্ষের কাজ করেন, তাঁর কাহিনী দিয়েই আজ সন্ধ্যাটুকু পবিত্র ক'রে নেওয়া যাক।

শৈলেন বলিতে লাগিল, আমি এবার দিল্লী থেকে ফেরবার পথে বৃন্দাবন হয়ে আসি। পৌছুলাম সন্ধ্যার সময়। পরের দিন সকালে একটা ট্যাক্সি এন্‌গেজ ক'রে বড় বড় দর্শনীয় যা আছে, সব দেখে ফেললাম। রাত দশটায় আমার গাড়ি। ভাবলাম, বিকেলটা তা হ'লে হেঁটেই দেখে আসি। একটু গলি-ঘুঁজির ভেতর পর্যন্ত গিয়ে না দেখলে শুধু সাজানো জায়গাগুলো দেখেই কোন একটা স্থান সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা হয় না, যেমন শুধু পোশাকী বেশে এবং পোশাকী কথায় কোন লোকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। গলি-ঘুঁজি ঘোরা ট্যাক্সি কিংবা টাঙার দ্বারা সম্ভব নয়। রোদটা একটু ভালভাবে পড়তেই বেরিয়ে পড়লাম এবং এ গলি সে গলি ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যের সময় একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম; তিনটে গলি সেখানে

মিশেছে, এক পাশে খানিকটা খোলা জায়গা, তার পেছনে একটা মাঝারি-গোছের মন্দির।

আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, খোলা জায়গাটাতে একটা পাথরের বেঞ্চের মত ছিল, গিয়ে তার ওপর ব'সে পড়লাম। দৃশ্যের মধ্যে কোন বিচিত্রতা নেই। মন্দিরে কিছু লোক যাওয়া-আসা করছে; সামনে একটি টিউব-ওয়েল; মেয়েরা ঘড়া নিয়ে আসছে, জল ভ'রে মাথায় তুলে নিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

তারাপদ বলিল, আশ্চর্য! তবুও তুমি বিচিত্রতার অভাব পেলে? জল ভরণ আয়ী ব্রজনারী—

শৈলেন তারাপদর পানে একটু মৃদু হাসিয়া চাহিল, বলিল, একটা টিপ্পনী যে হবে এ জায়গাটিতে, তা আমি জানতাম; কিন্তু বৈচিত্র্য কই বল? তুমি যে অর্থে বৈচিত্র্যের কথা বলছ, সে তো দূরের কথা, ওরা যে ব্রজনারী তাই গিয়েছিলাম ভুলে, কেন না, টিটেগর কিংবা নৈহাটির কুলি-লাইনের চেয়ে স্থানটা বিশেষ আলাদা ছিল না। ব্রজনারীর সার্থকতা যমুনায়, শ্যামতৃণাস্তীর্ণ পুলিন, তার ওপর লুটিয়ে পড়ছে কালো জলের ঢেউ। তমালশাখায় শিখীর দল, তারা মুরলীর তানে পেথম ধ'রে কেকাধ্বনিতে কালিন্দীর তীর উচ্চকিত ক'রে তুলছে। আসছে ব্রজাঙ্গনার দল, হাস্যে লাস্যে, কৈশোর-যৌবনের শত ভঙ্গিমায় চঞ্চল লহরী তুলে, জলের স্রোতে একটি লীলাচপল রূপের স্রোত মিশতে আসছে। যাদের ব্রজনারী ব'লে আমরা জানি, তাদের উদ্দেশ্য তো জল ভরা থাকত না, তাদের উদ্দেশ্য থাকত শুধু যমুনা—প্রেমের তীর্থ যমুনা, কালো জলে, তীরের শ্যামলিমায়, আকাশপ্লাবী সুরের মূর্ছনায় ঢলঢল। জল ভরার জন্যে আসা নয়, জল ভরাটা ছিল মাত্র সাধন; আসা হিসাবের সংসার পেছনে ফেলে বে-হিসাবের নর্মক্রীড়া, কার কলসী গেল ভেসে,

কার গেল জলের পূর্ণতায় অতল জলে তলিয়ে, তার হিসেব রাখা হ'ত না। তার জায়গায় সঙ্কীর্ণ গলির প্রান্তে পায়োনিয়ার ফাউণ্ড্রি কিংবা আর্থার ডেভিড্‌সন কোম্পানির নলকূপ। মিউনিসিপ্যালিটি লেজারের আয়ব্যয় কড়াক্রান্তিতে পর্যন্ত ক'ষে নিয়ে আড়াই ফিট একটি পাকা চত্বর গড়িয়ে দিয়েছে। সেইটুকুতে কলসী আগে বসাবার অধিকার নিয়ে তোমার 'জল ভরণ আয়ী'দের মধ্যে থেকে যে সুললিত ব্রজবুলির বুকনি মাঝে মাঝে নির্গত হচ্ছে, তাতে—রক্ষে যে মন্দিরের দেবতা পাষাণরূপেই রয়েছেন—নররূপে থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ মেরে যেতে হ'ত।

শুভেন হাসিয়া বলিল, শৈলেনকে চটিয়েছ তারাপদ।

তারাপদ বলিল, মাফ চাইছি শৈলেন। অত অল্প একটু উসকে দিতেই যে তোমার মধ্যেকার কবিটি এমন উগ্র হয়ে বেরিয়ে পড়বেন, এমন আশঙ্কা করি নি। গল্প বল।

শৈলেন বলিয়া চলিল, আমি অলসভাবে এই সব কথা ভাবছিলাম, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই বিরোধ। সেটা ছিল যুগদেবতার যৌবন অর্থাৎ আতিশয্যের কাল; এটা হচ্ছে যেন বার্ধক্য, এখন জল পরিবেশন করতেও যেন হিসেব খতিয়ে তার হাত কেঁপে উঠছে; নলকূপের সঙ্কীর্ণ জলধারা আর তাই নিয়ে এই কলহ দেখে-শুনে আমার এই কথা মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যা গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের কলে লোক ক'মে এল এবং মন্দিরে দু-একটি ক'রে পূজকের সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময় কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। দেখলাম, আরতি শুরু হয়েছে। উঠে গিয়ে এক পাশটিতে দাঁড়ালাম।

হিন্দু হ'লেও স্বীকার করবে, হিন্দুদের পূজা-অনুষ্ঠান জাতিগত সৌন্দর্যজ্ঞানের একটা চমৎকার নিদর্শন, তার মধ্যেও আরতি জিনিসটি

সৌন্দর্যের একেবারে চরমোৎকর্ষ, সময় হিসেবে, আবার চারুশিল্প হিসেবেও, যদি পূজোর একটা অঙ্গকে চারুশিল্প বলতে আপত্তি না কর।

আরতি শেষ হ'লে পেছনকার লোকেরা এক-একটা প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেল। খালি পেয়ে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। মথুরা-বৃন্দাবনের অধিকাংশ মূর্তির মত এও দেখলাম রাধাশ্যামের যুগল মূর্তি। আগন্তুকদের যারা বাকি রইল, তারা স্বভাবতই একটু বেশি ধর্মপ্রবণ বুঝতেই পার, না হ'লে বাইরের দিকে দাঁড়িয়েই এক-একটা প্রণাম ঠুকে খ'সে পড়তে পারত। তারা প্রায় সবাই দেখলাম স্ফুট বা অস্ফুট স্বরে দু-একটা ক'রে স্তব আওড়ালে, তারপর সাড়ম্বরে আবার প্রণাম ক'রে প্রায় সকলেই একটি ক'রে পয়সা বেদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু-একজন ক'রে চ'লে যেতে লাগল।

আমি একটু ফাঁপরে পড়লাম। একটিও স্তব জানা নেই, অথচ এসে দাঁড়িয়েছি একেবারে মূর্তির সামনে। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে অপরিসীম একটি তৃপ্তি অনুভব করছিলাম, যা সত্যিকার পূজো, সেটা কোথায় গেল, আর সন্ধান পেলাম না। দেবতা কি ভাবছেন বলা যায় না, তবে দেখলাম, কয়েকজন মানুষ যেন আমায় দেখে একটা দুর্বোধ্য সমস্যায় প'ড়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, ভাবটা যেন—এ আবার কি জীব, মন্দিরে আসে, অথচ স্তব জানে না! এই সমস্যাপীড়িতদের মধ্যে একজন মন্দিরের পুরোহিত, পাণ্ডা বা অন্য সহকারী। সে লোকটা মূর্তি থেকে একটু দূরে দুই হাঁটুতে ভর ক'রে কোমর মুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না, কেমন একটা হিসাব-কুটিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; মূর্তির দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে, যেন অব্যর্থ দৃষ্টিতে প্রণামী পয়সাগুলোর হিসেব ক'ষে যাচ্ছে, বোধ হয় পরে

ভাগাভাগিতে ইতরবিশেষ না হয় সেই জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল,—যদি ঠিক বুঝে থাকি তো তাতে শ্লোক না জানার জন্যে কৌতূহল ছিল, শ্লোক না জেনে মন্দিরে এতদূর এগিয়ে আসার জন্যে বিদ্বেষ ছিল এবং এই শ্লোক না জানার অপরাধটার জন্যে ভাল রকম প্রণামী দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছি, কি না করছি, সেই নিয়ে একটা লুব্ধ উদ্বেগ ছিল। আর সবাই যারা আমার অজ্ঞতায় কৌতূহল অনুভব করছিল, তাদের অগ্রাহ্য করলাম, কিন্তু এর দৃষ্টির সামনে আমি কোনমতেই নিজের অন্তরের শুদ্ধিটাকে ধ'রে রাখতে পারলাম না। একটু পরে যেন ধ্যান করছি এই ভাবে, অর্ধস্তিমিত নেত্রে আস্তে আস্তে শুরু ক'রে বেশ দ্রুতভাবেই ঠোঁট নাড়তে লেগে গেলাম। তোমরা শুনে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হ'লে না, দেবতাও নিশ্চয় সেদিন ওই মেকী ঠোঁট-নাড়ায় সন্তুষ্ট হন নি ; কিন্তু তখন ভাবগ্রাহী দেবতা তো আমার কাছে সত্য নয়, সত্য ছিল দুটি সন্ধানী দৃষ্টির বিষাক্ত তীক্ষ্ণ চাহনি। তাকেই নরম করবার জন্যে আমার সমস্ত সত্তা উঠে প'ড়ে লেগেছিল, কথাটা তোমার প্রিয় সাইকলজি-সম্মত তারাপদ। হাসছ বটে, কিন্তু নিতান্ত হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

তারাপদ বলিল, হেসে ওড়াবার জন্যে হাসছি না ; তোমার তাৎকালিক অবস্থাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে, স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি, দুটো উগ্র চোখের সামনে পরিত্রাহি ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছ, তাই—

শৈলেন বলিল, তোমার কল্পনা আছে, কিন্তু সহানুভূতি নেই, নইলে আমার অবস্থাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলে চোখ দুটো অশ্রুতে ভেসে যাওয়ারই কথা। যাক, অনভ্যাসের দরুন ঠোঁট যখন প্রায় আড়ষ্ট হয়ে এসেছে, একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলাম। দেখি, কোন ভাবান্তর নেই, কিংবা যদি ভাবান্তর ছিলই তো বরং আরও উগ্রতার দিকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে আমার স্ফুরিত অধরোষ্ঠের সব ফাঁকিই যেন ধ'রে ফেলেছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা হিংস্র উল্লাস—যেন একটা আশা, এইবার দুর্বলতাকে কেন্দ্র ক'রে মোটা রকম ঘুষ আদায় করতে পারবে। পাণ্ডাজাতীয় লোকদের মধ্যে তুমি এই জিনিসটা আকছারই দেখতে পাবে। পাণ্ডা হচ্ছে ধর্মের খেয়ায় আমাদের পারানি, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধীয় আমাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতায় ওরা মোটেই দুঃখিত নয়, কেন না ওই ত্রুটি-বিচ্যুতিই ওদের উপজীবিকা। কথাটা বড অদ্ভুত নয়? কিন্তু বড সত্য। তুমি যত পাপ করবে, তত বড় তোমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, তত বড় মোটা কাঞ্চনমূল্য পুরুতঠাকুর বা পাণ্ডার ট্যাঁকে গিয়ে উঠবে, তার দুঃখ করবার ফুরসৎ কোথায় বল?

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বলবে বোধ হয়, মন্দির ত্যাগ ক'রে চ'লে আসছিলাম না কেন? তার দুটো কারণ ছিল, প্রথমত তো চ'লে আসতে পা উঠছিল না, যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল; আর দ্বিতীয়ত—পা যদি কোন রকমে উঠতও, চ'লে আসতে সাহস হচ্ছিল না। না হবার কারণ, পেটে যেমন একটাও শ্লোক ছিল না, পকেটে তেমনই একটাও পয়সা ছিল না যে, প্রণামী দিয়ে স'রে পড়ি। স্তব আর পয়সা দুদিক দিয়েই ফাঁকি দিয়ে এদের সামনে দিয়ে চ'লে আসবার যে দারুণ লজ্জা আর অস্বস্তি, তার আমি সম্মুখীন হয়ে উঠতে পারছিলাম না। আমি একটা ফাঁকতালের অপেক্ষা করছিলাম। অন্যান্য কৌতূহলীরা একে একে যাচ্ছে, পাণ্ডাঠাকুরের একটু সুমতি হ'লেই স'রে পড়ব। ততক্ষণ ঠোঁট যেমন নড়ছে নড়ুক।

হাসিও পায়; এসেছি দেব-মন্দিরে, কিন্তু আমার দ্রুত পরিবর্তনটা লক্ষ্য কর। দেবতাকে তো আর সেখানে থাকতে দেয় নি ওরা। তা হ'লে নিশ্চয় করুণাপরবশ হয়ে তিনি আমায় বাচাতেন।

ঠিক কথা, পকেটে পয়সা ছিল না বটে, তবে একটা আধুলি ছিল। কিন্তু গোটা একটা আধুলি তো প্রণামী দেওয়া যায় না, বিশেষ ক'রে প্রণামী যখন ঠাকুরকেই দেওয়া হচ্ছে না, ভাঙাবারও কোন অন্য উপায় নেই। ঠোঁট নাড়ার নেপথ্যে, কি যে করব মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ স্মরণ হ'ল, ব্যাগে একটা অচল পয়সা আছে ; অচল মানে সেটা মোগল আমলের কিংবা ওই রকম কোন সময়ের পয়সা। এবারে দিল্লীতে সংগ্রহ করি। ছাপ-টাপগুলো বেশ আছে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

চামড়ার ব্যাগ মন্দিরে বের করা যাবে না, আস্তে আস্তে পকেটে হাত পুরে দিলাম, সন্তর্পণে বোতাম টিপে পকেটের ভেতরই ব্যাগটা খুললাম। উদ্বেগে হাতটা কাঁপছিল, কম্পিত আঙুলেই মুদ্রা দুটোকে অনুভব ক'রে একটা ধরলাম। বের করতে গিয়ে একবার প'ড়ে গিয়ে ব্যাগের কোণে স'রে গেল। সিগারেটের পাইপ, ডাক-টিকিট প্রভৃতির মাঝ থেকে আবার তাকে উদ্ধার ক'রে মুঠোয় নিয়ে বের করলাম এবং মূর্তির পায়ের কাছে ফুলের গাদার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাজটা একা আমার হাতই সারলে, কেন না আমার দৃষ্টি এদিকে বরাবরই পাণ্ডাঠাকুরের দিকে ছিল ; স্তব জানি আর নাই জানি, এদিকে আমার ভক্তি যে মূল্য হিসেবে আর সবার সঙ্গেই সমান, সেদিকে যে আমি দেব-মূর্তিকে ফাঁকি দিচ্ছি না, সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন কি না, সেটা জানার বিশেষ সার্থকতা ছিল। তারপর প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলাম।

কথাটা শুনতে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মন্দির থেকে বেরুতেই বাইরের হাওয়া লেগে কপালটা যেন জুড়িয়ে গেল।

বাইরে একটু রক, তাই থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। কয়েকজন স্ত্রীলোককে উঠতে দেখে আমি এক পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে রুক্ষ গলাটাকে সাধ্যমত মোলায়েম ক'রে কে একজন ডাকলে, বাবুজী!

ফিরে দেখি সেই পাণ্ডা। অচল পয়সা চালাবার অপরাধে মন দুর্বল হয়েই ছিল, বুকটা যেন ধড়াস ক'রে উঠল। যথাসাধ্য মনের ভাবটা সামলে নিয়ে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করলাম, কেয়া মহারাজ? সঙ্গে সঙ্গে তার মহারাজত্বটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, দণ্ডবৎ হই! বিদেশ বিভুঁই, একা মানুষ, বুঝতেই তো পারছ অবস্থাটা।

পাণ্ডাজী বললেন, আপকো জরা ভিতর আনে পড়েগা, বড়া পাণ্ডাজীকা ঘরমে।

আত্মারাম খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করছে। বললাম, যেতাম, বড় মহারাজের সঙ্গলাভ—সে তো মহাভাগ্য, পরম কাম্য জিনিস; কিন্তু আমায় এক্ষুনি বাসায় ফিরতে হবে।

পাণ্ডাজী একটু গূঢ় মৃদু হাস্যের সঙ্গে ডাইনে ও বাঁয়ে মাথা নাড়লেন, শেষে বললেন, রাধাস্বামী নারাজ হোয়গা বাবুজী, ছোড় নেহি সকতে।

সর্বনাশ! আবার রাধাস্বামীকেও জড়িয়েছে। ছাড়বে তো নাই, তবু একবার শেষ চেষ্টা করা। বললাম, না ছাড় মহারাজ, যেতেই হবে; কিন্তু ছেড়ে দিলেই ভাল করতে। বাসায় একগুষ্টি মেয়েছেলে, চারজন অসুখে পড়েছে, নেহাত রাধারমণকে না দেখলে প্রাণ আইঢাই করে, সেইজন্যে কোন রকমে একবার আসা।

ভেতর থেকে একজন গলা বাড়িয়ে হাঁক দিলে, আরে, লে আয়া বাবুকো মথরাপরসাদ?

তাঁর চেহারা নজরে পড়ল না, কিন্তু আওয়াজ শুনে যা ধারণা হ'ল, তাতে আমি একেবারেই হাল ছেড়ে দিলাম। অবসন্ন কণ্ঠে বললাম, চল তা হ'লে।

দু পা এগিয়ে মনে হ'ল, অদৃষ্টে যা আছে সে তো ফলবেই, তবু আগে থেকে সাফাই গেয়ে রাখা ভাল। বললাম, পাণ্ডাজী মহারাজ, ওই প্রণামীটা যা দিয়েছি নেহাত নিরুপায় হয়েই, না হ'লে ও কি আর জেনে শুনে কেউ রাধাস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে দিতে পারে? ওঁর কাছে তো সবাই সমান, মোগল রাজাই বল আর ইংরেজ গভর্মেণ্টই বল। শুভেন, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, যেন ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছ।

শুভেন বলিল, তোমায় ফাঁসিতে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে যাচ্ছে, উৎকণ্ঠিত হব না? বন্ধুবিচ্ছেদের কষ্ট।

শৈলেন বলিল, কষ্টের বদলে এবার হিংসে হবে। বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে ফাঁসির বদলে যদি গলায় পুষ্পমাল্য তুলে দেয় তো—

তিনজনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, মানে?

শৈলেন বলিতে লাগিল, দেবতার বেদী থেকে একটু দূরে এক পাশে একটা ছোট ঘর। মূর্তির সামনে আসতেই বড় পাণ্ডাজী সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, 'আইয়ে বাবুজী' ব'লে দু হাত বাড়িয়ে আমায় আমন্ত্রণ করলেন এবং দু-একবার এদিক ওদিক চেয়ে আমি কিছু ভাববার বোঝবার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে মালাটি নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, বৈঠিয়ে।

মেঝেয় নয়, একটি নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। তিনিও আমার সামনে বসলেন। ভুঁড়িটি পায়ের অনেকখানি ঢেকে ফেলছে, মুখে প্রসন্ন হাসি, পায়ের তেলোয় হাত বুলোতে বুলোতে দুলে দুলে বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে বললেন, ভক্তি তো আজকাল বড় দেখা যায় না বাবুজী,

তাই খাঁটি ভক্ত দেখলেই বড় আনন্দ হয়। আরে, চন্নামৃৎ দেও বাবুজীকে মথরা, আওর ভোগকা পরসাদি ; উঠো, লে আও।

মথুরাপ্রসাদ একটু বিমূঢ়ভাবে বড় পাণ্ডাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইল—যেন কিছু বলতে চায়, অথচ আমার সামনে বলা সমীচীন হবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না। বড় মহারাজ হেসে বললেন, আরে. রাতহিকা পরসাদিসে লে আও দো-চার পেঁড়ে, দো পত্তি তুলসী ডাল দেও।

বুঝলাম, সন্ধ্যের প্রসাদ ইতিমধ্যে কাবার করেছে এরা। রাত্রের ভোগের জন্যে রাখা মিষ্টি থেকে কিছু বের ক'রে, দুটো তুলসীপাতা ফেলে দিয়ে আমায় খুশি করতে চায়। ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলাম ; আপত্তিও করলাম মৃদু গোছের। জোর আপত্তি করবার শক্তি ছিল না বা ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল, সব দেখে শুনে আমি ক্রমেই অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম।

বড় মহারাজ বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে, দোষ কি আছে? ভগবান তো ভক্তের মুখ থেকেই আহার লেন। আগে ভক্ত তব্ ভগবান. আগে সুদামা তব্ কিষুণজী, আগে তুলসী তব্— আরে, তু খড় কেঁও রহে মথরা, যাও। ভক্তি বোলো আর বিশোয়াস বোলো বাবুজী—এক খালি বাঙ্গালীয়নমে হ্যায়, ব্যস্। আমি তো দূর থেকে ব'সে দেখছিলাম বাবুজী, কেতো লোক আসছে, কেতো লোক যাচ্ছে, লেকিন চেহরে পর ভক্তি কাঁহা?

বিমূঢ় হয়ে গেছি ; এর পরিণাম কোথায়? ঠাট্টা করছে নাকি?

মথুরাপ্রসাদ প্যাঁড়া আর চিনি ভরা একটি মাঝারি গোছের সরা সামনে বসিয়ে কুষি ক'রে হাতে চরণামৃত দিলে, তারপর সামনে মেঝের ওপর ব'সে চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে হাত নেড়ে বললে, মৈ তো মুগ্ধ বনে

ওহি দেখ রহা থা, আঁখ আঁধা মুনে হুয়ে ক্যা ধ্যানকা ভার! মানো কে শিবজী রাধাশ্যামকা ধ্যান কর রহে হ্যাঁয়—ব্যস্, সির্‌ফ ওঁঠ (ঠোঁট) জরা জরা হিল রহা হ্যাঁয়। কহা তো—মৈ তো মুগ্ধ বনে ওহি দেখ রহা থা।

মন্দিরে তখনও লোক যাওয়া-আসা করছে, কেউ দিচ্ছে একটি পয়সা, কেউ দিচ্ছে না; দেখলাম, প্রণামী দেওয়ার মত হাত চললেই দুজনের নজর কথাবার্তার মধ্যেও সেই দিকে গিয়ে পড়ছে। আমি এই বিশিষ্ট রকম আপ্যায়নে লজ্জিত যে না হয়ে উঠছিলাম এমন নয়; কিন্তু জানই তো, সব বিশিষ্টতা অর্জনের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। আমি চারিদিকের অনাদৃতদের মধ্যে এই আদর-অভ্যর্থনায় অসন্তুষ্ট হচ্ছিলাম না, যদিও এতবড় অন্যায় ব্যাপারটা দেব-মন্দিরেই হচ্ছিল। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছিলাম, কি এমন ব্যাপার ঘটেছে, যার জন্যে এই একটু আগে যার বা যাদের দৃষ্টি আমায় ক্রূর বিদ্বেষে বিঁধছিল, তাদের কাছে আমি এত বড় ভক্ত হয়ে গেলাম যে, আমার সুস্পষ্ট প্রবঞ্চনাকে ওরা শিবের ধ্যানের সঙ্গে তুলনা করতেও পেছপা হ'ল না? বাঙালী ব'লে? বৃন্দাবনে বাঙালী তো কম নয়, এবং আমার সামনেই আরও দু-একজনকে প্রণাম ক'রে যেতে দেখলাম। তবে?

আরও খানিকটা সময় গেল। সময়টুকু পাণ্ডাজী ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর উপদেশ দিয়ে ভরিয়ে দিলেন,—দেবতার ওপর ভক্তি এবং দেব-সেবকের ওপর ভক্তি, বিশেষ ক'রে দেবসেবকের ওপর, কারণ ওঁর থিয়োরি অনুযায়ী আগে দাস, তবে দেবতা, সামনের খুরিতে তার নজিরও উপস্থিত। আমিও বিধিমত নীচুর দিক থেকে আরম্ভ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত দেবসেবককে ভক্তিরসে এতটা দ্রব ক'রে ফেললাম যে, তিনি আমার ঘাড়ে আর একটি প্যাঁড়ার খুরি না চাপিয়ে ছাড়লেন না। সঙ্গে সঙ্গে কিছু নির্মাল্য এবং উপঢৌকন হিসাবে একটি রাধাকৃষ্ণের

পিতলের ছাপ পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, বাসার ঠিকানা আর দেশের বাড়ির ঠিকানা না নিয়ে ছাড়লেন না, অবশ্য যে বাসার ঠিকানা তিনি পেলেন তা বৃন্দাবন চ'ষে ফেললেও খুঁজে পেতেন না, কেন না গলির নাম আর বাডির নম্বর দুটোই দিল্লী থেকে ধার করা ; আর দেশের ঠিকানা ধ'রে গেলে তাঁকে ভবানীপুরে আমার কাছে না পৌছে বরিশালে সুলোচন দত্ত চৌধুরীব কাছে পৌছতে হ'ত। লোকটা নেহাত কাল্পনিক চরিত্র নয়, আমার কিছু টাকা মেরে এখন দেশে গিয়ে দোকান ফেঁদেছে। ঘাড়ে গোটা দুয়েক পাণ্ডা চাপলে আমার আনন্দ হবার কথা।

শৈলেন বালিশে হেলান দিয়া নূতন একটা সিগারেট ধরাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। তিনজনে উৎসুকভাবে খানিকটা অপেক্ষা করিল, তাহার পর তারাপদ বলিল, কি হে, তোমার কাহিনী শেষ হয়ে গেল নাকি ? অন্যদের তুলনায় কেন যে হঠাৎ অত খাতির, সে কথা বললে না তো ?

শৈলেন বলিল, সে তো আগেই বলেছি, ধরতে পারলে না বুঝি ? অন্যদের পূজোর সঙ্গে আমার পূজোর পৌনে আট আনা পার্থক্য ছিল। সেটা টের পেলাম বাসার কাছে এসে টাংগা থেকে নেমে। বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ব্যাগ থেকে আধুলিটা বের ক'রে টাংগাওয়ালার হাতে দিয়ে বললাম, তিন আনা পয়সা ফেরত দে।

টাংগাওয়ালা ঝুঁকে হাতের তেলোর ওপর মুদ্রাটা দেখলে, তারপর বিস্ময় এবং বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠল, বাবুজী, তফ্‌রি করতে হ্যায় ?

বললাম, সে কি, ঠাট্টা করব কেন রে ?

সে বললে, দেখিয়ে তো কেয়া দিয়া।

মথুরা-বৃন্দাবনের টাংগাওয়ালা, ওদের মুহূর্তের মধ্যে একটা আধুলি বদলে ফেলে হাঙ্গামা বাধানো কিছুই নয়, গোড়া থেকেই কড়া ভাব

দেখিয়ে শুরু করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কি মনে ক'রে থেমে গেলাম; পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে জ্বালাতেই দোখ—সত্যিই আধুলি নয়, একটা পয়সা।

শুভেন কপালে চোখ তুলে ব'লে উঠল, বাস্ রে! ওইটুকুর মধ্যেই ব্যাটা আধুলিটা বদলে পয়সায়—

শৈলেন ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা চাপিয়া বলিল, এবং আমার সেই মোগল আমলের পয়সাটাই। মন্দিরের যত ভেল্কি সেই আধুলিটা কবিয়েছে, আমার অজ্ঞাতে আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে।

কিন্তু সে কথা যাক; কথা হচ্ছে, সেদিন দেব-মন্দিরে মানবই আমাব দেবতাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল দানববেশে, তার বিভীষিকা, তার কদর্যতা দিয়ে। দেবতাকে টেনে নামিয়ে সামান্য একটা রূপোর টুকরো তাঁর বেদীতে বসিয়েছিল, দেবতা প্রতিরোধ কবতে পারেন নি। ব্যাপারটা বোধ হয় সামান্য; কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারকেশ্বরে, গয়ায় যে কাণ্ড হয়ে গেল, এ তারই সগোত্র। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, সেই দানব যদি অন্যদেব চেয়ে পৌনে আট আনা বেশি দক্ষিণাতেই সন্তুষ্ট হয়ে দেবতার হাতের একটি মাত্র মালা, এমন কি দেবতার ভোগের সামগ্রী পর্যন্ত আমার হাতে তুলে দিতে পারে তো আমি তাকে ঠেলে আর কার পূজো করব, কে আমার পূজোর যোগ্য অধিকারী? তোমরা দেবতার কথা, পূজোর কথা তুলেছিলে; কিন্তু ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র—সর্বত্রই দেবতাকে পেছনে ফেলে এই দানবই বিজয়ী বীরের মত এগিয়ে দাঁড়াচ্ছে, পূজো করলে প্রত্যক্ষ ফল হাতে তুলে দিচ্ছে, তাই আমি এ প্রশ্নের উত্তর চাই। সম্ভবামি যুগে যুগে, কিন্তু আর কবে? শুষ্ক সান্ত্বনার কথাটি আঁকড়ে আর কত দিন লোকে বিশ্বাসের বাতিটুকু জ্বেলে রাখবে?

# ধার্মিক

মহেশ গাঙুলী লোকটা বড় ধার্মিক। কিন্তু একেবারে চার পো কলি, ধার্মিক লোকের আর ভদ্রস্থ নাই; যত অত্যাচার তাহাদেরই উপর।

গঙ্গার ঘাটে বসিয়া মহেশ গাঙুলী সেই কথাই ভাবিতেছিল। কাল মাখন চৌধুরী গরুটা খোঁয়াড়ে দিয়াছে।

বেশ, তোর কথাই মেনে নিলাম, অবলা জীব, এই নিয়ে পাঁচ-পাঁচ বারই গেছে বেড়া ভেঙে; কিন্তু তোর বাগান কি উজোড় ক'রে ফেলত? বড় বাড় বেড়েছিস মাখনা। কিন্তু অবোধ জীব হ'লেও গরু সাক্ষাৎ ভগবতী তা জানিস, এত অহঙ্কার সইবে না। এই মা-গঙ্গার সামনে ব'সে প্রাতর্বাক্যে বলছি, যাবি—যাবি—যাবি। অন্যের অনিষ্ট কখন মনেও আনি নি, আমার কথা ফলবেই, দেখে নিস।

হাতের তেলোয় খানিকটা তেল ঢালিয়া লইয়া সজোরে নস্য করিয়া লইল। তাহার পর তেলটা দুই হাতে মাখিতে মাখিতে গঙ্গার পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, নাঃ, ফলেই বা আর কই মা, কলিতে তোমার মাহাত্ম্য আর রইল কই? নইলে জীবন কুণ্ডু, বেটা কেওট, ছেলের অসুখের দোহাই দিয়ে সুদ দিলে না, বাড়ির মধ্যে বামুনকে অমন কটুকাটব্য করলে, উলটে ছেলেটা দেখতে দেখতে চাঙ্গা হয়ে উঠল! আর মাহাত্ম্যর গুমর ক'রো না, যেদিন থেকে সাধ ক'রে পায়ে ইংরেজের বেড়ি পরেছ, সেই দিন থেকেই তোমার মাহাত্ম্য গেছে। তা হক-কথা বলব বইকি মা।

প্রায় শূন্য ঘাট। সকালবেলা মেয়ে-বুড়োদের স্নান, তাহার পর ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের পালা, এখন ক্বচিৎ এক-আধজন মাঝে মাঝে

আসিতেছে, দুই-একটা কথা, তাহার পর স্নান করিয়া চলিয়া যাইতেছে। গাঙুলী গঙ্গাস্নানের সাত-হাতী কাপড়টি পরিয়া তেল মাখিতেছে আর কলিতে অধর্মের দৌড় সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তাকুল হইয়া উঠিতেছে।

মাধব গয়লার মেয়েটা জল লইতে নামিল, আবার জল ভরিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙিয়া চলিয়া গেল।

চিন্তাস্রোতে একটু বাধা পড়িল। মেয়েটা উপরের আগাছার আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলে গাঙুলীর সম্বিৎ হইল, দৃষ্টি ফিরাইয়া একেবারে গঙ্গার পানে চাহিয়া বলিল, তাই দেখছিলাম মা, আমার সেই পূজোর ঘটিটার কাঁসাটাও ঠিক মেধোর মেয়েটার ওই কলসীর কাঁসার মত ছিল কিনা, মনে প'ড়ে গেল, তাই ঠায় দেখছিলাম। গেল তো? নেয়ে উঠে অশথ-গোড়ায় বুড়ো শিবের মাথায় একছিটে ক'রে জল দিচ্ছিলাম, সেটুকুও বন্ধ হ'ল তো? আর গেল কিনা তোমার চোখের সামনে এই গঙ্গার ঘাটেই! ধর্মকর্মের জিনিস, করকরে একটি টাকা—বুকের রক্ত, তাই দিয়ে কেনা, নিক, কিন্তু ও ঘটি আর সরতে হবে না। তোমাতে যদি ভক্তি থাকে মা, কায়মনোবাক্যেও যদি কারও অনিষ্ট-চিন্তা না ক'রে থাকি—

এমন সময় হুড়মুড় করিয়া-একদল পশ্চিমা ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। দুই-তিনজন গঙ্গাবক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, হউ আবতা।

মেয়ে পুরুষ কাচ্চাবাচ্চায় বেশ সুপুষ্ট দলটি। সঙ্গে পোটলা-পুঁটলি হাঁড়ি-কুড়ি লোটা-কম্বলে অনেকগুলি লটবহর। বেশ বোঝা যায়, মুলুক হইতে আসিতেছে, এখানে স্টেশনে নামিয়াছে, গঙ্গা পার হইয়া ও-পারে কর্মস্থানে যাইবে।

এরা ভুল করিয়াছে, এটা ফেরি-ঘাট নয়, ফেরি-ঘাটটা আর একটু

সরিয়া ডান পাশে। ঠিক সামনাসামনি ও-পারের ঘাট হইতে দুইটা ফেরির নৌকা ছাড়িয়াছে। সেই দুইটাকে লক্ষ্য করিয়াই 'হুউ আবতা' অর্থাৎ ওই আসছে। কিন্তু ও দুইটা এ ঘাটে লাগিবে না। মহেশ গাঙুলী ধার্মিক হইয়াও, পরোপকারব্রতী হইয়াও কথাটা কেন জানাইয়া দিল না বলা শক্ত। একটি কচি ছেলে জল খাওয়ার জন্য 'দিদি, দিদি' করিয়া কান্না ধরিয়াছে। তাহার দিদি একটা ঘটি লইয়া লঘু চঞ্চল গতিতে ঘাটের রানা ভাঙিয়া নামিয়া গেল, খানিকটা জলে নামিয়া ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর মাথার কাপড়টা খুলিয়া মুখে, কপালে, সামনের চুলে আঁজলা আঁজলা জল ছিটাইতে ছিটাইতে ওরই মধ্যে হাসির সঙ্গে চীৎকার করিয়া ভাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, চুপ কর্, এই এলাম ব'লে, চুপ কর্ বউয়া।

অথচ জল পাইয়া আর নড়িবার নাম নাই। সতরো-আঠারো বছরের ধাড়ী, আচ্ছা বেয়াক্কেলে তো! ঠায় দেখিয়া দেখিয়া মহেশ গাঙুলীর রাগে আর বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছিল না।

মহেশ গাঙুলী যে রাগিয়াছে, এটা আমার আন্দাজ, ধার্মিক লোক বলিয়াই আন্দাজ করিতেছি; তবে বাক্‌স্ফূতি যে হইতেছে না, এটা আন্দাজ নয়। সত্যই বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছে না এবং চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না। যাহার উপর রাগা যায়, তাহার মুখের উপর হইতে কি চোখ ফেরানো যায়? যে-কাহারও উপর একবার রাগিয়া দেখুন না।

মেয়েটার সঙ্গে এদিকে তাহার মায়ের তুমুল বচসা লাগিয়া গিয়'ছে। ছেলেটা কাঁদিয়া সারা, ওদিকে মুখ ধোওয়া আর শেষ হয় না; বেহায়া, লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া বসিয়া আছে!

মেয়েটা বলিতেছে, খেয়েছি মাথা লজ্জা-শরমের, তোর কি? ইস! উহারই মধ্যে আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। বেশ বোঝা

যায়, অন্তত নিজের তরফ হইতে ঝগড়া করিবার উদ্দেশ্যটা ততটা প্রবল নয়, যতটা বুড়ীকে চটাইয়া তুলিবার।

বুড়ী বলিল, তবে র'স্, এই আসছি তোর মুণ্ডপাত করতে, গঙ্গাজীর মধ্যে থেকে তোকে আর উঠতে দোব না, র'স্ তুই।

সে দুইটা ধাপ নামিতে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বলিল, রুনিয়ার মা, যাচ্ছিস তো আমার ঘটিটা নিয়ে যা। তেষ্টা পেয়েছে।

ঘটি লইয়া কলহের পর্দা চড়াইতে চড়াইতে রুনিয়ার মা প্রায় জলের কাছে পৌঁছিয়াছে। রুনিয়া আঁজলা ভরিয়া জল উঠাইয়াছে, মা আর একটু অগ্রসর হইলেই বরুণাস্ত্র ছাড়িবে। চার পো কলির প্রভাব দেখিয়া ধর্মপ্রাণ মহেশ গাঙুলীর চোখের আর পলক পড়িতেছে না, এমন সময় উপরে সবাই সমস্বরে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল।

মহেশ গাঙুলী গোলমালের মধ্যে ভাষাটা ঠিক বুঝিল না বটে, কিন্তু দলের কয়েকজনের ভীত দৃষ্টি এবং ব্যস্ত তর্জনীনির্দেশ অনুসরণ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। ওপার হইতে যে নৌকা দুইটা ছাড়িয়াছিল মাঝগঙ্গার একটু এদিকে আসিয়া গতি পরিবর্তন করিয়াছে, তাহার মানে— এ ঘাট ফেরি-ঘাট নয়। সবাই যে যাহার বোঁচকা-বুঁচকি কচিকাচা কাঁধে পিঠে মাথায় করিয়াছে। রুনিয়া ও তাহার মাকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে, এদের ত্রস্ত তাগিদ ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও মহেশ গাঙুলীর একটু আর সন্দেহ রহিল না যে, ভাষাটা খুব শুদ্ধ নয়।

বুড়ী তাড়াতাড়ি ফিরিল। রুনিয়া একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া নৌকা দুইটার দিকে দেখিল, তাহার পর পড়ি-কি-মরি করিয়া কাপড় ভিজাইয়া কাদা ছিটাইয়া মাঝপথে মাকে সামনের দিকে ঠেলা দিয়া উঠিয়া গিয়া ভাইটাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং হস্ত ও ঊর্ধ্বাংশ সঞ্চালন করিয়া বুড়ীকে উচ্চৈঃস্বরে তাগাদা দিতে লাগিল।

বুড়ী আসিলে সবাই ফেরি-ঘাটের দিকে হনহন করিয়া অগ্রসর হইল। নৌকা দুইটা তখন ঘাটে প্রায় ভিড়িয়া গিয়াছে।

* * *

রুনিয়া যেখানটায় দাঁড়াইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, মহেশ গাঙুলী চিত্রার্পিতের মত খানিকক্ষণ সেইখানটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর উহারা যে পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে, একবার সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল, একবার মনে হইল, একটা হাঁক দেয় রুনিয়ার নাম ধরিয়া, আর কাহারও তো নাম জানে না। কি ভাবিয়া ডাকিল না। তেলের শিশি, কাচা কাপড় আর নামাবলীটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া রুনিয়া যেখানটায় দাঁড়াইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহার ঠিক সামনে ঘাটের শেষ রানাটির উপর গিয়া বসিল। তাহার পর চিন্তা।

মহেশ গাঙুলী ধার্মিক, তাহার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোড়ন জাগিয়াছে। এ আলোড়নের বিক্ষোভ সে কখনও বুঝিবে না, যে নিজে ধার্মিক নয়—মহেশ গাঙুলীর মতই ধার্মিক নয়। একবার মনে হইল, নিজেই ছুটিয়া যায় রুনিয়ার কাছে, এখনও উহাদের চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাইতেছে। আবার মনে হইল, চাই কি রুনিয়া নিজেই নিশ্চয় আসিয়া পড়িতে পারে। সে কি এতই অন্ধ ? এতবড় একটা ভুল কি সে করিতে পারে ? হঠাৎ সন্ত্রস্ততার মধ্যেই এই বিভ্রমটা ঘটিয়াছে। এ ভাবটা কাটিয়া গেলেই রুনিয়ার মনে পড়িবে, নিশ্চয় মনে পড়িবে।

ঘাটের ওদিকে উহাদের কলরবের আওয়াজ মিলাইয়া গেল। নিদারুণ উদ্বেগে মহেশ গাঙুলীর বুকে একটা উষ্ণ নিশ্বাস জমিয়া উঠিতেছিল ; একটি দীর্ঘনিশ্বাসের আকারে সেটি নামিয়া আসিল। তখন

মনে হইল, ফেরির নৌকা না ছাড়া পর্যন্ত রুনিয়ার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে।

মহেশ গাঙুলী দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফেরি-ঘাটের দিকে চাহিল। জায়গাটা ছাড়িল না, বক্ষের স্পন্দন বাড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে আশায় সেই জায়গাটিতে যেন সম্মোহিত হইয়া গিয়াছে মহেশ গাঙুলী। একবার গঙ্গার দিকে চাহিল, তাহার পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, এই খেয়ার নৌকো ছাড়া পর্যন্ত দেখব, তারপরই বুঝব, তোমার কি ইচ্ছে মা। বুঝছই তো, এই ধন্দে প'ড়েই আমি নিজে গেলাম না, চিরকালই তোমার ওপরই মতিগতি, তুমি যা করেছ তাই হয়েছে, আমি নিজে হতে এগিয়ে তোমার ওপর কারসাজি কববার কে মা? তোমার যদি সেই রকমই অভিরুচি হয়, রুনিয়াব মনে পডবে, সে ফিরে আসবে; না হয় বুঝব, সেও তোমারই ইচ্ছে।

নৌকা বোঝাই হইতেছিল। ওই একটি দলকে লইয়াই ছাডিয়া দিল। মহেশ গাঙুলী আডচোখে দূরস্থিত নৌকাটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। এখনও ধুকপুকানি, মনের ধমই এই, এখনও যদি মনে পড়িয়া যায়, চকিতে চোখে পড়িয়া যদি মনে পড়িয়া যায় ঘাটের কথা তো রুনিয়া ফিরিবেই। তুচ্ছ দুইটা ফেরির পয়সার মায়ায়, কি আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে—আর আত্মীয়-স্বজন তো জানিবেই কথাটা একদিন— এ কি! নৌকা দূরে চলিয়া গেল; উহাদের হাস্যকলরব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া আসিতে লাগিল।

মহেশ গাঙুলী রানা হইতে নামিয়া, রুনিয়া যেখানে জলক্রীডা করিতেছিল, তাহার হাত চারেক এদিকে পাকের উপর হইতে একটি ঘটি তুলিয়া লইল। অর্ধেক পিতল অর্ধেক তামার চমৎকার একটি বেনারসী লোটা।

মহেশ গাঙুলী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে গঙ্গার পানে চাহিয়া বলিল, তাই তো বলি মা, তুমি এখনও ধরাতলে বইছ, আর কলির প্রভাবই কি এতটা প্রবল হয়ে উঠতে পারে? পূজোর ঘটিটা গিয়ে অবধি মনটা যে কি হয়েছিল, অন্তর্যামী মা সুরধুনী, আর কেউ না জানুক, তুমি তো তা জান। কায়মনোবাক্যেও কখনও পাপ করি নি, মনের দুঃখ শুধু তোমায়ই জানিয়েছি, না শুনে কি পারিস বেটী? তাই একেবারে হাতে তুলে দিলি, বললি, নে। ঘটিটিও চমৎকার, একেবারে বাবার ধামের জিনিস—তামায় পেতলে একেবারে পূজোর যুগ্যিটি। আহা, মেড়ো মাগীর হাতে কত অনাচারই হয়েছে, গঙ্গামৃত্তিকে দিয়ে মেজে নিই।

মহেশ গাঙুলী খুব ভক্তিভরে গোটা কতক বেশি ডুব দিয়াই স্নান করিল। তাহার পরে বুড়াশিবের মাথায় ঢালিবার জন্য ঘটিটি পরম নিষ্ঠার সহিত গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে উঠিয়া গেল।

# কৈকালার "দাদা"

তারকেশ্বর যাইতেছি। আমি বসিয়া আছি এক কোণে। গাড়িতে কিছু যাত্রী আছে, বাকি বেশির ভাগই ডেলি প্যাসেঞ্জার। দোরের ওদিকটায় এক স্থানে জটলা একটু ঘন,—হাঁটুর উপর চাদর পাতিয়া তাস খেলা হইতেছে, মাঝে মাঝে অবান্তর আলোচনার ছিটাফোঁটা। ওরই মধ্যে কয়েকজন একটু বিশিষ্ট,—নাম মুখস্থ হইয়া গেল—হরেন, শিবু, জহর মাইতি, ভজহরি—এ লোকটি অত্যন্ত নস্য লওয়ার ফলে 'ন'-র উচ্চারণ হারাইয়াছে।

ট্রেন শ্যাওড়াফুলিতে প্রবেশ করিয়া তারকেশ্বর ব্র্যাঞ্চের প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়াইল। হরেন তাসসুদ্ধ যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

জমাট খেলার মধ্যে 'সেথো'র এ রকম আচরণে জহর মাইতি একটু বিরক্তির সহিত তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কি হচ্ছে?

হরেন কথা কহিল না; আরও খানিকটা বিড়বিড় করিয়া যুক্তকর কপালে তিনবার ঠেকাইয়া উত্তর করিল, বাবার সেক্‌শনে এসে ঢুকলাম, নেহাত একটু ভক্তি-টক্তি করতে শেখ, বুড়োকে নেহাত উড়িয়ে দিও না।

জহর বলিল, অতি-ভক্তি! কোথায় তারকেশ্বর স্টেশন, কোথায় বাবার মন্দির, ব্র্যাঞ্চ আরম্ভ হয়েছে আর অমনই—

শিবু বলিল, যা বলেছ। এ যেন 'এই মাটিতে শ্রীখোল হয়েছে' ব'লে ভুঁয়ে গড়াগড়ি দেওয়া! নাও নাও, দান ফেল। অতি-ভক্তিতেই দেশটা গেল, ত্রিপুরী, ওয়েলিংটন স্কোয়ার দেখছ তো?

ত্রিপুরী-ওয়েলিংটনের নামেই বোধ হয় একটা কলরব উঠিল, গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়ায় কিন্তু সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

হরেন বলিল, তোমরা ঠিক উল্টো বুঝলে, বাবার এখতিয়ারের বাইরে ত্রিভুবনে কোন জায়গাই নেই, তবে শ্যাওড়াফুলিতে এসে গাড়িটা এই লাইনে এসে দাঁড়ালে বাবার কথাটা একটু বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেয়। ওঁয়াদের কথা এমনই ক'রে যত বেশি মনে পড়ে, ততই ভাল। শুধুই তো—আই হ্যাভ দি অনার টু বি সার্ ক'রে সমস্ত জীবনটা গেল।

তাহার পর ইহাদের আর একটু চটাইবার জন্য একটু বক্রহাস্য করিয়া বলিল, যখন স্বরাজ হয়ে বাংলা টাইম-টেব্‌ল হবে, আমি ধুতি-চাদর প'রে গবমেণ্টের কাছে প্রোপোজ করব, তারকেশ্বরের সব গাড়িগুলোকেই 'বাবার গাড়ি' নাম দেওয়া হোক নম্বর দিয়ে আর ত্রিশূলমাকা ক'রে; আর শ্যাওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত এ সেকশনটার নাম রাখা হোক—বাবার সেক্‌শন।

ভজহরি নস্য লইয়া হাতটা ঝাড়িয়া বলিল, বাবার এলাকা বল; স্বরাজে আবার সেকশাঁল কেঁল?

হরেন হাসিয়া বলিল, থ্যাঙ্ক ইউ, খুড়ি—ধন্যবাদ।

শিবু বলিল, সে সময় আমায় একটু মনে করিয়ে দিও হরেন, স্বরাজের খুশিতে যদি নেহাত ভুলে যাই। আমি একটু অ্যামেণ্ড্‌মেণ্ট জুড়ে দোব, আর শ্যাওড়াফুলি থেকে ইঞ্জিন কয়লা নামিয়ে শুধু গাঁজার আগুনে চলবে।

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরেনও যোগ দিল।

ভজহরি বলিল, শুধু তাই কেঁল? কাশী বৈদ্যলাঁথই বা ‥দ যায় কেঁল? আমি তো বলি, এ সব ব্রাঁল্‌চেই গাড়ি ঢোকবার আগে অঁল্য জাতের ড্রাইভার বদল ক'রে গেরুয়া রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাল্‌ডা ড্রাইভার ভর্তি ক'রে দেওয়া হবে। হাসি চলিল।

নিতান্ত ঘরের দেবতা ভোলানাথ, এমন ঠাট্টা অবাধেই চলে। শীঘ্র চটেন না, চটিলেও আশুতোষ, তা ছাড়া যত কিছু অশিব গরল কণ্ঠে লইয়া ভক্তদেরও একটু হাত-পা ছড়াইয়া দুই কথা বলিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন—কাঁহাতক শুধু হাতজোড় করিয়াই থাকে সব তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মাঝে? তাস পড়িয়া রহিল। মাহাত্ম্য-বর্ণনায় স্বপ্ন-কাহিনীতে ঠাট্টায় তর্কবিতর্কে কয়েকটা স্টেশন কাটিয়া গেল। তারকেশ্বরের গাড়ির এটা একটা বিশেষত্ব।

ওরই মধ্যে কখন সুবিধা পাইয়া শিবের আসরে রাজনীতি আসিয়া পড়িল—হইতে পারে, ব্যাপারটা আজকাল নিতান্ত নন্দীভৃঙ্গীর খাস দখলে রহিয়াছে বলিয়াই। হিন্দুসভা, লীগ, ত্রিপুরী, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, সোদপুর, বৃন্দাবন, সব আসিয়া জুটিল। গাড়িটা যখন কৈকালায় আসিয়া দাঁড়াইল, ততক্ষণে ব্যাপারটা তাণ্ডবের এতটা কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, অহিংস আস্তিন-গোটানো পর্যন্ত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল এবং 'আরে দাদা যে! ও দাদা! এদিকে এদিকে—এ অদিনে? কি সৌভাগ্য!' ইত্যাকার একটা তুমুল হর্ষ-কলরব উত্থিত হইল; শুধু আমাদের গাড়ি হইতে নয়, প্রায় সব গাড়ি হইতেই। একটি লোক বিহ্বল হাস্যের সঙ্গে প্ল্যাট্‌ফর্মে একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া অনিশ্চিতভাবে ছুটাছুটি করিতেছিল, 'আরে সে কি হয়?' বলিয়া আমাদের কামরা থেকে একটি যুবক নামিয়া গেল এবং তাহাকে দখল করিয়া কামরায় আনিয়া তুলিল। বিজয়ের আনন্দের একটা নারকীয় শব্দ উঠিল। গাড়ি তখন অল্প অল্প চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লোকটি মাঝবয়সী। শরীরের অভ্যন্তরে চর্বির এবং বাহিরে তৈলের অভাবে চেহারাটা রুক্ষ। মাথায় অবিন্যস্ত বড় বড় চুল, গলায়

মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে লালপেড়ে গেরুয়া কাপড় এবং অনুরূপ একটি উড়ানি। শরীরটা বাহ্যত রুক্ষ হইলেও মুখের ভাবটা প্রসন্ন, কৌতুকদীপ্ত।

সকলে ভাল করিয়া মাঝখানে জায়গা করিয়া দিল। ভজহরি নস্যির কৌটার ঢাকনাটা খুলিয়া সামনে ধরিয়া বলিল, নস্যি ইচ্ছে করুন দাদা। একজন পানের ডিবা হইতে ভিজা নেকড়া জড়ানো পান দিল; একজন একটা বিড়ি হাতে দিয়া খচ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আসুন দাদা। খাতিরের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

তাহার পর প্রশ্ন হইল, এমন অবারে চলেছ যে দাদা, ব্যাপার কি? তোমার তো শুধু মঙ্গলবারটি বাঁধা সমস্ত হপ্তাটির মধ্যে বাবা!

দাদা পানটা মুখে দিয়া এক খামচা জরদা চালান করিয়া দিল, তাহার পর একটা দীর্ঘ টানে বিড়িটার অর্ধেকটা দগ্ধ করিয়া স্মিত হাস্যের সহিত বলিল, বাবা টানলে অবারে, কি করব?

তাহার পর গলা উঁচু করিয়া একবার সমস্ত গাড়িটা দেখিয়া লইয়া বলিল, কোন মেড়ো ভক্ত-টক্ত যাচ্ছে না? তোমাদের এ বিড়ি কতক্ষণ টানব খুচখুচ ক'রে বাবা, মজুরি পোষায় না?—বলিয়া আর একটা টানে বিড়িটা নিঃশেষ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। পাঁচ-ছয়টা বিড়ি আবার পাশে আসিয়া জড়ো হইল, একটা দেশলাইও।

দাদা একটা তুলিয়া লইয়া অগ্নি-সংযোগ করিতে করিতে বলিল, ভক্তেরা আর আসবে কোথা থেকে? বাবার লাইনে পাপ ঢুকেছে। আর নির্ভয়ে সে রকম ক'রে কি কেউ যাওয়া-আসা করতে পারে? সেদিন নাথুনীমলের সঙ্গে, প্রায় মাস তিনেক পরে, হঠাৎ দেখা। কি শেঠজী? দেখাই যে আর পাওয়া যায় না তোমার বাবা? লোকটা খাঁটি ছিল, দু-একদিন অন্তর একবার ক'রে আসতই বাবার দর্শনে, সঙ্গে

একটি ক'রে কাপড়ের গাঁটরি থাকত। ওই লিলুয়া কি বালি পর্যন্ত একটা টিকিট করত, এদিকটা বাবাই চালিয়ে দিতেন। সব চেনা হয়ে গিয়েছিল, কালেভদ্রে কখনও এক-আধটা অচেনা ক্রু-ট্রু উঠল, সিকিটা দোয়ানিটা ধরিয়ে দিলে হাতে—বাস্। বাবার দৌলতে হপ্তা গেলে গাঁটরিগুলো বেচে কিছু আসত হাতে বেচারীর। আমায় কৈকালায় দেখলেই তুলে নেওয়া চাই, নিজের হাতে এক ছিলিম সেজে আগে বাড়িয়ে দেওয়া—গোঁসাইজী, পরসাদি করিয়ে দাও, যেমন ভক্তি সাধু-সন্ন্যাসীতে, তেমনই মিষ্টি কথাগুলি। আর সে একটি ছিলিম যা সাজত, একেবারে মেওয়া জিনিস! হঠাৎ তিন মাস পরে দেখা। আবে, কি শেঠজী, কোথায় ডুব দিয়েছিলে? মেরজাইয়ের পকেট থেকে একখানি টিকিট বের ক'রে তুলে ধরলে। বলে, বাবাকা লাইনমে আর সে ইজ্জৎ নেই গোঁসাইজী। নূতন ক্রু, নূতন টিকিস্‌কলেক্টার, দু-তিনবার দণ্ড দিলুম, তারপর আর কত ঘাটি সইব? বাবা ভাববে, বেটা খালি নিজের মতলবে আসত, তাই তিন মাস পরে এই টিকিট কাটিয়ে চলেছি, পুরনো গাঁহকরাও সব রয়েছে, একবার বাজার-ভাওটাও দেখে আসব। অনেক দুঃখু করতে লাগল বেচারী।

দাদা ধীরে ধীরে বিড়ি টানিতে লাগিল। চারিদিক হইতে কতকগুলা সহানুভূতিসূচক মন্তব্য হইতে লাগিল। দেখ তো সাহস! ভক্তের টিকিট চাওয়া! এ রেল এবারে যাবে দাদা, দেখছ তো কলিশনের ঘটা! আর ওই রকম বনেদী একটা ভক্ত, কতদিন থেকে সে ওই ক'রে বাবার সেবা ক'রে আসছে—

একজন দাদাকে উত্তেজিত করিবার জন্য মন্তব্যকারীদের প্রশ্ন করিল, কেন চাইবে না টিকিট চাঁদ? তুমিই বাবার দোহাই দিয়ে নিজেকে তো পার করছই, গাঁটরিকে গাঁটরি পর্যন্ত—

দাদা উগ্র দৃষ্টিতে যুবকটির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কেন করবে না পার মশাই ? কেন টিকিট নেবে ? কার রাজ্য এটা ? কাশী বদ্যিনাথ তারকেশ্বর, বাবার ত্রিশূলের ওপর এসব জায়গার পত্তন, তা জানা আছে ? এক জোড়া রেল-লাইন পেতে দিয়েই আপনার দখলে এসে গেল, না ? রাইট জমিয়ে রাখলেন, দরকার হ'লে দখল সাব্যস্ত ক'রে বাবার নামে একটা নম্বরী ঠুকে দেবেন, না ? একবার জটা নাড়লে রাইট দেখিয়ে ছাড়বে বুড়ো। দেখলেন তো বেহারের দশাটা কি ক'রে ছেড়েছিল ! দুটি মিনিটের ওয়াস্তা—একবার শুধু কপালের চোখটা একটু খোলা, কোথায় থাকবে আপনার হাইকোর্ট আর কোথায় থাকবে জজসাহেব, আর কোথায় থাকবে—

গাড়ি বাহিরখণ্ড স্টেশন ছাড়াইয়া আসিয়াছে। দাদা বিড়িটা ফেলিয়া দিতে হবেন সিগারেটের ডিবা বাহির করিয়া একটা সিগারেট দাদার দিকে বাড়াইয়া বলিল, এইবার একটা কাঁচি চলুক দাদা। এদিকে তোমার সঙ্গে ব্যবহার কি রকম করছে বেটারা ?

দাদা সিগারেটটা হাতে লইয়া বলিল, চামারের মত, একেবারে চামারের মত। কিন্তু আমি মেড়ো নই, দেখিয়ে দোব বাছাধনকে। হপ্তায় একটিবার ক'রে আসা আমার বাবার কাছে, তোমরা তো জানই—মঙ্গলবার এক ট্রেনে আসা, বাবার দর্শন সেরে, কেনা-কাটা ক'রে ফিরে যাওয়া। গাঁয়ে দোকান নেই, তা ভিন্ন তারকেশ্বরে জিনিসটা রাখে ভাল, একেবারে বাবার নজরের নীচে, বাবার পেয়ারের জিনিসটি নিয়ে বেইমানি করতে ততটা সাহস করে না। তাই ওই হপ্তায় একটিবার ক'রে এসে সমস্ত হপ্তার রসদটুকু যোগাড় ক'রে নিয়ে যাওয়া। আর কি সম্বন্ধ তোদের লাইনের সঙ্গে বাপু, মর্‌গে যা না তোরা। আজ তেরো বছর থেকে এই ক'রে আসছি, রুটিন বাঁধা। কেউ কখনও টুকতে সাহস

করে নি, আর ও বেটা বেল্লিক আমায় আটকে সেই শ্যাওড়াফুলি থেকে মাশুল গুনে নিলে! নতুন এসেছে, আমায় চেনে না, কিন্তু আজ এমন চেনান চেনাব যে, সাত পুরুষে ভুলতে পারবে না। হাতে এমন পয়সা রইল না যে, ছুটো দিনেরও রসদ নিয়ে ফিরি। পরশু এসেছিলাম, আবার এই আজ দৌড়ুতে হয়েছে। বোঝ।

ভজহরি বলিল, বেটা যত দিঁল থাকবে এখাঁলে, টিকিটে আপলার কতগুলি ক'রে পয়সা লোকসাঁল করাবে তো দাদা! ঘোর কলি এঁলে ফেললে—লিঁল, লশ্মি লিঁল।

টিপ তুলিয়া লইয়া দাদা নিরতিশয় তাচ্ছিল্যের সহিত একবার ভজহরির পানে চাহিয়া বলিল, রামঃ, নেহাত কায়দায় পেয়েছিল সেদিন, ঘায়েল হয়েছিলাম। আজ? চুপ ক'রে সব তামাশাটা দেখ না। নাও, তোমার দোক্তার কৌটোটা দাও দিকিন এগিয়ে একবার। পান আর আছে নাকি? আর একটু জরদাও দাও। আরে ছ্যাঃ, খালি সিগারেট আর বিড়ি! নাড়ী যেন ঝিমিয়ে আসছে। এতদিন বাবার লাইনে যাতায়াত ক'রে কি করলে গো তোমরা?

লোকনাথ অনেকক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। দাদা একবার গলা বাড়াইয়া দেখিল, তাহার পর কপালে এবং বুকে যুক্তকর ঠেকাইয়া দেবোদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল, ইষ্টিশান এসে গেল, নাও, কেউ একটা টিকিট বের কর দিকিন।

সবাই বিমূঢ়ভাবে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল একবার; মাইতি বলিল, আমাদের সব তো মান্থ্লি। তা ছাড়া তুমি পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে নাকি দাদা? যার টিকিট নেবে, নিজে সে কি করবে?

দাদা একটু বিমূঢ়ভাবে বলিল, সবার মান্থ্লি তোমাদের? তা হ'লে তো এ গাড়িতে ওঠা ভুল হয়েছে দেখছি!

ভজহরি বলিল, সবার মানে আমাদের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সবার। অন্য যাদের আছে, তারা দেবে কেন দাদা? প্রাণের টান তো নেই তোমার সঙ্গে আমাদের মত।

দাদা বিরক্তির সহিত বলিল, দেবে কেন! আরে, আমি কি খেয়ে ফেলব টিকিট, না, সবটাই চাইছি?

তবে?

আমার একরত্তি দরকার, শুদ্ধু কোণ থেকে একটু কেটে নোব, ও তোমার নম্বর তারিখ সব যেমনকার তেমনই থাকবে। বেমালুম একটু কেটে নোব, ছোট্ট কাঁচি পর্যন্ত এনেছি।

হরেন বলিল, একটা কোণ নিয়ে তুমি কি করবে দাদা, তুক-টুক আছে নাকি কিছু?

দাদা বলিল, আরে, খেলতে জানলে কানা-কড়ি নিয়েই খেলা যায়। তোমরা একটা দাও তো যোগাড় ক'রে, এসে পড়ল যে ইষ্টিশান।

দলটি চারিদিকে একবার চাহিল, প্যাসেঞ্জারদের কেহ মুখ ঘুরাইয়া লইল, কেহ স্পষ্টই টিকিট দিতে অসম্মতি জানাইল।

আমি এক কোণে বসিয়া তামাশা দেখিতেছিলাম, শিবু আমার পানে চাহিয়া বলিল, আপনার মান্থ্‌লি নয় বোধ হয়? আপত্তি আছে নাকি টিকিটটা দিতে একবার, অবশ্য ওই শর্তে—শুনলেন তো?

আমার কৌতূহলটা সত্যই প্রবল হইয়া উঠিতেছিলে, টিকিট বাহির করিয়া বাড়াইয়া দিলাম।

দাদা এক কোণ হইতে সামান্য একটু কাটিয়া লইয়া আমার টিকিট ফেরত দিল।

গাড়ি আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইতে দাদা নামিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মের মেঝেটা চারিটি আঙুল দিয়া স্পর্শ করিয়া আঙুল কয়টা জিবে ঠেকাইল, তাহার

পর সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া দূরে গেটের কাছে টিকিট-কালেক্টারের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া আপন মনেই বলিল, হুঁ!

কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে বেশ একটু ভিড় ছিল। চাপের মধ্যে টিকিট দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি, দেখি, দাদাও কখন বাহির হইয়া সব প্যাসেঞ্জারদের ছাড়াইয়া গিয়াছে। ডাক দিব, এমন সময় আওয়াজ হইল, ও মশাই! ও মশাই! টিকিট দিয়ে যান।

সবাই ফিরিয়া চাহিলাম, শুধু দাদা ছাড়া, সে হনহন করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

টিকিট-কালেক্টার আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই ওঁকে বলছি—বাবাজীকে। ও মশাই!

দাদা ফিরিয়া দাঁড়াইল, বুকের মাঝখানে তর্জনী ঠেকাইয়া বিস্মিত-ভাবে বলিল, আমায় ডাকছেন?

হ্যাঁ, টিকিট।

টিকিট! সে তো আমি দিয়ে এলাম মশাই এক্ষুনি, ও কি সর্বনেশে কথা!—বলিয়া দাদা আগাইয়া আসিল।

দিয়ে গেলেন? বটে! কোন রকমে গ'লে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বুঝি দিয়ে যাওয়া হ'ল? বড় কাঁচা ছেলে পেয়েছেন, না? ওসব গেরুয়া-টেরুয়ার খাতির নেই আমার কাছে। পরশুই না আপনি উইদাউট টিকিটে এসে গুনগার দিলেন, আমার কাছেই? আপনিই তো, এ চেহারা তো ভুল হবার জো নেই।

ভিড জমিয়া উঠিল। দাদা বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি গুনগার, তবে টিকিটও দিয়েছি, গুনগারও দিয়েছি, ভালমানুষের যুগ নেই তো আর—। শুনুন আপনারা, পরশু এমনই ক'রে আমায় ফিরিয়ে ডেকে এনে, টিকিটের কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে জংশন থেকে মাশুল আদায়

করছেন উনি। ওঁর কাণ্ডই ওই, খুব পাকা টিকিট-কালেক্টার কিনা; কিন্তু আমিও অত কাঁচা নই, তা ছাড়া কত দণ্ড সইব মশাই? গবিব সন্ন্যাসী মানুষ; পাঁচজনের কাছ থেকে মেঙে-চেঙে চালাই। এবার সাবধান হয়েছি। নিন, দয়া ক'রে বার করুন তো ০২৮৬ নম্বর টিকিটটা, আজকেব তারিখের, দেখুন তো পেয়েছেন কি না!

টিকিট-কালেক্টার প্রায় ভ্যাংচাইয়াই বলিল, আজ্ঞে, ও ভাঁওতা চলবে না, বের করুন পয়সা। একটা টিকিটের নম্বর জেনে নেওয়া যেন এতই শক্ত। টিকিটগুলা মুঠাব মধ্যে আরও গুছাইয়া লইয়া বলিল, সাত ঘাটের জল খেয়ে এসে এই তারকেশ্বরেই ঘায়েল হতে হবে দীনো সাণ্ডেলকে? বটে! টিকিটের নম্বর!

দাদা সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাবা দেখছেন তো? আচ্ছা, বেশ, আমি আরও প্রমাণ দিচ্ছি, আমার টিকিটের কোণটা কাটা, এবার ওইটে আমি চেহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম আমার টিকিটে। এই দেখুন, কাঁচিও রয়েছে সঙ্গে। বার বার কতই বা দণ্ড দোব মশাই, সন্ন্যাসী মানুষ, আব কতই বা অপমান সইব? আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক বয়েছেন, বের করতে বলুন ওঁকে, না কোণ-কাটা অত নম্বরের টিকিট থাকে, যা দণ্ড আপনারা বলেন, দোব।

টিকিট-কালেক্টারের মুখটা যেন একটু শুকাইল, সামলাইয়া লইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলিল, বের কর পয়সা, ওসব ধাপ্পাবাজি চলবে না। না বের কর তো হ্যাণ্ড্ওভার ক'রে দোব পুলিসে। গেরুয়া প'রে পকেটে কাঁচি নিয়ে এই সব ক'রে বেড়ানো হচ্ছে! কি আমার চোটের সন্ন্যাসী বে!

কয়েকজন ভদ্রলোক বলিল, উনি বলছেন যখন, দেখুন না টিকিটগুলো মশাই, ও নম্বরের, ওই ধরনের টিকিট আছে কি না!

বিশ্বাস করুক, না করুক, বেশ বোঝা গেল, সমস্ত দলটাকে একটা উগ্র কৌতূহলে পাইয়া বসিয়াছে।

দাদার এবার পালা. সিধা হইয়া আহত গর্বের স্বরে বলিল, উনি না বের করেন, এই আমি করছি, দেখুন।—বলিয়া সবার সামনে মুষ্টিটা প্রসারিত করিয়া ধরিল।—করতলের মাঝখানে সেই টিকিটের কোণটি।

সবার জেদের চাপে টিকিট-কালেক্টারকে টিকিটগুলা জমিতে বিছাইতে হইল। দাদা "এই আমার টিকিট" বলিয়া একখানি ছোঁ মারিয়া লইল এবং সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে কাটা টিকিটটা একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে জোড়া দিয়া বলিল, এই দেখুন আপনারা। দেখুন সব। সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর একবার অত্যাচারটি দেখুন, বাবার নাকের নীচে!

তাহার পর শুধু নির্বাক রহিল সেই টিকিট-কালেক্টার—মূঢ়, বিস্মিত, অপ্রতিভ। আর কাহারও মুখ বন্ধ রহিল না, দাদার তো নহেই, ধিক্কারে, ব্যঙ্গে, হুমকিতে, টিটকারিতে জায়গাটা একটুর মধ্যেই মুখর হইয়া উঠিল।

হাঁ, টিকিট-কালেক্টারের মত আরও একজন নিবাক ছিল, সে এই কাহিনীর লেখক। থাকা উচিত ছিল না, বুঝি; কিন্তু কেন যে ছিলাম, এখনও পর্যন্ত ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিস্ময়ে? না, ভয়ে? তখন কি এই মনে হইয়াছিল যে, যদি বলিই আসল কথাটা তো দাদার গুণগ্রাহীরা আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়া আমাকেও ওই টিকিট-কালেক্টরের দশায় ফেলিবে? তাও হইতে পারে, অথবা সে সময় বোধ হয় শঙ্কা হইল, আমার সম্বন্ধেও লোকটা পেটে পেটে কি আঁচিয়া রাখিয়াছে, কে জানে! ভয়ঙ্কর পাকা খেলোয়াড়। অথবা—আন্দাজ এখন অনেক কিছুই করিতেছি, কিন্তু তখনকার মনের অবস্থাটা ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। মোটের উপর, টিকিটের রহস্য আর উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, এবং আমার চোখের উপর দিয়াই দাদা পুরু দলের মধ্যে জেল-ফেরত সত্যাগ্রহীর মত গুটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

# আশা

ভবানীপুরে, যেখানে বেগমত্ত বিক্ষুব্ধ কলিকাতা নিজেকে ভুলে একটু নিরিবিলিতে অলসতার আমেজে গা ঢেলে প'ড়ে আছে। এখানে তার কাজ নেই মোটেই। আর চিন্তা? হ্যাঁ, তা একটু আছে বটে; তবে তার সমস্তটাই অকাজের। সে যেন বিশ্বকর্মার কারখানার পলাতক মজুর, এখানে তার গোপন সখী প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যত সব অ-দরকারের আলোচনায় লেগে গেছে।

রোগের পর আরোগ্যের অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শে এখানে এসে একটি বাড়ি ভাড়া ক'রে আছি। ডাক্তার-বন্ধু বললেন, ভবানীপুরেই চল; সেখানে আলো-বাতাস সহজেই পাবে, যা তোমার এখন দরকার। ওখানে আকাশের নীল আর পৃথিবীর সবুজের মধ্যে রঙ-করা ছোট ছোট বাড়িগুলো প্রকৃতির আলো-বাতাসের স্পর্শ বেশ অযাচিতভাবেই পায়, নতুন শিশু যেমন মায়ের সোহাগটা পায় আর কি। তোমার কলকাতার মত নয়, এখানে ধেড়ে ধেড়ে উৎকট বাড়িগুলো পাকা বিষয়ী ছেলেদের মত সেই আলো-বাতাস নিয়ে কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি লাগিয়ে দিয়েছে। ওরা ও দুটোকে সম্পত্তি ব'লে টের পেয়েছে কি না, আর রক্ষে আছে!

বাড়ি নিয়েছি শ্রীনিবাস রোডে। ঠিক রোড নয়, তবে গলিও নয় একেবারে। লাল সুরকির রাস্তা নিজের ইচ্ছামত এঁকেবেঁকে গেছে, জিওমেট্রির কোনও কড়া আইনের গোলাম নয়। ফুটপাথ আছে কি না-আছে, অর্থাৎ পথিকদের মধ্যে গতির উগ্রতা কি লঘুতা নিয়ে যে বিরোধ এবং তার চুক্তি, এখানে তার কোন নিশানা নেই। মোটরেই হোক, গাড়িতেই হোক, কিংবা পায়ে হেঁটেই হোক, সবাই নিরুদ্বেগ গতিতে

নিজের নিজের কাজে-অকাজে ওই লাল রাস্তাটুকু দিয়েই যাতায়াত করে। ফুটপাথ যেখানে একটু আছে বা, ঘাসে ভরা, যেন অবসরের তৃপ্তি।

বিশ্বকর্মার কারখানার পেয়াদা তার লোক-লস্কর নিয়ে পলাতক মজুরের সন্ধানে ভবানীপুরে প্রবেশ করেছে বটে রসা রোড দিয়ে ; কিন্তু এদিকটা খুব তফাতে আছে, তার তাগিদের কর্কশ হুঙ্কার এখানে মোটেই পৌঁছয় না।

বাড়িটা দোতলা। ওপরে ছোট-বড দুটি ঘর, ডাক্তারে আমাতে পাশাপাশি থাকি। দিনটা প্রায় একলাই কাটে, ডাক্তার যান 'কলে'। একদিন বললেন, তুমি সমস্ত দিন বড় নিঃসঙ্গ থাক, হাতের কেসগুলো চুকে গেলে আর নিচ্ছি না।

বললাম, না, এই চলতি পসারের সময় ছেলেমানষি নয়। আমি খাসা আছি। এই ছোট্ট পল্লীটিতে অল্পস্বল্প যা কিছুই পাচ্ছি, সেটুকুর মধ্যেই বেশ একটু পরিপূর্ণতা আছে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

দুপুরে যখন চারিদিকে চুপচাপ, আমি দিব্যি গা এলিয়ে প'ড়ে থাকি। স্তব্ধ প্রকৃতি তার অপলক দৃষ্টি আমার নিশ্চেষ্ট চোখ দুটির ওপর ফেলে রাখে, ভাবেব ব্যাকুলতায় সে যে কি গভীর ! কোন মূক নারীকে একঠায় আবিষ্ট হয়ে ব'সে থাকতে দেখেছ কখনও ? তা হ'লে অনেকটা বুঝতে পারবে।

দুপুর যায়। বিকেলে পল্লীটাতে যখন একটু সজীবতা ফিরে আসে, আমার মনটা পশ্চিম দিকের প'ড়ো জমিটার ওধারে ওই বাড়িটায় গিয়ে গুটিয়ে বসে। ওটি যেন ভবানীপুরের মধ্যেও ভবানীপুর। এসে পর্যন্ত ওব একটা স্বর শুনেছ ? দোর-জানলা বন্ধ ক'রে নিজের স্নিগ্ধতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। আমি ওটির ভক্ত হয়ে পড়েছি।

বন্ধু হেসে বললেন, ভক্তি তোমার উড়ে যায়, যদি বাড়িটার সম্বন্ধে আমাদের মালীর মতামতটা শোন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম?

মালীর মতে ওটা এই পাঁচ-ছ বছর থেকে 'তানাদের নীলেভূমি' হয়ে রয়েছে। সহজ মানুষ ওখানে আমল পায় না। তানাদের মানে, তোমাদের শুদ্ধ ভাষায় যাদের বল অশরীরী আত্মা তাঁদের, গঞ্জিকার ধূমে যাদের জন্ম আর কি। তারপর? দুপুর হ'ল, বিকেল হ'ল—

অন্যমনস্কভাবে বললাম, হানাবাড়ি? যাক, সন্ধ্যের একটু পরে দুটি স্বরের লহরী ওঠে—দূরের ওই বাড়িটাতে একটি মেয়ে গান করে, আর দক্ষিণের ওই হলদে বাড়িটাতে কে ক্ল্যারিওনেট শেখে। তুমি হাসলে বটে, কিন্তু এই নিস্তব্ধতার পটভূমিতে সেই সুরের ছন্দ আর বেসুরের তাণ্ডব মিলে যে কি একটা মায়া রচনা করে, তা যদি তোমায় বোঝাতে পারতাম—

বন্ধু ভীতির অভিনয় ক'রে বললেন, একটা জিনিস বুঝেছি, সেটা এই যে, তোমায় একলা ফেলে রাখা আর মোটেই নিরাপদ হচ্ছে না। তোমার কবিতার খাতাটা সঙ্গে আন নি তো?

বললাম, আনলে 'বিষ' ব'লে একটা লেবেল সেঁটে দিতে, এই তো? কথাটা ব'লে কিন্তু আমাদের এ দেশটার প্রতি বড় অবিচার করলে ডাক্তার। আমার তো মনে হয়, এ দেশের বর্ণ, স্বর,, আলো, বাতাস—এসবের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যাতে কবি না হয়েই পারা যায় না। অত কথা কি, এ দেশের চিকিৎসকেরাও হতেন কবি; শুধু কবি নন—কবিরাজ। তার মানে, তাঁদের শিক্ষা এই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের একটা নিগূঢ় যোগ ঘটিয়ে দিত। মানুষের প্রাণশক্তিকে সমৃদ্ধ করবার তাঁদের যে প্রচেষ্টা, তা তাঁদের প্রকৃতির মহাপ্রাণের সঙ্গে পরিচিত ক'রে

দিত, যে মহাপ্রাণের বিকাশ দেখি, স্বরে, স্তব্ধতায় ; আলোয়, আঁধারে ; আর জীবে উদ্ভিদে তো বটেই। তাঁরা হতেন ধ্যানী, না হয়ে উপায় ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধটা ছিল মৈত্রীর। আর তোমাদের শিক্ষাদীক্ষার কাণ্ডকারখানা সব উল্টো। প্রকৃতির প্রতি তোমাদের ভাবটা সশ্রদ্ধ নয় ; ছুরি, কাঁচি, ফর্ক, কাঁটা প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে—

বন্ধু হেসে হাতজোড় ক'রে বললেন, হয়েছে, এবার শরসংহার কর।

হেসে চুপ করলাম। একটু ভাবের ঘোরে প'ড়ে গিয়েছিলাম বটে, তার কারণ এ জায়গাটা আমার লাগছে বড়ই সুন্দর। শুধু কি এ জায়গাটাই ? নিজের কাছে নিজেকেও আজকাল বড় মনোরম ব'লে বোধ হয়। মনে হয়, আমার নবীভূত প্রাণ যেন ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হয়ে সহস্র বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরেছে, আমার প্রতি অণু-পরমাণুতে তার উষ্ণ আলিঙ্গন অনুভব করি।

এক এক সময় মনে হয়, হঠাৎ যেন একটা কূলভাঙা ঢেউ উঠল। আমার প্রাণ তো আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ওই ছুটল ও,— সমস্ত জগৎটাকে স্রোতের ছাটে নাইয়ে ছুটল, ওই আলোর মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কি এক নূতন বর্ণের সুষমা সৃষ্টি করতে করতে ছুটল, জগতের স্বর-লহরীর মধ্যে কি এক নূতন সুর ঢেলে দিলে ! এত বিচিত্র সৌরভের উৎসই বা ওর মধ্যে কোথায় লুকনো ছিল ?

মাধুর্য আরও উগ্র হয়ে পড়ে। কি উন্মত্ত ! আমার মধ্যে হঠাৎ এ কি উত্তাপ সৃষ্টি করলে ! তারপর, এ কি, সমস্ত পৃথিবীর, ওরই দেওয়া এই নূতন বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের ওপরে আমার সমস্ত সত্তাকে দ্রবীভূত ক'রে ঢেলে দিলে যে ! সুন্দরের অঙ্গে এ কি অভিনব প্রলেপ দিয়ে দিলে !

আমার রুগ্ন দেহের অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ এই প্রাণ উষার মত

রূপসৃষ্টির অফুরন্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে, মনে হচ্ছে, যেন তাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে একটা বিরাট সমারোহ প'ড়ে গেছে চারদিকে।

এই ভাবে সৌন্দর্যের সঙ্গমস্রোত ব'য়ে চলে, স্নান ক'রে ধরণী অপরূপ হয়ে ওঠে।

কোন কিছুকেই আর তুচ্ছ ব'লে মনে হয় না, হীরকখণ্ডের মত এই পৃথিবীর প্রতি রেখা অণুরেখা হতে যেন আলোর দীপ্তি ঠিকরে পডতে থাকে।

শুধু বাইরেই নয়, যখন ঘুমোই, দেখি—এ সৌন্দর্যের আভাস আমার সুপ্তি ভেদ ক'রে স্বপ্নের স্তর পর্যন্ত পৌছে গেছে ; কিরণ যেমন জলের ওপরটা উদ্ভাসিত ক'রে তার নিম্নতল পর্যন্ত পৌছে যায়।

কয়েক দিন পরের কথা।

সেদিন দুপুরের সৌন্দর্য-পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে যখন ঘুমিয়ে পডলাম, আমার স্বপ্নলোকে সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব মিলন বাসর জেগে উঠল—রূপে, আলোয়, সঙ্গীতে অনির্বচনীয় হয়ে। সে এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার! ঘুমটা ভেঙে গিয়ে মন যেন বেদনায় আতুর হয়ে উঠল। আমার এ মনে হ'ল না যে, কল্পলোক থেকে বাস্তব-জীবনে ফিরে এলাম ; মনে হ'ল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিবদ্ধ, রসঘন, এই বাস্তবের চেয়ে অতি-বাস্তব একটা জীবন থেকে বিদায় নিয়ে এলাম, আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে এখনও তার আলোর আভা লেগে রয়েছে, তার হাসি আর গানের তরঙ্গ আমার অন্তর্চেতনায় দুলে দুলে উঠছে।

এই ঘোরটা বেশিক্ষণ এ রকম নিবিড় রইল না। সমৃদ্ধ পৃথিবী আবার তার স্পর্শ দিয়ে আমায় সচেতন ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল—তার প্রাণের উত্তাপের উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে। জানলার চৌকো ফ্রেমে বাঁধানো একটা পটভূমি—ওটুকুর মধ্যেই জীবনে কি বিচিত্র স্রোত

চলেছে চলচ্চিত্রের খেলার মত। জানলার গায়ে ঝুমকো জবার গোটা-কতক ডাল এসে পড়েছে, দুটো ফুল ঝুলে পড়েছে; ছোট একটা কি পাখি—মিস-কালো, লম্বা চঞ্চু, দুটো তীক্ষ্ণ আওয়াজ ক'রে এসে বসল—ডালে নয়, পাতায় নয়, জবার একটি বাঁকা পাপড়ির ওপর একেবারে। মাঝে মাঝে সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ—আনন্দের নি-খাদ স্বর; একটু ঘাড় নড়ে, সমস্ত জবাটি দুলে ওঠে। দূরে রৌদ্রের দীপ্তিমাখা নীল আকাশ; সাদা বিচ্ছিন্ন মেঘের ছোট-বড় টুকরো সব ভেসে চলেছে। কোনটার কোলে—শ্বেত অঙ্গে তিলের দাগের মত মন্থর-গতি একটা চিল। পৃথিবীর কাছাকাছি গতিটা চঞ্চল,—গাছের শাখা-পত্রের দোলা, পাখিদের প্রজাপতিদের ব্যস্তভাবে উড়ে বেড়ানো—

সবচেয়ে চঞ্চলতা পড়েছে আমার জানলার ওপর। পাখিটা বুঝি মধুর সন্ধান পেয়েছ, ফুলেতে আর ওতে বেজায় লুকোচুরি কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেছে।

জায়গাটা নিজের কুহক ছাড়িয়ে আমার স্বপ্নের বেদনাটা মুছিয়ে দিতে চায়। তবু কোথায় যেন একটু অভাব,—বেদনার রেশ আর মিটতে চায় না। এখনও মনে হয়, সত্যই কি স্বপ্ন ছিল ওটা?

ঘুমের জড়িমাটা চোখে লেগে রয়েছে, তাতে চেতন জগতের স্পন্দনের ওপরেও স্বপ্নের কুহেলিকা বিস্তার করেছে; আশা হচ্ছে, এখনই এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে স্বপ্ন আর বাস্তব জগতের অন্তরায়টা মিলিয়ে গিয়ে সব একাকার হয়ে উঠবে। মন যেন সে মুহূর্তটার জন্যে মাঝে মাঝে উদগ্র হয়ে উঠছে।

এমন সময় দৈবাৎ আমাদের বাসার পশ্চিম দিকের জনশূন্য বাড়িটার পানে নজর গেল, এবং একটু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, তার ওপরের জানলা দুটো খোলা। আজ দেড় মাসের মধ্যে এই প্রথম।

মনে মনে বললাম, যাক, লোক শেষ পর্যন্ত এল তা হ'লে।

এ সিদ্ধান্তে একটু বাধা পড়ল, কাশির আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে দেখলাম, ও-বাড়ির বৃদ্ধ মালী ফটকে তালা লাগিয়ে বাইরে যাচ্ছে। ভাবলাম, বাঃ, এ তো মন্দ হ'ল না!

হঠাৎ বন্ধুর কথাটা মনে প'ড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে এ প্রহেলিকার মধ্যে যেন একটা অর্থ ফুটে উঠল,—একটা আশা। যেন একটা গূঢ় সঙ্কেতে উঠে গিয়ে আমার ঘরের পশ্চিমমুখো জানলার কাছে দাঁড়ালাম। তারপর যা দেখলাম, তাতে সমস্ত শরীরটা যুগপৎ বিস্ময় আর পুলকে কণ্টকিত হয়ে উঠল।

জানলার পথে ঘরে আলো প্রবেশ করেছে। মাঝখানে একটি শুভ্র শয্যা; তার ওপর কে একজন গা ঢেলে শুয়ে আছে। রঙিন শাড়ির নিম্নপ্রান্তের খানিকটা দেখা যায়, তার পাড়ের বেষ্টনীর নীচে দুখানি অলক্তকমাখা চরণ—দুটি আধফোটা রক্তপ্রান্ত পদ্ম-কোরকের মত গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে।

সুপ্ত কার দুখানি অচঞ্চল চরণ, আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু এই আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে নিমিষে অভিভূত ক'রে দিলে। আমার যদি তখন মনে হয়ে থাকে যে, আমার ধ্যানের দেবী—আমার স্বপ্নের মায়াপুরিকা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে নেমে এসেছে—শুধু আমারই সোনার কাঠির স্পর্শ টুকুর অপেক্ষা, তো তাতে কিছু আশ্চর্য হবার নেই। আর কোন সময়ে এবং অন্য কোন বাড়িতে এ সামান্য দৃশ্যটুকুর মধ্যে কিছু নূতনত্ব পাওয়া যেত না; কিন্তু ভবানীপুরে, সেই নিঝুম দুপুরে, সেই পরিপাটী, সুবিন্যস্ত অথচ বিসদৃশভাবে জনহীন বাড়ির শুধু একটিমাত্র ঘরে একটি নিদ্রিত নারীর সেরূপ হঠাৎ আবির্ভাব, এতে আর অন্য

রকম ধারণার অবসরই ছিল না—বিশেষ ক'রে আমার রোগমুক্ত মনের সে সময়ের অবস্থায়।

মাথার মধ্যে বন্ধুর ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথাটাও ঘনিয়ে ঘনিয়ে উঠছিল, —মালীর মতে ওটা 'তানাদের নীলেভূমি', যাদের বল—অশরীরী আত্মা, তাঁদের।

সকলের ওপরে ছিল বোধ হয় ও-বাড়ির মালীর ওরকম নির্লিপ্তভাবে ফটক বন্ধ ক'রে চ'লে যাওয়া; যাতে ক'রে মনে হ'ল, তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই বাড়িটার মধ্যে একটা কাণ্ড ঘ'টে চলেছে। প্রদীপের যাদুবলে রাজকন্যার শয্যা যে সুরক্ষিত রাজপুরীর মধ্যে থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র দাখিল হ'ত, এ ঘটনাটি যেন ঠিক তারই সগোত্র।

নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলাম। ক্রমে আমার সমস্ত শরীর মন যেন একটিমাত্র সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়ে উঠল। রাস্তা দিয়ে তীক্ষ্ণ হর্ন দিয়ে একটা মোটরগাড়ি চ'লে গেল। পাশের বাড়ির ঝি খুব আড়ম্বরের সঙ্গে বাসন মাজতে শুরু ক'রে দিয়েছে। পরিচিত সেই শিক্ষানবিসের ক্ল্যারিওনেটের কল্লোল উঠল আজ অসময়েই। ভবানীপুর আমায় এই যুগ এবং এই পৃথিবীর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে অশেষ চেষ্টা করতে লাগল। কানে যাচ্ছিল সব, কিন্তু ওই দুখানি ক্ষুদ্র চরণ যুগাতীত লোকাতীত কি এক মোহ বিস্তার ক'রে আমায় অমোঘ আকর্ষণে সব থেকে টেনে নিতে লাগল!

কোথায় গিয়ে দাঁড়ালে আমার ছায়াময়ী মোহিনীকে সমগ্রভাবে দেখা যায়, নির্ণয় করবার জন্যে চটিজুতোটা পায়ে দিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় বন্ধুবর এসে উপস্থিত। হাতে একটা স্টেট্‌স্‌ম্যান, বললেন, ওহে, ওদিকে আফগানিস্তানের খবর যে গুরুতর হয়ে উঠল; বাচ্চা-ই-সাকাও— ও কি! আজ তোমার স্তব্ধপুরীর জানলা খোলা যে! যাক, বাঁচা

গেল ; তবে লোক এসেছে। কি জান ? লোক নেই, জন নেই, অথচ সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে রয়েছে, এ রকম বাড়ি যত সব কুসংস্কারের জন্মদাতা। আমি ওই নিয়ে আজকাল একটু মাথা ঘামাচ্ছি কিনা! সেদিন বললাম না তোমায় মালীর কথাটা ?

বন্ধুর সেদিন অবসর ছিল, বিকাল পর্যন্ত নানারকম গল্প চলল। দিন বুঝেই কি অবসর হতে হয় ?

কয়েকদিন একলা আছি। ডাক্তার দূর মফস্বলে একটা 'কলে' গেছেন।

একলা আছি শরীরে, মনটা একটা অপূর্ব রাজ্যে বিচরণ করছে। সে রাজ্যের সৃষ্টিকেন্দ্র দুখানি চরণ, কিন্তু সেই অল্পকেই আশ্রয় ক'রে কত হাসি-কান্না ভাঙা-গড়ার লীলা দিনরাত ব'য়ে চলেছে!

রজনী আমার কোন্ এক বিচিত্র প্রবাস-বিলাসে কাটে। ভোরে জাগরণের সঙ্গে যখন ফিরে আসি, দেখি, জানলা-দুয়ার সব বন্ধ,—এই রহস্যপুরীতে প্রবেশের আবেদন নিয়ে দিনের আলো বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি ব্যাকুল উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে থাকি, আশা হয়, এই এখনই জানলা মুক্ত হবে ; দুখানি ভুজবল্লরী জানলার পল্লব দুটিকে মুক্ত করতে করতে আলিঙ্গনের আকারে প্রসারিত হয়ে পড়বে, আর বাইরে অপেক্ষ-মান পৃথিবীর আলো, বাতাস, আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ অঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—যে বর-অঙ্গের আভাস দুখানি রাতুল চরণে পাওয়া গেছে।

জানলা কিন্তু মুক্ত হয় না। বাড়িও থাকে নিস্তব্ধ, নির্জন, এক সেই বৃদ্ধ মালী ছাড়া। ঘনপল্লবিত বৃক্ষলতার মধ্যে মাঝে মাঝে তাকে এখানে সেখানে দেখা যায়—শীর্ণ, পলিত-কেশ—মনে হয়, যেন হাওয়ার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

· দুপুরে উঠে দেখি, পরিচিত জানলাটি খুলে গেছে, শুভ্র দেওয়াল থেকে ঠিকরে পালঙ্কের পাশতলায় এক ঝলক আলো পড়েছে, আর অনবদ্য সেই দুখানি চরণ—

অসহ্য হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারছি, রহস্যের গুরু ভারটা আমার সুখের মধ্যেও ক্লান্তি এনে দিয়েছে। এক এক সময় মনটা বন্ধুর জন্যে বড় অধীর হয়ে পড়ে,—সে এসে তার হাসিঠাট্টা দিয়ে, তার কল্পনাবিমুখ সুস্থ মনের স্পর্শ দিয়ে আমায় তাদের স্থূল সুনির্দিষ্ট জগতে ফিরিয়ে নিক। আমি কল্পনার ঢেউয়ের দোলায় পরিশ্রান্ত হয়েছি, কঠিন মাটির স্পর্শ চাই।

মনে প'ড়ে গেল, আমাদের মালী তো আসল কথাটা জানে। তাকে ডাক দিলাম।

ডেকেই কিন্তু মনে হ'ল, নাঃ, পরের বাড়ি নিয়ে আলোচনা করাটা, বিশেষ ক'রে চাকরের সঙ্গে, আরও বিশেষ ক'রে আমাদের বয়সের সঙ্গে যখন একটা রহস্য জড়িত রয়েছে—

মালী এলে বললাম, হ্যাঁ, ওর নাম কি, ডাক্তারবাবু কবে আসবে ব'লে গেছেন ?

মালী আমার দিকে স্থিরনেত্রে ক্ষণকাল চেয়ে বললে, সেদিনকে আমি তো ছেলাম না বাবু, ঠাকুর জানে, তাকে ডেকে দি গা ? আর, আপনাকে ব'লে যান নি বাবু ?

বুঝলাম, প্রশ্নটা বেখাপ্পা হয়ে গেছে, বললাম, বলেছিল আমায়, তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে কেন বুঝছি না। দে তো ঠাকুরকে একবার ডেকে।

মালী হঠাৎ পশ্চিমের জানলাটার দিকে একটু চেয়ে বললে, ওটা ভেজায়ে দি বাবু, রোদ আসবার লাগছে, জষ্টির কড়া রোদ আপনার লেগে মোটেই ভাল নয়।

পরের দিন বন্ধু এলেন—দুপুরবেলা, আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম। জাগিয়ে,—এ কথা সে কথার পর বললেন, হ্যাঁ, তোমার নামে এসেই যে এক গুরুতর অপরাধের নালিশ।

বললাম, যথা ?

তুমি নাকি পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে রাখ ? জান না ? এ বয়সের মনডা লোতুন উড়ুখ্যু পাখির পারা—জালও চেনে না, ফাঁসও চেনে না।

ভাষাটা মালীর বুঝে হেসে বললাম, কেন, আমার পাখি তো পিঁজরের মধ্যে বেশ লক্ষ্মীটি হয়ে ব'সে আছে ব'লেই জানি।

ব্যাপারটা বন্ধু সবিস্তারে বললেন, মোটর থেকে নামতেই মালী বিষণ্ণবদনে এসে একটি সেলাম ঠুকে তো দাঁড়াল। একটু ভীত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, খবর ভাল তো ?

মালী মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে ডাইনে বাঁয়ে শুধু ঘাড় নাডলে। বলতে কি, আমার শরীরটা হিম হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম, কেন, বাবু ভাল আছে তো ?

মালী তেমনই ভাবে বললে, শরীলে তো ভালই আছেন, কিন্তু আমরা না হয় মুরুখ্যু-সুরুখ্যু লোক, আপনি তো ডাক্তারবাবু। বলি, আগে মন, পরে তো শরীল ?

ভরসার নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, একশো বার; তা মনই বা ভাল নেই কেন শুনি ?

মালী বললে, আপনাকে সেদিন বলতে গেলাম বাবু, তা কথাটা গেরাহ্যির মধ্যে আনলেন না। ও পশ্চিমের বাড়িটা আপনাদের তরে বেলকুলই ভাল লয়, কত লব্য জোয়ানের যে মাথা বিগড়ে একেবারে পাগল ক'রে দিয়েছে বলবার পারি না। ভয়ে ভয়ে আমরা বুড়ারাও

ওদিকে লজর করি না; চুপচাপ নিজের কাজটি সেরে ঘরকে যাই। আপনি এই তেতে-পুড়ে নামলেন, একটু ঠাণ্ডা হোন গা। যোদ্দা, ওনার লাড়ীটা একবার পরখ করবেন; আর গরিবের আর্জি, ওনাকে পশ্চিম দিগের জানলাডা বন্ধ রাখতে বলবেন। কি জানেন বাবু? এ বয়সের মনডা লোতুন উড়ুখ্যু পাখির প্যারা—জালও চেনে না, ফাঁসও চেনে না।

এই তো মালীর অভিযোগ; তোমার পশ্চিম দিকের জানলাও তো খোলা দেখছি, ওদিকে 'হানাবাড়ি'র জানলাও ঠিক সামনাসামনি খোলা, কোন অলোকসুন্দরীর কুদৃষ্টিতে ঘায়েল হচ্ছ না তো? নাড়ী-টাড়ি হাতড়ে পাব কি?

বন্ধু হাসতে লাগলেন।

অনেক চেষ্টায় মুখের সহজ ভাবটা বজায় রেখে বললাম, কুদৃষ্টি-সুদৃষ্টির খোঁজ রাখি না; তবে আমার নাড়ী বরং বন্ধুবিরহের উদ্বেগে কদিন একটু বেশি রকম চঞ্চল ছিল। তারপর? কেমন ছিলে বল? কই, তোমার এত দেরি হ'ল কেন, বললে না তো? কোন রকম—

কিন্তু বোধ হয় ধরা প'ড়ে গেলাম, সম্ভবত এই চাপা দেওয়ার সবিস্তারে চেষ্টা করতেই ডাক্তারের কৌতুহলটাকে জাগিয়ে তুললাম। তিনি আমার কথাটাই উল্টে নিয়ে আমার ওপর প্রয়োগ করলেন; মুখের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে বিস্ময়ের ভান ক'রে বললেন, অ্যাঁ, কি বললে? নাড়ী বেশি রকম চঞ্চল, তবে নির্ঘাত প্রণয়ের চোট, তাতে আর সন্দেহ মাত্র নেই; সে আঘাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ থাকে কিনা, চঞ্চলতা আনবেই।

আমি তখনও আত্মগোপনের চেষ্টাটা পরিত্যাগ করলাম না, হেসেই জবাব দিলাম, সত্যি নাকি? তা হ'লে ওটা তোমাদের ডাক্তারিরই একটা অঙ্গ বল—**X'rays, battery**-গোছের একটা ব্যাপার। এ যুগে

নিতান্তই একটা ঘরোয়া জিনিস। তোমরা 'প্রেম প্রেম' কর, আমার একটা ভয় ছিল, না জানি, বাঘ-ভাল্লুক কি একটা হবে বা।

কথা কি একটু বেশি ব'লে ফেললাম? বন্ধুর দৃষ্টি আর হাসি দেখলাম আরও ধাবালো হয়ে উঠেছে, তাঁর বিশ্লেষণের ছুরির মত। হাসতে হাসতে বললেন, ভয় এবার আমাদের হবার পালা; লক্ষণ তো ভাল বোধ হচ্ছে না।

পরিত্রাণের বৃথা চেষ্টা।

ধরা প'ড়ে গিয়ে হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠলাম। কেন বলব না? এত গোপনের আয়াস কিসের? যা আমার কাছে দিনের আলোর মত সত্য, তা দিনের আলোর মতই সবার কাছে মুক্ত হয়ে থাক্, এত প্রত্যক্ষ যার চোখে পড়বে না, তার দৃষ্টিশক্তির জন্যেই চিন্তিত হবার কথা।

পূর্বাপব সমস্ত ঘটনা একসঙ্গে মনে জেগে উঠে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার অটল বিশ্বাসের দুর্বার শক্তি নিয়ে আমি যেন বন্ধুর অবিশ্বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম,বললাম, শোন ডাক্তার, আমি মালী নয়, ওই বাড়িটাতে যে একটা কিছু ব্যাপার হচ্ছে তা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

হাঃ—হাঃ—হাঃ— শব্দে চমক ভাঙল। বন্ধু হেসে বললেন, আমার থিওরি,—ও-বাড়ি অন্ধ সংস্কার মাথায় ঢোকাবেই। এই দেখ, তোমাকেও পাকড়াও করেছে, শিক্ষাদীক্ষা সব জাহান্নামে গেল। তা হ'লে মালী বেচারা আর কি দোষ করেছে, বল?

আমার আজ হার, বন্ধুরই জয়, তাঁর ভাষা আমায় বিপন্ন ক'রে তুলছিল। বলতে লাগলেন, দেখেছ তা হ'লে? কি দেখলে? কোথাও কিছু নেই, ঘরের মধ্যে এক অনৈসর্গিক আলো ফুঠে উঠল, আর

দেখতে দেখতে এক অসামান্যা সুন্দরী—বল, আমায় একটু এগিয়ে দাও ; অকবি মানুষ, তোমাদের ভাষা ধার ক'রেই তো বলতে হবে।

বৃষ্টির ধারা প্রবলবেগে নেমে যেমন মাটির স্পর্শমাত্র নিজেই চূর্ণ হয়ে যায়, আমার অত দম্ভের বিশ্বাস যেন তেমনই শতধা খণ্ডিত হয়ে গেল। আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ক'রে বললাম, আঃ, কি আপদ ! সবটা শোনই না আগে, দেখেছি, কেউ ও-বাড়িটার কাছে ঘেঁষতে চায় না।

বন্ধু বললেন, কিন্তু সেটা কি একটা প্রমাণ ? দেখ বন্ধু, বিধাতা দুনিয়াটাকে এমন ঠেসে বাজে জিনিস দিয়ে ভরাট ক'রে দিয়েছেন যে, ওসবের জন্যে আর জায়গা নেই। ভুল ক'রে ফেলেছেন নিশ্চয়, কিন্তু আর উপায় নেই তাঁর। ব'স, ধড়াচুড়া ছেড়ে আসি ; নালিশের বিচার কিন্তু অসম্পূর্ণ রইল।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে।

বাগানে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ব'সে ছিলাম। ডাক্তার অনেক পূর্বে কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

আজ বিরুদ্ধমুখী চিন্তায় আমায় অবসন্ন ক'রে ফেলেছে।

ডাক্তারের কল্পনাবিমুখ সুস্থ মনের স্পর্শ চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি। কিন্তু তার এই শক্তি থেকে জোর পেয়ে আমি যতই আমার অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি থেকে কল্পনার অংশটা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছি, ততই সেটা ঘনীভূত অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, আজ যেন কাকে বিদায় দিতে বসেছি। আমার রোগ, আমার আরোগ্য সমস্তই তারই বিধান, এই সবের মধ্যে দিয়ে সে আমায় তার নিজের কাছে আকর্ষণ ক'রে এনেছিল, সে-ই আমার স্বপ্নের মধ্যে মায়ালোক বিস্তার

করেছিল, তারপর সেই মায়ালোক থেকে নেমে এসে যখন সে আমারই জন্যে নিজেকে এই পৃথিবীর স্পর্শের অধীন ক'রে তুলেছে, আর আমার বাসনার শতদল তার চরণ দুখানি ঘিরে বিকশিত হয়ে উঠেছে, এই সময় বন্ধু এসে একটা বিপ্লব বাধিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলেন। আজ এ কি হ'ল? ওরা যাকে বিভ্রম ব'লে প্রমাণ করতে চাইছে, তারই অভাবে আমার জীবনে কি শূন্যতা, আজ তা কাকে বোঝাব?

আজ চোখে মাঝে মাঝে অশ্রু জ'মে উঠছিল, এমন আর কোনদিন হয় নি। বাড়িটা এখান থেকে আর কখনও দেখি নি। বৃক্ষ-শাখা-লতার মধ্যে দিয়ে বাড়িটার কিছু কিছু দেখা যায়, আভাসের মত। ছায়ার ভাগটা বেলাশেষের ফিকে অন্ধকারে গ্রাস করছে, আর যেখানে তার গোলাপী রঙের আঁচ একটু একটু দেখা যায়, সেখানে বাড়িটা যেন অস্তমান সূর্যের কিরণে মিশে গেছে। সজল চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আজ মনে হচ্ছে, সে আমার জন্যে অজ্ঞাতের তিমির থেকে নেমে এসে নিজেকে আলোর মধ্যে মেলে ধরেছিল, আজ ব্যর্থতার ক্ষোভে সে এই কঠিন জড়পিণ্ডটাকেও মুছে নিয়ে তার বিদায়ের চিহ্নহীন পরিচয় রেখে যাবে।

বন্ধুর হাসি মনে প'ড়ে গেল। নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে চোখের জল মুছে ফেললাম, ভাবলাম, এই ঘেরা জমিটুকুর মধ্যে ব'সে ব'সে রাত্রিদিন কি এ আকাশকুসুম রচনা করছি? যাই, একটু ঘুরে আসি।

উঠলাম। রাস্তায় পা দিতেই পশ্চিম দিকের বাড়ির পানে নজর গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন লাগাম ক'ষে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনলাম। তখন মনের মধ্যে প্রশ্ন হ'ল, আচ্ছা, পশ্চিম দিকটাই কি অপরাধ করেছে? ওদিকে না যাওয়াটাই কি দুর্বলতা নয়?

এই প্রশ্নের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণের ইঙ্গিত ছিল, তাই এর

উত্তরস্বরূপ আমি চিত্তের সমস্ত বল প্রয়োগ ক'রে পূর্ব দিকে অর্থাৎ বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকে পা বাড়ালাম এবং অগ্রসর হলাম।

কিন্তু আমার পা যেন একটুর মধ্যেই অতিরিক্ত ভারী বোধ হতে লাগল। লাগবারই কথা; একে দুর্বল শরীর, তায় ব'সে ব'সে হাঁটার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার কিন্তু তখন এ কথা মনে হ'ল না, আমার মনে হ'ল, পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল যে, কিসের সঙ্গে আমি যেন শৃঙ্খলিত হয়ে গেছি নিরুপায়ভাবে। যতই আগুয়ান হবার চেষ্টা করছি, পেছনে টান ততই প্রবল হয়ে উঠছে।

শেষে ফিরলাম। এতক্ষণ মনের মধ্যে কিসের সঙ্গে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব তর্কবিতর্ক চলছিল, হেরে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ফেরবার সময় মনে হ'ল, দিব্যি লঘু গতিতে চলেছি। আমার বাসার সামনে এলাম; একটু দ্বিধা, এক লহমার অপেক্ষা, তারপর পশ্চিম দিকে এগুলাম। এই দ্বিতীয় পরাজয়ে আর একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

সেই বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়ালাম; আসা পর্যন্ত এই প্রথম। অনুভব করছি, একটা চাপা উত্তেজনায় পা কাঁপছে, শরীরটা হয়ে এসেছে শিথিল। আর একটি পা বাড়ালেই কোন্ এক নূতন আলো বাতাসের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব, যেন মৃত্যুর চেয়েও এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার এখনই ঘটবে।

আগলটা তুলে প্রবেশ করতে যাব, দেখি, ডাক্তার-বন্ধু সেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছেন। কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে?

আমাদের বাগানে এসে দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসলাম। বন্ধুর ভাবটা আজ নতুন রকম, কিছু বিব্রত, বিষণ্ণও। কি ভেবে জানি না, আমায় আর কোন প্রশ্ন করলেন না। বললেন, ও-বাড়িটায় কিছু

একটা ব্যাপার হচ্ছে বটে। তবে সেটা এই গরিব অশীতিপরা পৃথিবীরই এলাকার—এই যা।

আর একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, তোমার ঘটকালি করতে গিয়েছিলাম। অপ্সরা-কিন্নরীরা আমাদের এই পোড়া কপালের যুগটাকেই বয়কট করেছেন ব'লে সেদিন তোমায় বেশি উৎসাহ দিতে পারলাম না; কিন্তু আমাদেরই মত রক্তমাংসের কোন খেঁদী-পেঁচী এসে যে বাড়িটাতে ডেরা ফেলেছেন এবং আমার বন্ধুটির ওপর ভর করবার জন্যে ডানা ঝাপটাচ্ছেন, তাতে আর আমার কোনও সন্দেহ রইল না। ভাবলাম, দেখতে হচ্ছে। যোগাযোগ হয়, বন্ধুকে বুঝিয়ে বললেই হবে, এতেই সন্তুষ্ট হও, গরিবের পক্ষে রাঙই সোনা!

ছুটলাম তাড়াতাড়ি।

গিয়ে দেখলাম এক জোড়া পাগল—স্বামী আর স্ত্রী। অতি সাধারণ ব্যাপার, না? কিন্তু সবটা শোন, তখন টের পাবে, পশ্চিম দিকের বাড়িটার গুজবের উৎপত্তি কোথায়!

দুজনেই বৃদ্ধ এবং একটু বেশি রকম বিষণ্ণ; তবে হঠাৎ পাগল ব'লে মনে হবার কিছু নেই, সেটা টের পেলাম পরে।

যেতেই অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন। কথাবার্তা হ'ল, কিন্তু এত স্বল্প এবং পরিমিত যে, আমার মনে একটা অনধিকার-প্রবেশের অস্বস্তি জেগে উঠতে লাগল। মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল, আর রাগ হতে লাগল তোমার ওপর। একটা কিছু ব'লে উঠে আসব আসব করছি, এমন সময় কর্তা হঠাৎ বললেন, এখানে আমরা তিনজন এসে আছি আপাতত, আশা এলেই চারজন হই।

গৃহিণী কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে দিলেন, আশালতা আমাদের মেয়ে; এই এল ব'লে, যতক্ষণ না আসছে—

যাক, তোমার একটি 'আশা' যে আছেন তা হ'লে, এটুকু আবিষ্কার ক'রে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু কতক্ষণ গেল, তাঁর আর দেখাই নেই। আসরেও বিশ্রী রকম নিঝুমের পালা।

শেষে প্রশ্ন করলাম, কোথায় গেছেন তিনি ?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না, দম্পতি শুধু পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার এই সময় একটু খটকা লাগল।

শেষে গৃহিণী বললেন—সে এক অদ্ভুতভাবে, আমায় বিশ্বাস করাবার জন্যে যেন ভয়ানক জোর দিয়ে—যাবার সময় ঠিক বলতে পারলে না কোথায় গেল, কিন্তু আসবে ঠিক, এ কথার কোন—

এমন সময় কর্তা, 'যাই মা' ক'রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—এক বিকৃত আওয়াজ। আমার শরীরটা ঘন ঘন শিউরে শিউরে উঠল।

গৃহিণী কথার মাঝে থেমে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। কর্তা আস্তে আস্তে উঠে গেলেন, অতি সন্তর্পণে দু মিনিট, চার মিনিট, দশ মিনিট গেল, কর্তা শেষে বেরিয়ে এলেন ; এইটুকুর মধ্যেই কত পরিবর্তন হয়ে গেছে চেহারার।

গৃহিণীর যেন চোখ দিয়ে কথা বেরুল, আসে নি ?

কর্তা শুধু বললেন, এসেছিল বইকি, ডাকলে, শুনলে না ?

আমি মূঢ়ের মত ব'সে রইলাম, শোকের এ কি ভয়ঙ্কর রূপ !

বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে আরও পাঁচ-ছয়বার এই রকম ব্যাপার। কখনও কর্তা 'যাই মা' করে উঠে যান, কখনও গৃহিণী ; অথচ আমি সমস্ত শরীরটাকে এক জোড়া কানে পরিণত ক'রেও একটু টু শব্দ পেলাম না। আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল ; তারপর একবার কর্তা সেই রকম 'যাই মা' ক'রে উঠে গৃহিণীকে বললেন, আমায়ই ডাকলে বটে, কিন্তু চল, এবার দুজনেই যাই। আমায়ও অত্যন্ত মিনতির সুরে

বললেন, আপনিও একটু সঙ্গে আসবেন কি? ক্রমাগতই আমাদের সঙ্গে এ কি লুকোচুরি করছে! এ রকম তো ছিল না সে!

তিনজনে ভেতরে গেলাম, আমি রইলাম তাঁদের পেছনে।

তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলেন, এক এক জায়গায় ঘুরে ফিরে দু-তিনবার ক'রে। বলতে কি, এই অদ্ভুত সঙ্গীদের সঙ্গে সন্ধ্যের অন্ধকারে বিকৃত-মস্তিষ্কের একটা খেয়ালী সৃষ্টির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আমারও মাথায় যেন একটা ঘূর্ণিপাক দিয়ে উঠতে লাগল। এক এক সময় এমনই আত্মবিস্মৃত হয়ে উঠছিলাম যে, মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি এই হালকা অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি জমাট বেঁধে উঠবে। শব্দহীন বাড়িটা পর্যন্ত যেন তাব জন্যে উৎকট প্রতীক্ষায় নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ খোঁজার মাঝে হঠাৎ ব'লে উঠলেন, দেখলেন তো? আজ পাঁচ বছর এই রকম ক'রে ঘোরাচ্ছে।

পাঁচ বছর চার মাস হ'ল।—ব'লে গৃহিণী করুণ অনুযোগের দৃষ্টিতে আমাব দিকে চাইলেন।

ডাক্তারের নির্বিকল্প প্রাণ; কিন্তু তবুও যেন আমার বুকটা মোচড দিয়ে উঠল। বললাম, চলুন বাইরে।

আমার পেছনে পেছনে তাঁরা বেরিয়ে এলেন।

খানিকক্ষণ ব'সে দু-একটা প্রশ্ন ক'রে যা বুঝলাম, তা এই যে, বছর পাচেক পূর্বে, ঠিক এই সময়টা, এই বাড়িতে, সামনের ওই দোতলার ঘরটাতে ওঁদের একটি সতরো বছরের মেয়ে মারা যায। পর হয়ে যাবে ব'লে তখনও প্রাণ ধ'রে তার বিয়ে দিতে পারেন নি—সেই আশালতা। তাতেই ওঁদের মস্তিষ্ক একরকম বিগড়ে গেছে। এখন একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, শিগগিরই ফিরে আসবে; কোথা থেকে, কোন্ পথে, তার কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই। তার অনির্দিষ্ট আগমনের আশাতেই

বারো মাস অষ্টপ্রহর বাড়িটাকে তৈরি রাখেন। বছরের এই সময়টা আর বাইরে থাকতে পারেন না, যেন টেনে নিয়ে আসে। তারপর এই আশা-নিরাশা ; শেষে কয়েকদিন দেখে আবার হতাশ হয়ে ফিরে যান।

শুধু মালীর হাতে বাড়িটি রেখে পাঁচ বছর চার মাস ধ'রে এই ব্যাপার চলছে।

আমার কিন্তু ধোঁকা লেগে রইল, তিনজনের তৃতীয়টি কে ? জিজ্ঞেস করতে যাব, এমন সময় আলো নিয়ে মালীটা এসে দাঁড়াল। বললে, চলুন বাবু, রাত হয়ে এল।

দম্পতিও কিছু না বলায় কথাটা অনেকটা ভাল কথায় বের ক'রে দেওয়ার মত শোনাল। নমস্কার ক'রে উঠে পড়লাম ; আমার আর প্রশ্ন করা হ'ল না। তা ছাড়া ভাবলাম, সম্ভবত মালীকে ধ'রেই তিনজনের কথা বলেছেন। যাক, ওটা পরে কোন দিন জেনে নিলেই হবে।

বেরিয়ে এসে যখন রাস্তায় পড়লাম, একটা শব্দে ফিরে দেখি, মালী ফটকে তালা লাগাচ্ছে, ওর অভিপ্রায় নয় আর কি, কেউ এই পাগলের খেয়ালের মধ্যে এসে কোন রকম দখল নেয়।

বন্ধু একটু চুপ করলেন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর ডাক্তারের শরীর-মন থেকে এককালীন যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ইতি উদ্বাহ-খণ্ডে ঘটকরাজ-কাহিনী সমাপ্ত। ওঠ, চল, ওপরে যাই। ও কি! শ্রুতিফল—মূর্চ্ছা হবার কথা নয় তো! তোমার ও কি চাউনি!

আমার চাউনির মধ্যে যে শোকের অবসাদ আর সফলতার উন্মাদনা একসঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছিল।

আমি আর নিজেকে রুখে রাখতে পারলাম না ; ডাক্তারের হাতটা

চেপে ধ'রে ব'লে উঠলাম, ডাক্তার, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। এ কি তোমাদের অত্যাচার! অস্বাভাবিক আবেগে আমি নিশ্চয় কাঁপছিলাম।

ডাক্তার ভীতভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে একটু থেমে আস্তে বললেন, কি বিশ্বাস করব? কিসের অত্যাচার?

তোমাদের অবিশ্বাসের। অত্যাচার নয়? এই অবিশ্বাসের বিষ তুমি তো এখানকার বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছ. তা ছাড়া আমার মধ্যেও সংক্রামিত ক'রে আমার সেই তপস্যা নষ্ট ক'রে দিয়েছ, যার দ্বারা আমি তাকে পাবার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম। আবার অবিশ্বাসের হাসি? কিন্তু আমি তোমায় বলছি ডাক্তার, আমি দেখেছি; সেদিনে আমি মিথ্যে দিয়ে সত্যিটা ঢাকা দিয়েছিলাম, তোমার হাসির ভয়ে; কিন্তু আজ আমার সে সত্য পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে, তোমারই গল্পের মধ্যে দিয়ে।

কি দেখেছ? কি সত্যের কথা বলছ?

তাকে দেখেছি, আশাকে। সে আছে; কেউ তার ডাক শুনতে পায়। তুমি পাও নি তোমার নিষ্ঠার অভাবে, আর কারুর কাছে সে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, আমি তাকে দেখেছি।

বেশ, দেখাও আমায়।

কি বলব ডাক্তার, এই সন্ধ্যের মাঝখানে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দুপুরটাকে এনে ফেলতে পারলাম না; না হ'লে দেখতে, সে তার অপার্থিব দুখানি পায়ের শোভায় ঘরটা আলো ক'রে শুয়ে আছে। এই দু মাস ধ'রে সে এমনই ক'রে পৃথিবীর কাছে নিজেকে ধরা দিচ্ছে, সন্ধ্যের আবছায়ায় নয়, রাত্রের অন্ধকারেও নয়—ভরা দুপুরে, আলো যখন পৃথিবীর কানায় কানায় ভ'রে থাকে।

ডাক্তার একটি হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে বললেন, তুমি বড়

চঞ্চল হয়ে পড়েছ। আচ্ছা, বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আমার একটা কথার জবাব দাও তো।

কি ?

আমি বলছি, তোমার কথাটাই বরং আমার গল্পটাকে পূর্ণ করছে।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, তার মানে ?

তুমি যাঁকে দেখে থাক, তিনিই হচ্ছেন সেই তৃতীয় ব্যক্তি যাঁকে আমি খুঁজছিলাম।

একটু ব্যঙ্গের সুরে বললাম, মালীকে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলে না ?

না, কারণ কেউ মালীকে সচবাচর নিজের পরিবারের মধ্যে ধরে না। ওটা হয়েছিল আমার হিসেবের গোঁজামিল।

কিন্তু তুমি তো অত খুঁজেও তাঁকে পাও নি সেদিন।

ঠিক সেই সময়টিতে বোধ হয় ছিলেন না বাড়িতে।

আর, ঠিক দুপুরবেলাটিতে থাকেন ?

তুমি রোজ ওই সময়টায় দেখ ব'লেই যে দুপুরবেলাতেই থাকেন, আর আমি একদিন সন্ধ্যের সময় দেখতে পেলাম না ব'লে কোন সন্ধ্যেয়ই থাকেন না—এ রকম নিয়ম বেঁধে ফেলি কি ক'রে ? এবার খোঁজ নিলেই এঁর পরিচয়, গতিবিধি, সব টের পাব। একটা কথা ভেবে দেখ, এই রকম দুজন পাগলকে কেউ পরস্পরের ভরসায় ছেড়ে দিতে পারে না, কোন আত্মীয় যে সঙ্গে—

আমি আবার ডাক্তারের হাতটা ধ'রে অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠলাম, না, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস ক'রে নিচ্ছি ডাক্তার ; তুমি তোমার অবিশ্বাসের উপদ্রব নিয়ে ওর মধ্যে আর যেও না। তোমার দোহাই, তোমার বিজ্ঞান-দেবতার দোহাই।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই কতকগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে এসে জড়ো হয়েছিল। রাত যেমন এগিয়ে চলল, হাওযাটা একটু প্রবল হয়ে সেগুলোকে আকাশ-প্রাঙ্গণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করতে লাগল। নীচের জ্যোৎস্না বেয়ে মেঘের দীর্ঘ সচল ছায়াগুলো ঘোরা-ফেরা ক'রে সে রাত্রে পৃথিবীর ওপর কি এক যেন অলৌকিক ব্যাপারের আয়োজনে লেগে গেল।

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হ'ল। ভবানীপুরের দৈনিক জীবনের শেষ স্পন্দনটুকু থেমে গিয়ে আকাশ ভূতল স্তব্ধ হয়ে গেল। সুপ্ত জনপদবাসী নিশাচবদের জন্যে আসরটা যেন খালি ক'রে দিলে।

শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। আজ সমস্ত তর্ক-অবিশ্বাসের আবর্জনা পায়ে ঠেলে যেন এক মহাপুরস্কারের অধিকারী হয়েছি, জানি না, তা মিলনেব হাসি, কি চির-বিদায়ের অশ্রুজল! কিন্তু আমি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বিনিদ্রনয়নে তারই অপেক্ষায় ব'সে আছি। বেশ অনুভব করছি, পৃথিবীর সঙ্গে আমার যোগসূত্র দ্রুত শিথিল হয়ে আসছে, তার চিন্তাধারার, তার হিসাবের সঙ্গে যেন কোন মিল নেই।

প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে শেষরাত্রে বোধ হয় তন্দ্রালু হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ব্যস্ত খট-খট-খট-খট শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। হাওয়াটা ঠাণ্ডা ছিল ব'লে পশ্চিম দিকের জানলাটা একটু আগে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম, তারই ওপর যেন সনিবন্ধ করাঘাত পড়ছে।

হন্তদন্ত হয়ে উঠে খুলে দিতেই একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে প'ড়ে আসবাবপত্রগুলোকে বিচলিত ক'রে তুললে।

মনটা যেন ছাঁৎ ক'রে উঠল, যাঃ, একরত্তি ভুল—একটু দেরিতে সব গেল!

তীব্র উৎকণ্ঠায় বাইরে চেয়ে রইলাম।

কিছু নেই। শুধু বাতাসের হা-হা রব। যেন কার মর্মন্তুদ শোকোচ্ছ্বাস, কোথাও সান্ত্বনার মধ্যে বিরাম না পেয়ে ক্রমাগতই ব'য়ে চলেছে—হা—হা—হা—হা—হা—

আর সেই সঙ্গে ছায়ার সেই নিঃশব্দ মিছিল।

বিশেষের মধ্যে চোখে পড়ল, পশ্চিমের বাড়ির পরিচিত জানলা দুটো খোলা। জোর হাওয়ায় দেওয়াল-সংলগ্ন লতার খানিকটা স্থানচ্যুত ক'রে কপাটের ওপর ফেলেছে।

তবে কি রাত্রির শেষ প্রহরেও দিনের নাট্যের আর একটা অঙ্ক অভিনীত হয়? না, এটা—

এই সময় একখণ্ড মেঘ স'রে গিয়ে ম্লান জ্যোৎস্নাটা হঠাৎ তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠল, এবং আমার চিন্তার মাঝখানেই আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যেন নিশ্চল হয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখলাম, একটি দীপ্ত নারীমূর্তি আবেগভরে জানলার গরাদের ওপর তার সমস্ত শরীরটা চেপে স্থিরদৃষ্টিতে সমুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেহের উর্ধ্বভাগ থেকে বসন খ'সে গেছে, আর আলুলায়িত কেশের স্তবক বুকে মুখে বাহুমূলে নিবিড়ভাবে বিলম্বিত।

আমার মনে হ'ল, শরীরের সমস্ত বন্ধনী ছিঁড়ে একটা চীৎকার ক'রে উঠি। কি করতাম জানি না, কিন্তু এই সময় নৈশ আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে একটা বুক-ভাঙা স্বর উঠল, যাই মা।

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা 'ওঃ' ক'রে আওয়াজ ক'রে উঠেছিলাম মনে পড়ে। তারপর ঘরের কপাট খুললাম, বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম, বাগান অতিক্রম ক'রে ফটক খুলে বেরুব, কাঁধে একটা শীতল স্পর্শে চকিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখলাম, ডাক্তার।

বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

ওদের বাড়িতে। এই মাত্র 'যাই মা' ক'রে সাড়া দিলে ; আমি যাচ্ছি দেখিয়ে দিতে।

তুমি দেখেছ ?

স্পষ্ট, এত স্পষ্ট আমিও কখনও দেখি নি।

বেশ, ফেরো ; আগে আমায় দেখাও ; তারপর নয় দুজনেই যাব।

ফিরে এসে আমার জানলার সামনে দাঁড়ালাম। আমি সন্তর্পণে বললাম, ওই, জানলায় দেখ।

ডাক্তার একটু স্তম্ভিত বিমূঢ়ভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শেষে স্থির হয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, এদিককার জানলাটাব ওপর একটা লতা ঝুঁকে পড়েছে, আর ওরই মুখোমুখি, ঘরের ওদিককার জানলাটাও খোলা আছে, দেখতে পাচ্ছ ?

আবার তর্ক! অথচ সে রূপ তখনও আমি সমস্ত দেহমন দিয়ে উপলব্ধি করছি।

আমি সেদিকে না চেয়েই কিছু বিরক্তভাবেই বললাম, পাচ্ছি।

অস্তমান পূর্ণিমার চাঁদটা আকারে প্রকাণ্ড হয়ে ওদিকের ওই খোলা জানলাটার ঠিক সামনাসামনি এসে পড়েছে, আর এদিককার জানলার গায়ে লতার ঝুরিগুলো—

আমি অধৈর্যভাবে ব'লে উঠলাম, ডাক্তার, তোমার হাতে ধরছি, তোমার তর্কের হাত থেকে আমাদের রেহাই দাও, অন্তত এই রাতটা। ওই শোন, আবার সেই আওয়াজ! আমায় একটু মুক্তি দাও, এসে তোমার তর্ক শুনছি। ওই দেখ, এখনও ঠায় সেই ভাবে—

কথাটা শেষ হবার পূর্বেই একখণ্ড গাঢ় মেঘের ছায়া সমস্ত

জ্যোৎস্নাটাকে মলিন ক'রে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রদীপ্ত রূপশিখা যেন নিবে বিলীন হয়ে গেল। আমি বুঝলাম, চিরতরেই—

যাঃ, ডাক্তার!—ব'লে আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। ডাক্তার বলেন, সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম।

পরের দিন প্রায় নটার সময় বন্ধু এসে বললেন, চল, এবার তোমায় একটু লাইভ্‌লিয়ার সারাউণ্ডিংস-(livelier surroundings)-এ নিয়ে যাব; ক্রমশ সওয়াতে হবে কিনা। বাড়ি ঠিক ক'রে এসেছি হাজরা রোডে। কিই বা আমাদের এত হাঙ্গাম? খাওয়া-দাওয়া ক'রে দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়ব ভাবছি।

# মাতৃপূজা

সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

বৃদ্ধ সান্যাল মহাশয় একলা বাহিরের বারান্দাটিতে একটা ঈজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সময়টায় বাড়ির হাতায় একটু হাঁটিয়া বেড়াইতেন, আর পারেন না, লাঠি ধরিয়া চলিতেও কষ্ট হয় এখন।

ছেলেমেয়েরা বহুক্ষণ হইতে বাড়ির ভিতর গ্রামোফোন বাজাইতেছে। রাজবাড়ির অম্বিকাগু তেওয়ারীর গান, আর বশীর খাঁর সুরবাহার শুনিয়া যাঁহার জীবন কাটিল, এই সব নিক্তিতে ওজন করা আড়াই টাকা পৌনে তিন টাকার গানে তাঁহার মনের তন্ত্রীতে বেসুরা আঘাত দেয়। কোথায় অম্বিকাগু, কোথায়ই বা সুরবাহারী বশীর খাঁ! খেয়ার ওপারে যদি আবার দেখা হয়—

হঠাৎ আগমনীর সুর উঠিল, রেকর্ডেই। ওরা রেগুলেটার ঘুরাইয়া লয়টা বিলম্বিত করিয়া দিয়াছে। টানিয়া টানিয়া আনন্দে কারুণ্যে মেশা সুরটা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। যুগ যুগ ধরিয়া প্রবাহিত কি যে অদ্ভুত একটা সুর! যন্ত্রনিপীড়িত হইলেও যেন একেবারে প্রাণে গিয়া স্পর্শ করে। পূজার আর একুশটি দিন দেরি। চক্ষু দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিতেছে,—সত্যই কি তবে আর একবার মাকে দেখাটা ঘটিল? মা, আর মাত্র একুশটি দিনের পরমায়ু ভিক্ষা, এই তো শেষ দেখা—

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। কয়েকটি ছোকরা বারান্দার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আগে-পিছে হইয়া বৃদ্ধের চারিদিকে দাঁড়াইল। সবাই যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন করিল, একটি ছোকরা ভক্তিভরে

পদধূলি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধের শ্রুতির উপযোগী করিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, আজকাল আছেন কেমন আপনি ?

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, কি রকম থাকা আশা কর আর ? তাহার পর একটু ঠাহর করিয়া বলিলেন, অমরের নাতি না তুমি ? সব বড় হয়ে উঠেছ, বেরুতে তো আর পারি না, অনেককে আর চিনবই না বোধ হয়। তা ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব ?

পাশের একটি ছোকরা চাপা গলায় বলিল, আমরা সবাই বড হয়েছি বলছে, এই তালে আসল কথাটা তোল না হীরেলাল।

হীরালাল বলিল, এই বলছি। বসার জন্যে তাড়াতাডি কি ? ইয়ে, আমরা এসেছিলাম এবারের পূজোর সম্বন্ধে—

বৃদ্ধ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, বেশ করেছ। পূজোর কথাই ভাবছিলাম, আর তো দেরি নেই। যতীন আর অনুপম এসেছিল সেদিন ; বলছিল, এবার মাকে চার দিন পাওয়া যাবে, একটু ভাল ক'রে পূজোটা করবার ইচ্ছে। অনুপম তার কোন্ মক্কেলকে ধ'রে প্রতিমার জন্যে একটা মোটা টাকা আদায় করেছে, বলে, কেষ্টনগর থেকে কুমোর আনাব দাদামশাই ; ঠিকানা পাচ্ছি না। ওরা তো গলদঘর্ম হচ্ছে। পেলে ঠিকানাটা ?

আগন্তুকদের মধ্যে মুখ-চাওয়াচাওয়ি হইতেছিল, একটু গা-টেপাটিপি হওয়ার পর হীরালাল বলিল, আমরা ও-কথা নিয়ে ঠিক আসি নি। মানে, আমরা ভেবে দেখলাম, পূজোটা আরম্ভ হওয়া অবধি ঠিক ডেমোক্র্যাটিক মেথডে হচ্ছে না। যাঁরা খাটছেন, তাঁরা এমন ভাবে খাটছেন, এমন ভাবে চালাচ্ছেন, যেন—যেন—

হীরালাল বোধ হয় সাহায্যের জন্য একবার পিছন দিকে চাহিল। সকলে সামনে একটু জায়গা করিয়া দিল এবং পিছন হইতে একটু একটু ঠেলিয়া একটি যুবককে সামনে আগাইয়া দিল।

ঠিক যুবক নয়, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইবে। যুবকদের সঙ্গে রহিয়াছে বলিয়া এবং ক্ষৌরশিল্প ও বেশভূষায় যুবকত্বের একটা প্রয়াস থাকায় যুবক বলিয়া প্রথমটা ভ্রম হয়। সামনে আসিয়া বেশ ঘটা করিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, কই, তোমায় তো চিনতে পারলাম না বাপু! আর, বছর দুই থেকে তো বেরুতেই পারি না এক রকম।

হীরালাল বলিল, উনি এখানে নতুন এসেছেন, বছর দেড়েক হবে; সাধনবাবুর ভাগ্নী-জামাই, গালা আর মধুর ব্যবসা করবেন।

বৃদ্ধ কানের পিছনে হাতের আড়াল করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেমন চলছে ব্যবসা?

ভাগ্নী-জামাই বলিল, এখনও করি নি আরম্ভ, এইবার বসব ভাবছি। পূজোর ব্যবস্থা নিয়ে সব এসেছি আপনার কাছে। গত বৎসর দেখলাম, এ বছরও দেখছি, শহরে যে পূজো হচ্ছে দুদিন পরে, বাইরে দেখে শুনে তো কিছুই বোধ হয় না। ওই যে হীরালালবাবু বলছিলেন, যাঁরা খাটছেন, তাঁরা এমন তদ্গত হয়ে লেগে পড়েছেন যে, দেখলে মনে হয়, পূজোটা তাঁদের ঘরের। গত বৎসরেও দেখলাম, এ বছরেও দেখে যাচ্ছি, না আছে একটা মীটিং, না আছে ভোট, না আছে অফিস-বেয়ারার ইলেক্শন, কেন ওঁরা খাটছেন, কে ওঁদের খাটবার অধিকার দিয়েছে, কিছুই বুঝতে পারি না, তাই এঁদের বলছিলাম—

বৃদ্ধ পাকা ভ্রূ কপালে তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না বাপু, মায়ের পূজো, মাকে ঘরে আনছ, আহ্লাদ ক'রে খাটবে না? অধিকার আর কে দেয় বাপু? যিনি মা হয়ে আসবেন, তিনিই দেন অধিকার, শক্তি দেন, প্রাণ দেন। তা সত্যিই, ওদের দুজনের মেহনতটা

বড্ড বেশি হয়ে পড়ে। তা হোক, মায়ের কাজ, আর তোমরাও তো রয়েছ, সামলে-সুমলে দাও।

হীরালালের পাশে একটি ছোকরা, কিছু বলিবার জন্য ক্রমাগত হাঁ করিয়া আবার মুখ বন্ধ করিতেছিল, এ সুযোগটা আর ছাড়িল না। মুখটা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু সেটা কি অনধিকারচর্চা হবে না? —বলিয়া সমর্থনের জন্য ভাগ্নী-জামাইয়ের পানে চাহিল।

সে গম্ভীর হইয়া বলিল, ঠিক তো, এক দিকে যেমন অনধিকারচর্চা, অন্য দিকে আবার তেমনই আত্মসম্মানও তো আছে লোকের?

বৃদ্ধ একটু বিমূঢ় এবং ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, যতি ডাকে না তোমাদের কাউকে?

হীরালাল বলিল, ডাকেন; কিন্তু ওসব আন্‌-কন্‌স্টিটিউশনাল ডাক আমরা শুনব কেন? যতীনকাকাকে, অনুপমদাকে একজন প্রাইভেট লোক হিসেবে আমরা যথেষ্ট সম্মান করি; কিন্তু কথা হচ্ছে, পাব্লিক কাজে তো আর তাঁরা কাকা আর দাদা নন, তখন আমাদের দেখতে হবে, তিনি যে আমাদের আহ্বান দিচ্ছেন, তার পেছনে জনমত রয়েছে কি না!

ভাগ্নী-জামাই বলিল, আমি এঁদের বললাম, এখানে এই জনমত নেই ব'লেই পূজোটা যেন নিঃঝুমের ব্যাপার। দুটো লোক, কি চারটে লোক, কি দশটা লোক পুরুষানুক্রমে মুরুব্বিয়ানা করবে, যেন মৌরুসী পাট্টা নিয়েছে, ছেলে-ছোকরারা মাথাটি নীচু ক'রে গাধার খাটুনি খাটবে। বাস্, হয়ে গেল পূজো, কাক-কোকিলে টের পেলে না।

বৃদ্ধ বেশ একটু অধৈর্য হইয়া আঙুলে মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন, বাপু, পূজোর হৈ-চৈ, হাঁকডাক, সেসব পূজোর কটা দিনই হবে। তার আগে যতটা সুশৃঙ্খলায়, যতটা

কম গোলামালে কাজ হয়, ততই ভাল নয় কি? আজ চল্লিশ বছর মাকে আনছি, আমরা তো এই জানি। সে যাক, কিন্তু এখন তোমরা কি চাও বল দিকিন, শুনি?

প্রায় সমস্ত দলটাই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আমরা চাই ডেমোক্র্যাটিক মেথড।

ভাগ্নী-জামাই আর একটু টানিয়া বলিল, পার্লামেণ্টে ওরা এ মেথডটা চালাচ্ছে।

বৃদ্ধ স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, ওরাও দুর্গাপূজা ধরেছে নাকি?

হীরালালের পাশের ছোকরাটি বলিল, আমরা চাই একটা জেনারেল মীটিং। সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম। আমরা সবার সামনে জানতে চাই, যতিকাকা আর অনুপমদা কার হুকুমে কাজ করছেন!

তারা কাজ করছে ব'লে তাদের অপমান করাটা কি ঠিক হবে? তা ছাড়া, গোড়াতেই তো আমরা সব পরামর্শ করেছি একসঙ্গে ব'সে, সব বুড়োরাই ছিল—রামসদয়, হরিবিলাস, হালদার, মন্মথ, যতীন, আর-বছরের সব খরচপত্র দেখিয়ে শুনিয়ে, কি করতে হবে না-হবে ঠিক ক'রে নিলে—

পিছন হইতে একটি লম্বা-গোছের যুবক ডিঙি মারিয়া গলাটা আরও উঁচু করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু আপনারা কি পরামর্শ দিতে অথরাইজ্‌ড হয়েছিলেন?

কয়েকজন একট উগ্রভাবে ফিরিয়া চাহিতে ছেলেটি খপ করিয়া ভিড়ের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া লইল।

বৃদ্ধ শুনিতে পান নাই। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন;

বলিলেন, মীটিং জিনিসটাকে আমি ভয় করি বাপু, অন্য জায়গায় যা দু-একবার ওর রূপ দেখেছি ! তা বেশ, পরের বছর থেকে—

একটু ঠেলাঠেলি, টেপাটিপি পড়িয়া গিয়াছিল। হীরালাল বলিল, আজ্ঞে, পরের বছরের জন্যে আমরা আর রাখতে পারলাম না ; আমরা একটা মীটিঙের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি আপনার নাম ক'রে।

বৃদ্ধ অতিমাত্র বিস্ময়ে আরাম-চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, আমার নাম ক'রে ! কিন্তু আমি তো বলি নি বাপু, তোমরা এ মিথ্যেটুকু কেন বলতে গেল ?

সবাই একটু চুপ করিয়া রহিল। ভাগ্নী-জামাই বলিল, ওরা সব ধ'রে নিয়েছিল, আপনার মত হবেই। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি, আমরা তা হ'লে এখন আসি ; মীটিংটা পরশু রবিবার সন্ধ্যে সাতটার সময় হবে রসময়বাবুর বাড়িতে। আপনাকে যেতেই হবে।

যে ছেলেটি অনধিকারচর্চার কথা তুলিয়াছিল, বলিল, মিথ্যে কথা যে বললেন, ন্যায় আর ধর্মের জন্যে একটু মিথ্যে—

পাশেব একটি যুবক হাতটা টানিয়া ইশারা করিতে থামিয়া গেল।

যাইবার সময় প্রায় সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

সান্যাল মহাশয় ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, পরদিন বৈকালে যতীন, অনুপম, আরও দুই-তিনজন আসিয়া উপস্থিত হইল। যতীন বলিল, কুমোরের ঠিকানা যোগাড় করেছি দাদামশাই, এনে দিলাম। এবার এখানে ব'সেই বাংলা দেশের প্রতিমা আপনাকে দেখাব। মুখটা উৎসাহে দীপ্ত।

সান্যাল মহাশয়েরও মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, গড়গড়ার নলে দুইটা টান দিয়া বলিলেন, দেখলাম বোধ হয়, তোমাদের কল্যাণে

আর কুড়িটা দিনও কি বাঁচব না? কিন্তু ভাল কথা, ডেমোক্র্যাটিক পূজোটা কি বলতে পার? কথাটা অনেক কষ্টে মনে ক'রে রেখেছি, এক রকম জপমন্ত্র ক'রে; আন্দাজে মোটামুটি এক রকম বুঝলেও পুরো মানে ধরতে পারছি না।

যতীন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, আপনার কাছেও পৌছেছে কথাটা? ও ওই সাধনকাকার ভাগ্নী-জামাইয়ের কাণ্ড। আজ দেড় বছর থেকে মামাশ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করছে। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, মধু আর গালা নিয়ে বসব এবার। কাজকর্ম নেই, খালি ছেলে-গুলোর মাথা খাচ্ছে, কথায় কথায় পার্লামেণ্ট, কন্‌স্টিটিউশন; সেদিন আমার কাছে এসেছিল, ভাগিয়ে দিলাম। ঠোট-কাটা মানুষ তো। বললাম, ছেলেগুলোকে হুজুগে না মাতিয়ে একটু কাজ করতে দিন তো। সবাই তো আর চওড়া কাঁধওয়ালা মামাশ্বশুর পাবে না। সেই থেকে ভয়ানক চ'টে আছে আমার ওপর। শুনছি, খুব দল পাকাচ্ছে।

অনুপম বলিল, পাকাচ্ছে বইকি, সঙ্গে আবার রসময়বাবু যোগ দিয়েছেন, ওই যে সাধনকাকার অন্ন ধ্বংস করছে, রসময়বাবুর আনন্দ রাখতে আর জায়গা নেই, ক্রমাগত পিঠ ঠুকছে আর কুপরামর্শ দিচ্ছে, অমন কুচুটে লোক তো আর নেই। যখনই জামাইটা যাবার কথা তোলে, জঙ্গলে গালা আর মধুর ঠিকের সুবিধে ক'রে দেবে ব'লে আটকে রাখে।

সান্যাল মহাশয় বলিলেন, তাই বুঝি রসময়ের বাড়িতেই কাল মীটিং করছে! আবার মীটিংটা করছে আমার নাম ক'রে, অথচ আমায় জানায়ও নি আগে! কি অন্যায় দেখ! বলতে একটা ছেলে ঝাঁ ক'রে মুখের ওপর বললে, ন্যায় আর ধর্মের জন্যে মিথ্যা বলতে দোষ নেই। কি হ'ল গো কালে কালে! অথচ তোমরা এখনও মুখের ওপর একটা কথার জবাব দাও না।

সান্যাল মহাশয় ক্লান্তভাবে ঘাডটা ঈজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কথাটা সাধারণভাবে বলিলেও সান্যাল মহাশয়ের প্রাণে যে খুব লাগিয়াছে, সেটা সকলে বুঝিতে পারিল। একটু পরে তিনিই বলিলেন, যাক, তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম, যাতে পূজোটা ভালয় ভালয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো একটু। মীটিং করছে, একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব'লো সবাইকে, আমি তো আর যেতে পারছি না। আর তোমরা এই বছরটা কাটিয়ে দাও কোন রকমে বাপু, ঝগড়া-বিবাদ দেখে যেন না যেতে হয়। চল্লিশ বছর একভাবে ক'রে আসছি সবাই পূজোটা মিলে-মিশে—

কাজ করা অভ্যাস বলিয়া যতীনের চরিত্রই দাঁড়াইয়া গিয়াছে ছোট কথাগুলাকে আমল না দেওয়া। কর্মপ্রেরণায়, আশায় আর সফলতার একটা উজ্জ্বল ছবিতে তাহার মনটা সবদাই কানায় কানায় ভরিয়া থাকে। বলিল, ওর জন্যে আপনি ভাবছেন কেন দাদামশাই? ওই ব্যাটা ভাগ্নী-জামাইটাকে ক'ষে একটা দাবড়ি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেগুলো তো এখানকার খুবই ভাল, একটু গায়ে হাত দিয়ে বুঝিয়ে বলুন, মাথাটি নীচু ক'রে নিজেদের ভুল মেনে নেবে। দিন কতক বেশ চলল, প্রাণ দিয়ে কাজে মেতে উঠল সব, তারপর আবার কি যে ভজংভাজং দেয়, আবার দেখি ওই বুলি আওড়াচ্ছে,— ডেমোক্র্যাসি, কন্‌স্টিটিউশন, ভোট, ইলেক্‌শন। ওটাকে না তাড়ালে আর ভদ্রস্থ নেই। 'গালা গালা' করছে, জতুগৃহদাহ করতে পারতাম ওটাকে ভেতরে পুরে তো কতকটা ঝাল মিটত গায়ের।

অনুপম বলিল, এদিকেও কতকগুলো ছেলে বড় বেঁকে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাকে অনাদি হঠাৎ বললে, কাল রসময়বাবুর বাড়িতে সব মীটিং করছে অনুপমদা, আপনারা যেন যাবেন না। জিজ্ঞেস করলাম,

কেন রে? বললে, ওই মামাশ্বশুরের ঘর-জামাইকে একচোট তুড়ব আমরা মীটিঙে; আপনারা গেলে মুখ খুলতে পারব না। দম ফুলে মরব। অনেক ক'রে তো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। বললাম, পরের বাড়ি অনাদি, সেখানে একটা গোলমাল করা ভাল হয় না; তোরা বরং যাসই না। নিজেদের দু-চারজন নিয়ে মীটিং ক'রে আর কি করবে? তোরা ওই দিকে মাতলে আবার এদিককার কাজ পণ্ড হবে। বললে তো, যাবে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সব যেন চ'টে আছে দেখলাম।

সোমবার সকালে অনাদি অনুপমের সঙ্গে দেখা করিল, হাসিয়া বলিল, অনুপমদা, সত্যি, মা এবার দোলায়ই আসছেন, দুলিয়ে দিয়ে যাবেন।

অনুপম জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিতে অনাদি বলিল, কাল মীটিঙে ক্যাবিনেট ফর্ম হয়েছে, রসময়বাবু প্রেসিডেণ্ট, মোতিগঞ্জের সারদাবাবু ভাইস-প্রেসিডেণ্ট,—

অনুপম আশ্চর্য হইয়া বলিল, সারদাবাবুকে কি ক'রে পাকড়াও করলে?

অনাদি বলিল, বসময় তাঁকে ভাগ্নী-জামাইয়ের সঙ্গে গালা আর মধু দিয়ে জুড়বে ঠিক করেছে।

বুঝলাম না।

বলেছে, ভাগ্নী-জামাই ব্যবসা শুরু করলেই সারদাবাবুকে সাব-কণ্ট্রাক্ট দেওয়াবে। ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, ভাগ্নী-জামাই সেক্রেটারি, হীরালাল অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি—ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকগুলো লোক জুটিয়েছে। রসময়বাবুর ছেলে খবর দিলে—বুড়ো গোবিন্দ

আচার্যি পেটুক লোক, তাকে বলেছে, আপনি ভোগের চার্জে থাকবেন। সে রোগা হাতের ঘুষি নেড়ে মীটিঙে এন্তার 'ডেমোক্র্যাসি ডেমোক্র্যাসি' ক'রে চেঁচাচ্ছিল—এই রকম ক'রে অনেককে হাত করেছে। একটা ফ্যাসাদ বাধাবে।

অনুপম একটু উগ্রদৃষ্টিতে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিয়া প্রশ্ন করিল, কি ক'রে ?

তা বলতে পারি না, তবে যতীনদার অতটা অসাবধান হওয়া ভাল হয় নি।

দুই-তিন দিনের মধ্যে শহরের বাঙালী-সমাজে বেশ একটা চঞ্চলতা লক্ষিত হইল, এবং আরও দিন দুয়েকের মধ্যে সত্তর-আশি ঘরের ক্ষুদ্র সমাজটি মাঝখানে একটা বেশ স্পষ্ট রেখা টানিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিল। এত তাড়াতাড়ি কি করিয়া ব্যাপারটা হইল, অর্ধশতাব্দীর বাঁধন দুই দিনে কি করিয়া ছিন্ন হইল—বোঝা গেল না, তবে হইল, বেশ নিঃসন্দেহভাবেই হইল। সেখানে পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আর কোন আলগা আবছায়া ভাব রহিল না। ভাবটা এই রকম—এ পক্ষে, কি ও পক্ষে ? নাও, চটপট ঠিক ক'রে সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়ে পেছোও বা পা বাড়াও—চটপট—মা আসতে আর মাত্র দিন পনরো বাকি, দোলায় আসবেন—জাতীয় চরিত্রের অঞ্জলি দিযে তাঁকে আবাহন করতে হবে।

খোলার চালের চণ্ডীমণ্ডপ—মাঝে একটি বড় হল-গোছের, পাশে দুইটি ছোট ছোট কামরা। মাঝের হলে কৃষ্ণনগরের কুমোর প্রতিমা গড়িতেছিল, কয়েকজন কুলি চালচিত্রের কাঠামো সমেত একটা প্রতিমা গড়ার চৌকি ধরাধরি করিয়া আনিয়া পাশে রাখিল। বৈকালে খড়, সুতলি, বাখারি লইয়া দুইজন এদেশীয় কুমোর আসিয়া হাজির হইল। কৃষ্ণনগরের ভবানী পাল আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি ?

মাইকা মূর্তি গোড়া হোবে।

মূর্তি গড়া হবে! কেন?

পূজা হোবে।

আর এ মূর্তি?

যে মূর্তিকা বেশি ক্ষেমতা হোবে, তারই পূজা হোবে। হাম তোম্হার থেকে এক ফুট বড়া মূর্তি বানাবে। বাবুরা বলিয়েছে— জবরদস্ত্ এ রকোম মূর্তি। হাত দুইটা বাঁকাইয়া শরীরে একটা দোলা দিয়া মূর্তির জবরদস্ত-পনার একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিল।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না। জবরদস্ত মূর্তি খড-কাঠে রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বেই তাহার কতকগুলি বাখারি তাহার স্রষ্টা দুইটির পিঠে ভাঙিল।

রসময়-ভাগ্নীজামাইয়ের দল পরীক্ষা হিসাবে কুমোরদের আগাইয়া দিয়াছিল। নিজেরা আসে নাই। পুলিসে ডায়েরি করাইয়া দিল। পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া তদন্ত করিয়া গেল। মকদ্দমার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। পূজোর দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, ব্যাপার ততই ঘোরালো হইয়া উঠিতে লাগিল।

রমেশ পণ্ডিতের খুড়ো অন্নদা ঝগড়া জিনিসটা বড় ভালবাসিতেন। মাঝখানে নির্লিপ্ত থাকিবাব ভান করিয়া দুই দিকেরই পিঠ ঠুকিয়া বেশ চালাইয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ মারা গেলেন। কিন্তু বসিয়া রহিলেন না; তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে কাজ আরও অগ্রসর হইল। বড়দের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হইতে হইতে থামিয়া গেল। ঠিক থামিয়া গেল বলিলে ভুল হয়, বড়দের ছোট সংস্করণেরা একদিন সেটা ইস্কুলে সাধ মিটাইয়া পুরা করিয়া লইল।

এ দিকে আবার একটা গুজব রটিয়াছে। অনাদি আসিয়া বলিল,

শুনছি, প্রতিমা ওরা গডাচ্ছে অনুপমদা, কিন্তু কোথায় তা বুঝতে পারছি না।

অনুপম বলিল, খোঁজ নাও।

চেষ্টা করছি। কাল মার একটা ব্রত আছে, একটি বামুন খাওয়াবেন। ভাবছি, গোবিন্দ আচার্যিকে নেমন্তন্ন করব। লুচি সন্দেশ ঢুকছে জানলে ওর পেটের কথাগুলো জায়গা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবেই।

অনাদির চালটা কিন্তু খাটিল না। নিমন্ত্রণ পাইয়া আচার্যি শ্যামা কবিরাজের কাছে অসুস্থতার অজুহাত করিয়া একটা হজমি চাহিতে গিয়াছিল। শ্যামা কবিরাজ জামাইয়ের দলের লোক, কি করিয়া নিমন্ত্রণের রহস্যটা টের পাইয়া কড়া করিয়া জোলাপ ঠুকিয়া দিয়াছে। অনাদিকে শেষ-মুহূর্তে একজন এদেশী ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মায়ের ব্রত রক্ষা করিতে হইল। সে একা পাঁচটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যের অধিকারী করিয়া গিয়াছে। কথাটা লইয়া ওদিকে খুব হাসি পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতিমার কথাটা সত্য নয়, কোন কুমোরই আর ঘেঁষিতে চাহিতেছে না। তবে এদিকে যেমন থিয়েটার হইবে, ওদিকের তরফ হইতে তেমনই একটা যাত্রাপার্টিকেও বায়না দেওয়া হইয়াছে; পাঁঠা কেনাও হইয়াছে। জামাই সবাইকে স্তোক দিয়াছে—পূজোর আসল অংশ তো এইগুলোই, প্রতিমা তো ভক্তের মনেই রয়েছে।

সান্যাল মহাশয় কপালের উপরের চুলগুলা মুঠায় করিয়া ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে বলিলেন, কি ক'রে সম্ভব হ'ল এটা, তাই ভাবছি যতীন! সোনার জায়গা ছিল, এই কটা দিনে চেহারা বদলে দিলে একেবারে!

পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ঘট স্থাপন করিয়া। মূর্তি শেষ হয় নাই। মুণ্ড বসাইবার পূর্বেই ভবানী পালের বাড়ি হইতে জরুরি টেলিগ্রাম আসিল. তাহার স্ত্রীব ওলাউঠা। সে রাতারাতি তাহার ছেলেকে লইয়া যতীন প্রভৃতিকে না বলিয়া পলাইল। সেখানে গিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী দাওয়ায় বসিয়া এক-খোরা পান্তাভাতের সদ্গতি করিতেছে। বিদেশে অমন শাঁসালো কাজটা অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া আসায় সে ভবানীর ওলাউঠার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ব্যাপারটা ভবানী বুঝিল, কিন্তু যা কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আসিয়াছে, আর ফিরিবার প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না।

স্থানীয় কোনও কুমোর ভিড়িল না, তাহাদের একজন 'জবরদস্ত' মূর্তি গড়িতে গিয়া যা দক্ষিণা লইয়া ফিরিয়াছে, তাহাতে তাহারা সবাই অতিরিক্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

এখন কাঠামোসুদ্ধ মুণ্ডহীন প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে, পূজা সম্বন্ধে সবাই এত উদাসীন যে, কাঠামোটাকে যে বাহিরে রাখিয়া দেওয়া দরকার, সে কথাটাও কেহ ভাবে নাই। তাহারই সামনে ঘট স্থাপন করা হইয়াছে; রেকর্ডের সঙ্গীতের মত একটা প্রাণহীন যান্ত্রিক পূজা হইতেছে।

যতীন আসে নাই। তাহার অত্যন্ত বেশি আশা লইয়া কাজ করা অভ্যাস বলিয়া একেবারে মুষড়াইয়া গিয়াছে। অনুপম আসিয়াছে, তাহার প্রকৃতিটা ঠিক উ-টা, উৎসাহের মুখে অযথা বাধা পাইলে সে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ক্ষতি-বৃদ্ধি খতাইয়া দেখিতে পারে না, আরব্ধ কর্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে পারে না, ধ্বংসলীলায় মাতিয়া উঠে।

অনুপম আসিয়াছে; কিন্তু পূজা ভুলিয়া সে এখন অন্য দিকে। অন্য দিকের দৃশ্যটাও অন্য রকম।

দুই দল রোশনচৌকি বসিয়াছে। যাহারা এখানকার বাঁধা বাজিয়ে অর্থাৎ যাহারা যতীন-অনুপমের ফরমাশে আসিয়াছে, তাহারা একটা করুণ ভৈরবীর সুর তুলিয়াছে। ভিতরের দিকে বসিয়াছে রসময়-ভাগ্নী-জামাইয়ের আহূত রোশনচৌকি—কতকগুলি ছেলে তাহাদের উসকাইয়া দিয়াছে, তোরা বেহাগ ধর্, এমন বেহাগ ধরবি যেন ওদের ভৈরবীকে টুকরো টুকরো ক'রে ছেড়ে দেয়। খুব আনাড়ী রোশনচৌকি, এরা বেহাগকেও টুকরা টুকরা করিতেছে, ভৈরবীর তো কথাই নাই। সমস্ত জায়গাটা সঙ্গীতের মৃত্যু-বিবাদে বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এক দলের চেষ্টা ও পরিশ্রম আর অন্য দলের টিটকারির মধ্যে থিয়েটারের স্টেজ উঠিতেছে, বাধিবার দড়ি হারাইতেছে, বচসা, গালাগালি, হুমকি—হাতের আঙুল বজ্রমুষ্টিতে কুণ্ডলিত হইয়া উঠিতেছে, উদ্যত মুষ্টি তীরের মত আগাইয়া ছুটিতেছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। তাহার কারণ, প্রচুর লালপাগড়ি ঘোরাঘুরি করিতেছে। এটা প্রেসিডেণ্ট রসময়ের বন্দোবস্ত। বলিতেছে, এই তো বাহার! তা নয় তো বুকে কাপড়ের এক-একটা ক'রে ফুল এঁটে সব ডিগডিগে ভলাণ্টিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আরে ছ্যাঃ! এই সব হইল নগ্ন গুণ্ডামি। ও দিকে ভদ্রতাও হইয়াছে মারাত্মক, নিমন্ত্রিতেরা বেশির ভাগই এদেশী ভদ্রলোক, উভয় পক্ষের অভ্যর্থনার টানাটানিতে নাজেহাল হইয়া উঠিতেছে।

শুধু পূজার কাছটাই নিষ্প্রভ, কেন না পূজা আজ অবান্তর। বাকি সমস্ত জায়গাটা গমগম করিতেছে। ছেলে যুবা সবার মুখেই একটা উল্লাসের দীপ্তি। ভাঙনের মধ্যেও একটা উল্লাস আছে তো।

সকলে বিস্ময় মানিতেছে—শান্ত, সৌম্য, স্নিগ্ধ মাতৃপূজার মধ্যে এ উন্মাদনা কোথায় লুকানো ছিল এতদিন? এ যেন আগাগোড়াই

পাঁঠা-বলির একটা ভৈরব আনন্দ। পূজাই যে আজ যূপকাষ্ঠে উঠিয়াছে, এ কথা ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ কোথায়!

একটু দূরে রসময় হুঁকা হাতে, সস্মিত বদনে নিজের কীর্তি উপভোগ করিতেছিল; ভাগ্নী-জামাই ব্যস্ততার মধ্য হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বলুন তো, মনে হচ্ছে না যে, সবার পূজো, সবাই মায়ের সমান ছেলে? তা নয় তো এক দিকে যতীন অনুপম ফপরদালালি করছে, আর ছেলেগুলো ভেড়ার মত নিঃশব্দে খেটে যাচ্ছে! আরে ছ্যাঃ! এই ডেমোক্র্যাসির যুগে—

চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণটিতে, বিধবা আর অন্যান্য মেয়েদের লইয়া যেখানে একটু ভিড় হইয়াছে, তাহার পিছনে ছোট নাতিটির কাঁধে লঘু ভর দিয়া বৃদ্ধ সান্যাল মহাশয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে উন্মাদনা। তাঁহার রজতশুভ্র কেশ, আবক্ষ শ্মশ্রু, আয়ু-ন্যুব্জ দেহ আজ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। ললাটে ভূমিস্পর্শ করিয়া উঠিয়া মগ্নস্বরে বলিলেন, বড় মুখ ক'রে একুশটা দিনের আয়ু চেয়েছিলাম মা, তা এমনই ক'রেই কি দিতে হয়? আরও বলিবার ছিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠায় আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

আরও একজন একটু অনুযোগ করিল।

অম্বিকা গাঙ্গুলী। নেশাখোর মানুষ, কোনও দলের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। টলিতে টলিতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল। তারপর ঘূর্ণ্যমান চক্ষু দুইটিকে সাধ্যমত অসমাপ্ত মূর্তির উপর নিবদ্ধ করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, মুণ্ডু নেই, তাই দেখতে পেলে না মা, দোলায় এসে কি অনর্থটাই ক'রে গেলে!

অম্বিকা গাঙ্গুলীর কথা কেহ বড় গ্রাহ্য করে না, তবুও আজিকার এই কথাটুকুতে কি একটা ছিল, সকলে একবার ফিরিয়া চাহিল।

# বন্য ও বন্যা

স্নান করিতে যাইতেছিলাম। মাথায় একটা প্রচলিত ফুলেল তেল মাখি। শিশির ছিপিটা খুলিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বাঁ হাতে ঢালিতে যাইব, আন্দাজের অতিরিক্ত খানিকটা হড়হড় করিয়া হাতের তেলোয় পড়িয়া গেল। লক্ষ্য করিয়া দেখি, লাল ঘন তেলটায় ফিকে রঙের চাকা চাকা দাগ, এদিকে অন্য দিনের চেয়েও হাতে যেন বেশি ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হইতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল। তেল বাহির করিয়া লইয়া কেহ জল ঢালিয়া রাখিয়াছে নাকি?

শিশিটা তুলিয়া ধরিয়া দেখি, যাহা ভাবিয়াছি ঠিক তাহাই। একটু-আধটু নয়, প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জল। কাল কিনিয়াছি শিশিটা, এক দিনের খরচে সামান্য একটু খালি হইয়াছিল, প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; আজ দেখিতেছি, প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি সাবাড়! কাহার এ কীর্তি?

আমার ঘর বাড়ির বাহিরে, অন্দর-বাড়ির কাহারও সঙ্গে সংস্রব নাই। ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে দৌরাত্ম্য করে, বিশেষ করিয়া ছবি। কিন্তু মাথার তেল লইতে সাহসও করিবে না, প্রয়োজনও নাই। তবু দলটিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কেহ জামার ছেঁড়াটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া, কেহ কষুটে পেয়ারাসুদ্ধ হাতটা হাফ-প্যাণ্টের পকেটে সাঁধ করাইয়া, কেহ চুন-হলুদ-লাগানো মচকানো পায়ে না খোঁড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে ঘরের সামনে আসিয়া জড়ো হইল। আমার কাছে ডাক পড়িবার মত সবারই কিছু না কিছু একটা খুঁত আছেই বলিয়া, সবারই সবার পিছনে দাঁড়াইবার জন্য একটু ঠেলাঠেলি—অবশ্য বিচারকের দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করিয়া।

তেলের শিশিটা সামনে তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম, কার কাজ এ? সত্যি কথা বলবে।

গোপলার বুকের বাঁ দিকটা কি করিয়া ছড়িয়া গিয়াছে, বোতামহীন কামিজে সেখানটা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে সামনে ঠেলিয়া আসিয়া বলিল, আমি করেছি মেজকা, আর এর জন্যে দুঃখিত।

ওটা ধূর্তের শিরোমণি। বালক জর্জ ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতার গল্প শোনা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই এই বাঁধা গৎ আওড়াইয়া গোড়াতেই হাঙ্গাম মিটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ভাষাটিও ব্যবহার করে সাজানো, যেমন গল্প শুনিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করেছিস?

গোপলা থতমত খাইয়া শিশিটার দিকে একটু হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া পিছু হটিতে হটিতে ভিড়ে ঢুকিয়া পড়িল।

সকলকে অপরাধটা বুঝাইয়া দিলাম। বলিলাম, এই শিশিটার মধ্যে আদ্ধেক তেল, আদ্ধেক জল—তোমরাই কেউ করেছ এই কাণ্ডটি।

একটু মিথ্যা রচনা করিয়া বলিলাম, ছবি, ঠিক তোমার কাজ এ, তখন খেলাঘরের মাছ ভাজবার জন্যে 'তেল নিয়ে আয়, তেল নিয়ে আয়' ক'রে চেঁচাচ্ছিলে।

ছবি আলাদা দাঁড়াইয়া ছিল, ভয়-করাদের দলে ওর জায়গা নয়। বলিল, ব'য়ে গেছে তোমার তেল নিতে আমার।

গটগট করিয়া চলিয়া গেল এবং নেবুতলা হইতে একটি মাটির খুরি আনিয়া আমার সামনে বসাইয়া দিয়া বলিল, ব'য়ে গেছে তোমার তেল নিতে। এই দেখ।

সত্যই দেখি, খুব পাতলা করিয়া এক খুরি গোবর-গোলা। অমন সঙ্গতিপন্ন গৃহিণীকে চুরির অপবাদ দিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম।

মণ্টু বছর আষ্টেক যাইতে না যাইতে চশমা ধরিয়াছে, অল্পভাষী এবং গলার স্বরটাও গম্ভীর। সেইজন্য বাড়িতে তাহাকে প্রফেসার বলিয়া ডাকা হয়। ছবি ভয়ের আবহাওয়াটা কতকটা নষ্ট করিয়া দেওয়ায় সাহস পাইয়া বলিল, আর মাথায় মাখবার তেলে তো মাছ ভাজা হয়ও না।

গোপালও আগাইয়া আসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল ; এই রকম অপ্রিয় সত্য কিছু একটা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বলিলাম, যা, বেরো সব ; খবরদার, কখনও দেখেছি আমার তেলে হাত দিতে তো—

শিশির জলীয়াংশটা সন্তর্পণে ফেলিয়া দিয়া, সাবানের বাক্সটা তুলিতে হাতে যেন বেশি রকম হালকা ঠেকিল। ডালা খুলিয়া অভ্যন্তরস্থ সাবান দেখিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইল। বোধ হয় আধখানাও সাবান নাই। সোজা কাটিয়া লওয়া নয় ; কে সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত চারিদিক হইতে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া চাঁচিয়া সাবানটাকে নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছে। ওজন কমিয়াছে, কিন্তু আকৃতি হুবহু সেই রকম আছে।

কে এ যাদুকর ?

নাওয়া মাথায় উঠিল। ঈজি-চেয়ারটায় গা ঢালিয়া দিয়া চিন্তা করিতে লাগলাম। নানা দিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম, জানাজানি হইলে চোর সাবধান হইয়া যাইবে। আবার ছেলেমেয়েগুলাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। ছবিকে পুরোবর্তিনী করিয়া সবাই আসিয়া দাঁড়াইল। ব৷ললাম, আমি সে তেল চুরির কথা টের পেয়েছি ; চাকর-বাকরদের বলবি নি, বুঝলি ?

সবাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছি।

আমার চোখের আড়াল হইতেই না-হইতেই উহাদের মধ্যে একটা যেন হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিলাম, ওদের

বারণ করাটা ঠিক হয় নাই—কে কোন্ চাকরকে আগে সংবাদটা দিবে, সেই লইয়া চঞ্চলতা রেষারেষি পড়িয়া গিয়াছে। আবার ডাকিলাম।

চাকরদের ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজি করতে লেগেছিলি কেন ?

সকলে পরস্পরেব মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। পাপড়ি নিজের অন্তরের ইচ্ছা এবং আমার বারণের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া বলিল, বলব না ব'লে।

সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া—উগ্র চোখ বুলাইয়া বলিলাম, এই শুনে রাখ, কোনও চাকর যদি টের পায়, কার কাছে টের পেয়েছে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে তার পিঠে ওই আস্ত বেতটা ভাঙব।

বাড়ির অন্য কেহ টের পাইলেই বা লাভ কি ? শুধু গঞ্জনা অথবা বিদ্রূপ। বলিলাম, শুধু চাকর নয়, অন্য কেউও টের পাবে না।

এতবড় একটা সংবাদ একেবারেই কাহাকেও না জানাইতে পারার যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া সকলে মুহ্যমান হইয়া আর একবার পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। গোপলা আর মনেব ভাবটা চাপিতে পারিল না, স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তা হ'লেও ওই ব্যবস্থা ?

বলিলাম, ঠিক ওই ব্যবস্থা।

সকলে একবার আড়চোখে আমার বেড়াইবার ছড়িটার পানে চাহিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

২

তর্কে তর্কে রহিলাম এবং সত্য কথা বলিতে কি, অবশিষ্ট তেল এবং সাবানটুকু ভোগে লাগিল।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, ঘরে যেন সময়মত ঝাঁট পড়ে না, আসবাবপত্র ঝাড়া-ঝোড়া হয় না, এমন কি রাত্রে শুইতে যাইবার

সময় রোজই দেখি, বিছানা গোটানো। ঘুমের চোখে তাড়াতাড়ি টানিয়া ফেলিয়া কোন রকমে শুইয়া পড়ি। মনে করি, সকালে উঠিয়া তুলিব; কথাটা আবার ভুলিয়া যাই।

প্রায় পাঁচ-ছয় দিন দুর্ভোগের পর আহারের সময় একদিন চাকরদের প্রসঙ্গ উঠায় কথাটা মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, আর আমার ঘরেরও তো দুর্দশা ক'রে রেখেছে, বাসদেওয়াটা কটা দিনের ছুটি নিয়েছে, এরা না দেয় ঘরে ঝাঁট, না পাতে বিছানা।

মা বলিলেন, তোর ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি যায় ব'লে যখন তখন ঘরে ঢুকতে ওদের বারণ ক'রে দিয়েছিলাম, তা ব'লে—

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করলাম, জিনিসপত্র চুরি হয়েছে তোমায় কে বললে?

মা যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। আমার ভগ্নী বলিল, ওমা, তোমার ঘর থেকে তেল চুরি ক'রে শিশিতে জল ঢেলে রেখেছিল, এ কথা পাড়ায় কার অজানা আছে? বেহুঁশ অসাবধানী ব'লে তো তোমার বদনাম র'টে গেছে সমস্ত পাড়াটায়।

সামনে গোপাল যাইতেছিল, ডাক দিলাম, গোপলা, এদিকে আয়।

মা বললেন, থাক বাপু, এ নিয়ে আর মারধোর করে না। আর, মারবিই বা কাকে? ও কি একা বলেছে? যাদের যাদের বারণ করেছিলি, সবাই এক এক ক'রে এসে চুপিচুপি আমায় ব'লে গেছে, আর তোকে বলতে বারণ ক'রে গেছে। আহা, ওরা কি পেটে কথা রাখতে পারে! সে চোরের মত চারিদিকে চাইতে চাইতে এসে বলার যদি ধরন দেখতিস!

মা হাসিতে লাগিলেন।

একটু পরে বলিলেন, আর একটু চোখ চেয়ে থাকিস। এত চুরিই

বা যায় কেন জিনিস? যখন বাইরে যাবি, ঘরে চাবি দিয়ে গেলেই পারিস তো।

বলিলাম, আপিসে যাওয়ার সময় তো দিয়ে যাই চাবি। অন্য সময় দিই না, তার মানে বাসদেওয়া ছোঁড়াটা থাকে—

মা একটু ঝাঁঝিয়াই বলিলেন, মস্তবড় সাধুপুরুষ, ও তো চুরি করতে জানে না! ওই ছোঁড়াটার ওপর অতি-বিশ্বাসেই তোকে একদিন ভাল ক'রে পস্তাতে হবে; ছোটলোক ওরা, ওদের হাতে যথাসর্বস্ব কখনও ছেড়ে দেয় অমন ক'রে মানুষে?

হাত থামাইয়া বলিলাম, মা, লোক আমিও একটু-আধটু চিনি। ও ছোঁড়াটার আর সব দোষই আছে, কিন্তু চোর নয়। আজ দু বছর থেকে বাইরের সব পাট ওই করছে, কিন্তু আমার কথা ছেড়ে দাও, কেউ বলুক যে, কারুর কিছু একটা চুরি গেছে—একটা কানা কড়ি। আর তেলের কথা বলছ, ও চুরি ক'রেও যদি একটু আধটু তেল কখনও গায়ে মাথায় মাখে তো সে আমার ভাগ্যি ব'লেই মনে করব মা।

কেন যে মনে করিব ভাগ্য বলিয়া, তাহা বলিতেছি।

অত্যন্ত নোংরা ছোঁড়াটা। বছরে মাত্র চারিটি দিন স্নান করে, নন্দ মহারাজের মেলার দিন, তিলাসঁক্রাৎ অর্থাৎ পৌষ-পার্বণের আগের দিন, ছট অর্থাৎ কার্তিক মাসের ষষ্ঠীর দিন, আর হোলির দিন মেলা রঙ গোবর কাদামাটি মাখার পর বাধ্য হইয়া। এর অতিরিক্ত আমি দুই-একবার অন্য চাকরদের দিয়া জবরদস্তি স্নান করাইয়াছি, কিন্তু অভ্যাসের অভাবে জ্বরে পড়িয়া আমার কাজের ক্ষতি করে বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।

পরিষ্কার কাপড়-চোপড় দিয়া দেখিয়াছি, ওর গায়ে উঠিলে, চুম্বকে যেমন লোহা টানে, ঠিক সেই ভাবে চারিদিককার ময়লা টানিতে থাকে। এদিক দিয়াও হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।

বাদশা-কুড়ে। আমার ঘরের সামনে বারান্দাটিতে বসিয়া থাকে এবং একটা কিছু ফরমাশ করিলেই প্রথমে আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া লয়, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে জল বাহির হইয়া আসে। খোকা ডাক্তার বলে, ওঠা ঠিক ক্রন্দনের অশ্রু নয়। কি একটা গ্রন্থির ডাক্তারী নাম করিয়া বলে, সেইটাতে অত্যধিক চাপ লাগিয়া অনেকের অহেতুকভাবেই ওই রকম হয়। সজল নয়নে বাসদেওয়া উঠিয়া আসে এবং ফরমাশটা শুনিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তামিল করিতে যায়। অধিকাংশ সময়েই কাজটা পণ্ড করিয়া বসে।

তবু রাখিয়াছি—চুরি কাহাকে বলে জানে না। বাসদেওয়ার পূর্বে পাঁচটি চাকরের হাতে কিছু নয় তো গোটা পঞ্চাশ টাকার জিনিস খোয়াইয়া ছোঁড়াটাকে রাখিয়াছি। আজ প্রায় দুই বৎসর আছে, নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়াছি—জামা-কাপড়ের বাক্স খুলিয়া রাখিয়া, টেবিলে খোলা মানিব্যাগ ভুলিয়া গিয়া, শৌখিন জিনিসপত্রের উপর দিয়াও হইয়াছে যাচাই, আংটি, সোনার বোতাম, ওর বয়সের ছেলেকে লুব্ধ করে এই রকম ধরনের খেলনা-জাতীয় কয়েকটা জিনিসও বাড়ি হইতে আনিয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া রাখিয়াছি, চুরি দূরের কথা, একটু ঠাঁই-নাড়াও হয় নাই। তৃণবৎ পরিহার করিয়া গিয়াছে। চাকরের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য আমি দেখি নাই।

সবাই বলে, এটাও ওর আলস্যেরই একটা দিক,—ও চুরি করার হাঙ্গামাও পোহাইতে চায় না।

যাক, সেসব তর্কের কথা তুলিতে চাই না। মোট কথা, বাসদেওয়া চুরি করে নাই, করিবেও না কখনও, বৈরাগ্যেই হউক বা আলস্যেই হউক।

কিন্তু কথা হইতেছে, চাকর, যাহার উপর এতটা নির্ভর করিতে

হয়, এত উগ্র রকম সাধু না হইয়া মাঝে মাঝে মাথার তেলটা-আসটা সরাইয়া একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবার চেষ্টা করে, বেশ একটু স্মার্ট হয়, সেটা কি বাঞ্ছনীয় নয়, একটা সৌভাগ্য নয়? সে তো চুরি করিতেছে না, আমার জিনিস লইয়া নিজেকে আরও ভালভাবে আমারই সেবার উপযোগী করিতেছে। সেটা সে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া করিবে, এটা আশা করি কোন্ বিবেচনায়?

মাকে সেই কথাই বলিবার উদ্দেশ্য আমার।

৩

চুরি না করিলেও অন্য চাকরদের সঙ্গে ও ছোঁড়াটাকেও বেশ ভাল করিয়া একচোট ধমকাইয়া দিলাম। ঘরের চার্জ যখন ওরই উপর, তখন জবাবদিহিটা ওরই তো?

কাঁদিতে লাগিল; হাই তোলার সজলতা নয়, খাঁটি কান্না। কষ্ট হইল; ময়লা, হাঁদাগোবিন্দ-গোছের মানুষটা, ওর পশুর মত নিরীহ নির্বিকার মনের কোথায় যে চোট লাগিয়াছে! বড় কষ্ট হইল। সত্যই তো, ও ফুলেল তেল লইয়া কি করিবে? মাথার মাঝখানে একগোছা জট-পড়া টিকি, তেলের সাধ্য নাই তাহার অন্দরমহলে প্রবেশ করে। বাকিটায় তেলের প্রয়োজন নাই, মই দেওয়া মাঠের মত পরিষ্কার। বাসদেওয়ার মাথায় কখনও চুলের বালাই দেখিলাম না; একটু কালচে হইয়া আসে মাথাটা, অমনই কেহ মরিয়া বসে, আত্মীয়ই হোক কিংবা গ্রাম-সম্পর্কেরই কেহ হোক; আবার মাথাটি যে-কে সেই। কাঁধের উপর যাহার এই রকম একটা অভিশপ্ত মস্তক, সে তেল চুরি করিবে কিসের জন্য? রাখিবে কোথায়?

আরও একটা কথা। চুরি যেদিন হয়, বাসদেওয়া সেদিন ছিল না। তাহার আগের দিনই বিকাল হইতে ছুটি লইয়া কোথায় গিয়াছিল। ধমক দিবার জন্য যখন ডাকিলাম, হাই তুলিয়া সজল চোখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধমক খাইয়া একটি কথা বলিল না; নিস্পন্দভাবে গালমন্দগুলা বোবার মত শুনিয়া গেল। নিরীহ বোকা মানুষ যেমন চাহিয়া থাকে, সেই রকম অপলক বিহ্বল দৃষ্টি, দরবিগলিত ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে। খোকা তাহার হৃদয়হীন ডাক্তারী ভাষায় যাহাই বলুক, কষ্ট হয় অত চোখের জল দেখিলে।

কয়েকদিন গেল। তেল-সাবানের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈচিত্র্য-হীন জীবন আবার নিজের বাঁধা পথে চলিতেছে। আমি ঘরে বসিয়া লিখি, বাসদেওয়া বারান্দায় ঠিক সামনেটিতে বসিয়া ঢুলিতে থাকে। অভাব কম, প্রত্যেক জিনিসই হাতের কাছে, ওকে ডাকিবার বড় একটা দরকারই হয় না। কালেভদ্রে ডাক পড়িলে হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া কাজটা পণ্ড করিয়া দেয়। একটু বৈচিত্র্য আসে—একটু বিরক্তি, বকাবকি। তাহার পর আবার পূর্ববৎ।

ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন বৈচিত্র্য বড় ঘোরালো হইয়া উঠিল। সকালবেলা মুখ ধুইতে যাইব, দেখি, মাজনের টিউবটা নাই। বাসদেওয়া তখনও তাহার বাড়ি হইতে আসে নাই, অন্যান্য চাকরদের জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলে গঙ্গামুখো হইয়া দুই হাত উঁচাইয়া শপথ করিল, তাহারা গত দুই দিন যাবৎ আমার ঘরের মধ্যে যায় নাই, এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কিছু জানে না। গঙ্গা লইয়া শপথ না করিলেও অবিশ্বাসের কথা নয় বড় একটা, দাঁতের মাজন লইয়া করিবেই বা কি উহারা? আনকোরা নূতন টিউব হইলেও না হয় বুঝিতাম, বিক্রয় করিয়া দুইটা পয়সা হাতে আসিবে; প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি খালি তোবড়ানো একটা টিউব।

মাথা যেন গুলাইয়া আসিতে লাগিল। এ যে ডাহা আরব্য উপন্যাসের কাণ্ড দেখিতেছি!

কিন্তু তখনও অনেক বাকি।

কয়েকটা প্রয়োজনে অফিস হইতে টাইপ-রাইটারটা কয়েকদিন হইল বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছি। মাজনের শোকটা কিছু শমিত হইলে একটা চিঠি টাইপ করিতে যাইব, চক্ষু একেবারে চড়কগাছ! স্পুলসুদ্ধ সমস্ত ফিতা একেবারে লোপাট! কালই নূতন স্পুল কিনিয়া আনিয়াছি।

কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও একটা উল্লাস অনুভব করিলাম। চকিত বিদ্যুতালোকে হঠাৎ পথ দেখিতে পাইলে দুর্যোগঘন অন্ধকারে যেমন একটা আনন্দ হয়, অনেকটা সেই রকম। ফিতা যাক, কিন্তু চোর ধরা পড়িয়াছে।

বাড়ির মধ্যে গিয়া বলিলাম, রেবিয়া কোথায়?

গলার স্বর এবং মুখের ভাব দেখিয়া একটা গুরুতর কিছুর প্রত্যাশায় ছেলেমেয়েগুলা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন গিয়া রেবিয়াকে ডাকিয়া আনিল। মা প্রভৃতি অন্যান্য দুই-একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ রেবিয়াকে?

সংক্ষেপে বলিলাম, কিনাবা হয়েছে।

রেবিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছুঁড়ীটার বয়স আন্দাজ নয় বৎসর হইবে। রোগা ডিগডিগে; মিশ কালো; ঢেঙা; ছোট খোকাটাকে ধরিবার জন্য, মাস দুয়েক হইল, রাখা হইয়াছে। পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্য করিতেছি, বাঙালী-বাড়ির ভাত পেটে পড়িয়া মেয়েটা তবতর করিয়া শৌখিন হইয়া উঠিতেছে। তেল, সাবান, ফিতা—সব ওরই কাণ্ড। সাবান আর ফিতার কথাটা আর তুলিলাম না, বলিলাম, কেউ একবার দেখ তো শুঁকে, ও বেটীর মাথায় কিসের গন্ধ।

বড়দের মধ্যে কেহ রাজি হইল না। মা বলিলেন, রক্ষে কর, এইখান থেকেই টেকা যাচ্ছে না, মাথার কাছে নাক নিয়ে গেলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে। কেন, কি ব্যাপার ?

বলিলাম, ও-ই তেল চুরি করেছে আমার।

মা বিস্মিত দৃষ্টিতে রেবিয়ার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি রে রেবিয়া ?

রেবিয়া আকাশ হইতে পড়িল একেবারে। এখানকার নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে মার অভিজ্ঞতা খুব নিবিড়। বলিলেন, তা হ'লে তুই নিশ্চয়ই নিয়েছিস ; তোদের পদ্ধতিই হচ্ছে—যে যত চোর, সে তত বোকা সাজবে।

আমায় প্রশ্ন করিলেন, আরও কিছু গেছে চুরি ?

অগোছালো অসাবধান বলিয়া একটা বদনাম আছেই, সম্প্রতি বাড়িয়াছেও ; চোরাই মাল বাহির হইবে কি না ঠিক নাই, মিছামিছি বাড়াই কেন বদনামটা ? বলিলাম, রামঃ, করলেই হ'ল চুরি ? সে কি রকম ফাঁকতালে খানিকটা তেল সরিয়ে ফেলেছিল। না, তাই বলতে এসেছিলাম ; ও হারামজাদী ভাববে, দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে দিয়ে সরিয়ে ফেললাম, বাবুরা জানতেও পারলে না। খবরদার, খোকাকে নিয়ে যাবার ছুতো ক'রে যদি কখনও আবার ঢুকেছিস আমার ঘরে—

মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল, হঠাৎ ময়লা আঁচলটা তুলিয়া লইয়া ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাকে বলিলাম, দেখলে তো ? সমস্ত ঢঙটি শিখেছে। পাকা হয়ে উঠেছে হারামজাদী। তোমরা বাড়ির মধ্যে সবাই যে রকম অসাবধান, আমি না ব'লে দিলে টেরই পেতে না, বাড়ির মধ্যে একটা চোর গজিয়ে উঠছে। সরাও বেটীকে।

সরাইতে হইল না। তাহার পরের দিন টের পাওয়া গেল, রাত থাকিতেই উঠিয়া নিজের কাপড়-চোপড় লইয়া বেবিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। বাড়িতে খুব একচোট খোঁজ্ খোঁজ্ পড়িয়া গেল। নিত্যব্যবহার্য থালা-ঘটি জামা-কাপড় সব জড়ো করিয়া মিলাইয়া লওয়া হইল। সব মিলিয়া গেল। মা বলিলেন, বোধ হয় ছিল না চোর মেয়েটা রে, মিছিমিছি গঞ্জনা খেয়ে গেল।

হাসিয়া বলিলাম, ব'য়ে গেছে ওর থালা-ঘটির বোঝা বইতে। মেয়েদের তেল, সাবান, মাথার ফিতে, আলতা, চিরুনি সব ঠিক আছে কি না দেখতে বল তো।

সবাই খোঁজ করিয়া আসিয়া বলিল, সব ঠিকই আছে।

একটু অপ্রতিভ হইলাম। সামলাইয়া লইয়া মার দিকে চাহিয়া আবাব হাসিয়া বলিলাম, তা তো থাকবেই; চুরি গেলে তোমরা সত্যি কথা বলবাব পাত্র কিনা!

## ৪

যাহা হউক, কিছু যে লইয়া যায় নাই—এ সামান্য কথাটা কেহ মনে করিয়া রাখিল না। চোর যে আমার চোখে ধূলা দিতে পারে নাই, ধরা পড়িয়াছিল এবং বেগতিক দেখিয়া পিটটান দিয়াছে—এই কথাটাই টিকিয়া গেল। বরাতে একটু গোয়েন্দাগিরির যশ লেখা ছিল আর কি।

দিন দশেক পরের কথা। কয়দিন হইতে মনটা বেশ প্রসন্ন আছে। না থাকাই আশ্চর্য। মাথায় খাঁটি তেল মাখিতেছি, যতটা সাবানের দাম দিয়াছি, নিজের গায়েই উঠিতেছে, সুগন্ধি কলিনস টুথ-পেস্টও অন্য কাহারও দন্তপংক্তিতে হাস্য ফুটাইতেছে না। আরও একটা কারণ

এই যে, বাসদেওয়ার উপর হইতে নিজের এবং অন্য সকলের সন্দেহ বিদুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ছোঁড়াটা সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতা আছে, একটা নিরীহ মানুষের অপবাদ হইতেছিল বলিয়া আমি মনে মনে একটু ক্লিষ্ট ছিলাম। এক সময় যে বকিয়াছিলাম, অযথাই তাহার গ্লানিটা মিটাইয়া দিবার জন্য আজকাল একটু মাঝে মাঝে কারণে অকারণে ডাকিয়া দুইটা কথা কই। চোখে জল গড়াইতে থাকে, কষ্ট হয় দেখিলে।

তাহার পর আবার একদিন স্নানের জন্য তেল লইতে যাইব, তেল নাই। এবারে আবার শিশি পর্যন্ত নাই। কাগজের ঠোঙাটা খালি পড়িয়া আছে। সাবানের ডিবাটাও শূন্যগর্ভ। চিরুনি নাই। বাসদেওয়াকে ডাক দিলাম। বারান্দায় বসিয়া ছিল, আড়মোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে উঠিয়া আসিল। অত্যন্ত রাগ হইল, ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আপাদমস্তক চাবকাইয়া দিই। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলাম, আবার আমার তেল সাবান চুরি গেছে, চিরুনি পর্যন্ত। তোর কাজ। আর তো রেবিয়া নেই যে, তার ঘাড়ে দোষ চাপানো চলবে।

চোখে জল জমিয়াই ছিল, একটা হাই তুলিতে গিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। গলায় আরও একটু ধমকের রুক্ষতা ফুটাইয়া বলিলাম, চুপ ক'রে রইলি যে? উত্তর দে।

উত্তর কিছুই দিল না, বেত্রাহত অবোধ পশুর মত দীন নয়নে মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। অতখানি উপচাইয়া পড়িবার পরও জল ছলছল করিতেছে চোখে। নূতন ক্ষতির জ্বালা সত্ত্বেও মনটা কেমন যেন মোচড় দিয়া উঠে, সন্দেহ হয়, খোকা যা বলে সত্যই কি

তাই ? এতখানি জল একটা শিরার উপর চাপের পরিণাম মাত্র ? না, নিরীহের একমাত্র সম্বল ব্যথার অশ্রু ?

কিছু বলি না, ভাবি, দেখাই যাক না আরও দুই-একটা দিন।

অত অপেক্ষা করিতে হয় না। দরজী আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; দুয়ারের জন্য পর্দা কিনিয়া আনিয়াছি, সেলাই করিয়া তাহাতে রিং ফিট করিয়া দিতে হইবে। রুলির আকারে পাঁচটা গিল্‌টি-করা পিতলের রিং কিনিয়া আনিয়াছি।

কাপড় মাপিয়া বুঝাইয়া দিলাম ; রিং দিতে যাইব, রিং নাই।

বাসদেওয়াকে ডাকিলাম না ; কি রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়িয়াছি, না ডাকা পর্যন্ত রাগ থাকিবে, সামনে আসিলেই মমতা আসিবে। আরও দুই-চারি দিন পর্যবেক্ষণ করিয়া সন্দেহটা—

একটু যেন এখানে ওখানে খুঁজিবার চেষ্টা করিয়া, সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া দরজীটাকে বলিলাম, ও, আনাই হয় নি যে কিনে রিংগুলো। এতক্ষণে মনে পড়েছে। তুই এখন যা, বিকেলে একবার আসিস।

আহার করিবার সময় মা বলিলেন, তুই যেন খুব কি একটা ভাবছিস, ব্যাপার কি বল্ তো ?

ভাবিতেছিলাম, শৌখিন দাঁতের মাজনও লয়, টাইপ-রাইটারের ফিতাও লয়, আবার পর্দার রিংও লয়, এমন অভিনব চোরের উদ্ভব হইল কোথা হইতে ?

কিন্তু গোয়েন্দাগিরির জন্য একবার যশ লইয়াছি, এই নূতনতর অভিজ্ঞতাব কথা আর মুখ ফুটিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

অফিসের প্যাণ্ট শার্ট পরিয়া টাই পরিতে গিয়া দেখি, বিলাতী সোনার টাই-পিনটা নাই।

রাগের চোটে বোধ হয় পূর্বসঙ্কল্প ভুলিয়া বাসদেওয়াকে ডাক দিয়া

ফেলিতাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি অফিসে চলিয়া গেলাম।

সেখানে গিয়া একটু পরে মাথাটা ঠাণ্ডা হইলে ভাবিয়া দেখিলাম, কি অন্যায় কাজটাই না করিতে যাইতেছিলাম! মেজাজের যে রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, যদি সামনে আসিয়া দাঁড়াইত বাসদেওয়া তো ওকে আর আস্ত রাখিতাম না। অথচ নেহাত সর্বদা সামনে থাকার দরুন সবচেয়ে বেশি সন্দেহভাজন হইয়া পড়িলেও ওর আসল দোষটা কি? এসব শৌখিন জিনিস লইয়া ও করিবে কি? বিক্রয় করিয়া পয়সা করিবে? তাহা হইলে রিস্টওয়াচ, কলম—এইগুলার তো আগে যাইবার কথা।

সুস্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিতে গিয়া আরও একটা কথা মনে পড়িল, খুব সঙ্গত একটা কথা। হাতের কাছে পাইয়া এই ছোঁড়াটার উপরই সব সন্দেহ ক্রমে কেন্দ্রীভূত হইযা পডিতেছে বলিয়াই বোধ হয় আসল অপরাধী চোখে ধূলা দেওযার আরও সুযোগ পাইতেছে। যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই কথাটার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম। কয়েক রকম কেশতৈল, দুই-তিন বাক্স সাবান, আরও কয়েকটা শৌখিন দ্রব্য কিনিয়া কোনটা টেবিলে, কোনটা আলমারিব মাথায়, কোনটা কুলুঙ্গিতে, কোনটা বা ঘডির ব্র্যাকেটে রাখিয়া দিলাম একটু হেলাফেলা করিয়া— চার ছডাইয়া রাখার মত আর কি।

কর্মস্থানে যাইবার সময় ঘরে আর চাবি দিয়া গেলাম না, বাসদেওয়াকে বলিলাম, একটু নজর রাখিস, তবে ঠিক পাহারা-দেওয়া-গোছের নয়। গোয়েন্দাগিরিতে তাহাকেও দলে টানিলাম।

তাহার পর বাহ্যিক উদাসীনতার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে ইস্তক বুড়ী

দাসীটার গতিবিধির উপর পর্যন্ত সতর্ক নজর রাখিতে লাগিলাম। বাসদেওয়াকে বলিলাম, যে কেউ এসে ঘোরাফেরা করুক না কেন, একটু আড়ালে স'রে গিয়ে নজর রাখবি।

ফল পাওয়া গেল নিতান্ত অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে।

একদিন সকাল সকাল কর্মস্থান হইতে ফিরিতেছি, দেখি, ঝি মাগী আমার ঘরের বারান্দা হইতে নামিয়া হনহন করিয়া অন্দর-বাড়ির দিকে যাইতেছে। ঘরে তালা দিয়া তো যাইই নাই, আজ হঠাৎ অতর্কিতে আসিয়া পড়িব ঠিক ছিল বলিয়া শিকলও দিয়া যাই নাই, হাট আদুড় হইয়া আছে। অন্যান্য দিন বাসদেওয়া বারান্দার থামে ঠেস দিয়া ঢোলে, আজ সেও নাই।

অত্যন্ত কৌতূহল হইল। ঝিয়ের মুখটা পাশ হইতে যতটুকু লক্ষ্য করতে পারলাম, খুব প্রসন্ন যেন।

নিষুতি দুপুরবেলা, বাসদেওয়া পর্যন্ত নাই, ঝি আমার ঘরের দিক হইতে প্রসন্ন মনে তাড়াতাড়ি অন্দর-বাড়ির দিকে চলিয়াছে— ব্যাপারখানা কি? ঘরের দিকে না গিয়া বেশ দূর হইতে অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিলাম। পায়ে ক্রেপ-সোলের জুতাই ব্যবহার করিতেছি কয়দিন হইতে—এই কাজের জন্যই; অসুবিধা হইল না। ঝি স্ফূর্তির চোটে এত নিশ্চিন্ত যে একবার ঘুরিয়াও দেখিল না। অবশ্য আমি বেশ দূরেই ছিলাম।

বাড়ির ভিতরে যাইতে হইলে দুই দিকে দুইটা ঘর পড়ে, তাহার মাঝখান দিয়া একটা গলি-গোছের, সেইটাই একটু বাঁকিয়া উঠানে গিয়া পড়িয়াছে। গলির মধ্যে পা দিতেই একটা উগ্র গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল যেন, নাকটা সতর্কই ছিল, দুইবার নিশ্বাস টানিতেই বুঝিলাম, আমার দাঁতের মাজন—কলিনস টুথ-পেস্টের ঝাঁজালো গন্ধ।

কি রকম একটা অদ্ভুত উল্লাস,—ধরিয়াছি! কেন জানি না, আপনিই পা দুইটা যেন একটু দাঁড়াইয়া পড়িল—বোধ হয় 'অটোম্যাটিক অ্যাক্‌শন' অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত স্নায়বিক ক্রিয়া, যাহার বশে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপাইবার পূর্বে বাঘ হঠাৎ নিজেকে একটু গুটাইয়া লয়—মুহূর্তমাত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে পা চালাইয়া দিলাম।

তারপর গলির মোড়টা ঘুরিয়া উঠানে পড়িয়া একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

দেখি, মেয়েছেলেরা যে যেদিকে সুবিধা পাইতেছে, ত্বরিত পদে সরিয়া পড়িতেছে। ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করিলাম;—আমি মনে করিয়াছি, আমার অনুগমনটা ঝি টের পায় নাই, মেয়েছেলেদের যে পিছনেও দুইটা করিয়া চক্ষু থাকে, সেটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। টের পাইয়াছিল ঝি, আর আমি প্রবেশ কবিবার পূর্বেই সকলকে চাপা গলায় বা ইশারায় জানাইয়া দিয়াছে। একটা কি জটলা হইতেছিল, হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে আবার যে সব গুলাইয়া যায়! ঝি আমার ঘর হইতে একটা কিছু চুরি করিয়া আনিতেছে—এ অনুমানটা মিথ্যা তাহা হইলে! অথচ গন্ধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আরও, শুধু কলিনস দাঁতের মাজনের নয়, একবার কলিনসের, একবার আমার ফুলেল তেলের, একবার যেন আমার ব্যবহারের সাবানের, এক-একবার সব মিশিয়া যাইতেছে—আমার ঘরে মাঝে মাঝে যেমন একটা মিশ্র গন্ধ উঠে।

কিন্তু লোক কোথায়? ঝি তো আমি প্রবেশ করিবার পূর্বেই বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে। খুব বেশি রকম অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত রাগ হইল, খুব কড়া গলায় ডাক দিলাম, বন্‌শীকে মায়!

আমার সামনেই, বারান্দার কোণের জোড়া থামটার ওদিকে ঠুং

করিয়া একটু শব্দ হইল। অগ্রসর হইতেই একেবারে থ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

একটি প্রায় বছর এগারোর মেয়ে ভয়ে জড়সড় হইয়া প্রায় থামের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। ফুটফুটে মেয়েটি। মাথার ব্রহ্মতলে কলসীর কানার মত এদেশী খোঁপা, কপালের চুলগুলা কি একটা চটচটে মসলা মাথাইয়া উপর দিকে টানা, মাঝখানে একগাদা মেটে সিঁদুর, কপালের মাঝখানে খুব বড় একটি টিকুলি, চোখে কাজল—কনে-বউ।

কনে-বউয়ের খোঁপায় আমার টাইপ-রাইটের ফিতা, খোঁপার সামনে ঠিক মাঝখানটায় আমার চৌদ্দক্যারেট সোনার টাই-পিনটা ঝিকঝিক করিতেছে, গালার চুড়ির সঙ্গে এ হাতে দুইটি ও হাতে দুইটি গিল্‌টি-করা পিতলের বালা—আমায় পর্দার রিং, কোন ভুল নাই তাহাতে। সামনে আসিতে জবজবে করিয়া চোবানো মাথা হইতে আমার ফুলেল তেলের গন্ধ ভুরভুর করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, আমার সাবানের গন্ধও পূর্বের চেয়ে স্পষ্ট। আমার দাঁতের মাজনের মিঠে গন্ধ, সেটা এত স্পষ্ট হয় কি করিয়া? কোন্ সেই সকালে দাঁত মাজিয়াছে!

নাকের খাঁজের কাছে একটা সাদা দাগ দেখিয়া ব্যাপারটার কিনারা হইল; আমার দাঁতের মাজনটার পদোন্নতি হইয়াছে, সেটা হইয়াছে ফেস-ক্রীম। সমস্ত মুখটা এই নবপ্রবর্তিত বদন-প্রসাধনে চর্চিত হইয়া যেন জ্বলজ্বল করিতেছে।

আমার ভগ্নী প্রথমে সাহস করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল। বলিল, তোমার বাসদেওয়ার বউ, মেজদা। কি চমৎকারটি! নতুন বাপের বাড়ি থেকে এসেছে, বাসদেওয়া গওনা ক'রে নিয়ে এসেছে।

সমস্ত শরীর পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইতেছিল। নিজেকে খুব সংযত করিয়া নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

অন্যান্য সকলেও ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বোন বলিল, বাঁদরের গলায় মোতির মালা হয়েছে! পোড়াকপালীকে ওই বুনোর পাশে কেমন মানায় দেখবার জন্যে ঝিকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলাম ছোঁড়াকে, তা কোনমতেই এল না, কোথায় যে গিয়ে লুকিয়েছে!

বড় বোন বলিল, তা হোক বুনো, কিন্তু যত্ন-আত্তি আছে বাপু, সুখে রাখবে। এর মধ্যেই মাথার জন্যে শৌখিন ফিতে কিনে দিয়েছে, নীচের হাতে গিল্‌টির বালা দিয়েছে, ব্যাভার জানুক না জানুক চমৎকার একটি সেফটি-পিন দিয়েছে—একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়েই তো?

নিষ্ফল আক্রোশে প্রায় চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে আমার।

ছোট বোন বলিতেছে, সে যশটুকু দিতে হয় বইকি। মাথার জন্যে তেলও কিনে দিয়েছে। তোমার তেলের মত কতকটা গন্ধ, নয় মেজদা?

বলিলাম, মিছে বকিস নি; আমার তেল ও কোথা পাবে?

এই বাসদেওয়ার হইয়াই বাড়ির সকলের সঙ্গে সেদিন পর্যন্ত বচসা হইয়া গিয়াছে। গোয়েন্দাগিরির যশ লইয়া নিরীহ রেবিয়াকে তাড়াইয়াছি, তাহার অভিশাপটা মাথার উপর। অন্তরে অন্তরে যতই দগ্ধ হই না কেন, শুধু ওই তেল নয়, ও ফিতাও যে আমার টাইপ-রাইটারের, ও বালাও যে আমার পর্দার, ও সেফটি-পিনও যে আমারই কণ্ঠভূষণ—এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার কি আর পথ রাখিয়াছি?

# কাব্যের মূলতত্ত্ব

টিফিন-পিরিয়ডের ঘণ্টাখানেক পরে বাংলার পণ্ডিত দেবকণ্ঠবাবু অসুস্থ হইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন।

একেবারে অভাবনীয় সৌভাগ্য। সেকেণ্ড পণ্ডিতের কোষ্ঠীতে যে আবার অসুখে পড়া লেখা আছে, যতদূর মনে পড়ে, সাত-আট বৎসরের পাঠ্যজীবনে এ অভিজ্ঞতা আমাদের এই প্রথম। তাও এমন সুবিবেচনার সহিত অসুখে পড়া যে, মনটা আপনি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া পড়ে। আজ সপ্তম ঘণ্টা অর্থাৎ শেষ ঘণ্টায় ছুটি,—হেডপণ্ডিত মহাশয়ের অ্যাডিশনাল ক্লাস, তিনি বোসপাড়ায় শ্রাদ্ধ করাইতে গিয়াছেন। এখন দুইটি ঘণ্টা একসঙ্গে ছুটি পাওয়া যাইবে। সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের এই একটি দিনের সুবিবেচনার জন্য আমাদের বরাবরের পুঞ্জীভূত আক্রোশ একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল।

পঞ্চম ঘণ্টার পরে আমরা সব ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেরা মুখ যতদূর সম্ভব বিষণ্ণ করিয়া আপিস-ঘরে হেডমাস্টারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মুখপাত্র হিসাবে আমি মুখটা যতটা পারা গেল অন্ধকার করিয়া বলিলাম, সার্, সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাস—

হ্যাঁ, ঠিক, মনেই ছিল না; কখনও তো পড়েন না ভদ্রলোক অসুখে কিনা— তাই তো! আবার হেডপণ্ডিত মশাইও গরহাজির, তিনি থাকলেও বা তোমাদের বাংলাটা পড়িয়ে দিতে পারতেন।

হেডমাস্টার মহাশয়ের দুশ্চিন্তায় আমার মুখটা আরও বিষণ্ণ করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার নিজের মুখের কথা বলিতে পারি না, তবে দেখিলাম, এইরূপ অমানুষিক চেষ্টার ফলে, কৃত্রিম বিষণ্ণতার পাশে

ভিতরের অকৃত্রিম পুলক ঠেলা মারিয়া আসিয়া, হরার মুখটা এমন বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে, দেখিলে না হাসিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া পড়ে। বিলাস তো বাংলার শোকে ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসই ফেলিয়া বসিল। ওর নিয়ম, সকলে কি করে, সেটা প্রথমে লক্ষ্য করিবে, তাহার পর সকলের উপর টেক্কা দিয়া একটা কিছু করিবে।

ঘরে বসিয়া ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার, মৌলবী সাহেব আর কেরানী অটলবাবু। হেডমাস্টার বলিলেন, অটলবাবু. তা হ'লে আপনিই না হয়—

আমায়ই যেতে হবে ?—বলিয়া দলটির পানে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাঁহার চোখ পড়িল হেডমাস্টারের চেয়ারের পিছনে বলাইয়ের উপর ; সে প্রবল মিনতির সঙ্কেতস্বরূপ কোলের কাছে হাত দুইটি একত্র করিয়া ঘষিতেছে।

অটলবাবু ঠোটে একটা হাসি চাপিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, যেতে আপত্তি নেই, তবে মাইনের বিলটা তা হ'লে কাল তোয়ের হওয়া মুশকিল, বড্ড কাটাকাটি কিনা এ মাসে -

হেডমাস্টার ব্যস্তভাবে বলিলেন, না না, তবে থাক্, পরশু ইন্সপেক্টার আসবে, ঠিক সময় মইনে পায় নি সব দেখলে আবার—

অটলবাবু একবার বলাইয়ের দিকে চাহিলেন, সে সঙ্গোপনে অঞ্জলিবদ্ধ হাতটা তুলিয়া আর ওদিকে মাথাটা একটু নামাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

হেডমাস্টার বলিলেন, তবে আর উপায় কি ? তোমরা যাও। ছুটি তো খোঁজই সব। একটু ক্ষতি হ'ল, তা যাক, বাংলা তো !

অস্বাভাবিক বিষণ্ণতায় দম বন্ধ হইয়া যাইতেছিল যেন, ঠেলাঠেলি করিয়া দুয়ারের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় বিলাস হতভাগা বাদ সাধিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধি তো হইয়াই গিয়াছে, ফাঁকতালে খানিকটা

যশ অর্জন করিয়া লইবার জন্য মুখটা আবার একচোট বিষণ্ণ করিয়া লইয়া মুরুব্বিয়ানার চালে বলিল, নেহাত উপায় নেই তাই, নইলে বাংলা কি আর তাচ্ছিল্য করবার জো আছে সার্? কি রকম ফেল করছে আজকাল বাংলাতে! বরং আজ হেডপণ্ডিত মশাই আসেন নি, যদি দুটো ঘণ্টাই বাংলা হ'ত—বাঙালীর ছেলে হয়ে—

কয়েকজন একসঙ্গে বিলাসের জামার খুঁট ধরিয়া টানিলাম। সে থামিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার একটু চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িলেন, তাহার পর বলিলেন, তা বলেছ ঠিক। তা হ'লে—

আমরা সবাই শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে হেডমাস্টার হঠাৎ মাথা তুলিয়া সেকেণ্ড মাস্টারের দিকে চাহিলেন; একটু হাসিয়া বলিলেন, এই তো কালীবাবু রয়েছেন। কি মশাই, আপনার মতে তো ম্যাথেম্যাটিক্স-জানা লোকের কিছু আটকাবার কথা নয়, দেখবেন নাকি একবার চেষ্টা ক'রে? আপনার এ ঘণ্টা তো ফুরসুৎও আছে।

পিছনে বিলাসের চারিধারে দাঁতে দাঁত ঘষার একটা উৎকট আওয়াজ হইল। হেডমাস্টার মহাশয় ঘুরিয়া চাহিতেই হরা সঙ্গে সঙ্গে মুখটা প্রসন্ন করিয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে বেশ হয় সার্।

সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয়ের চেহারাটা বেশ মনে আছে, মোটাসোটা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। দর্প, প্রসন্নতা এবং দাড়িতে ভরা মুখমণ্ডল; দেখিলে ভয়, শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া আসে। সর্বদাই ভাল করিয়া কাচা এবং ইস্ত্রি-করা একটি কামিজ গায়ে। গলায় কোঁচানো চাদর দুই কাঁধের উপর দিয়া বুকের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে বিশাল বক্ষটিকে আরও বিশাল বলিয়া বোধ হইত। মাস্টার মহাশয়ের

একটা অভ্যাস ছিল, প্রায়ই চাদরের কোঁচানো প্রান্ত দুইটি দুই হাতে মাঝামাঝি আনিয়া তাহাদের মুখ মিলাইয়া আবার ছাড়িয়া দিতেন। বোধ হয় কোন দিকে বেশি, কোন দিকে কম ঝুলিয়া থাকা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। জিনিসটাকে আমরা মাস্টার মহাশয়ের ম্যাথেম্যাটিক্যাল জিম্‌ন্যাস্‌টিক্স বা অঙ্কের কসরৎ বলিতাম।

এই অঙ্কই ছিল তাঁহার দর্প।

দর্পের মূলে ছিল দুইটি কথা। এক, তাঁহার নিজে শক্তির উপর প্রবল আস্থা,—অবশ্য শক্তিও ছিল অবিসংবাদিত ; আর দ্বিতীয়, শাস্ত্রটার উপর তাঁহার অটুট নিষ্ঠা।

সেকেণ্ড মাস্টার বলিতেন, সমস্ত সৃষ্টিটা বিধাতার কষা একটা অঙ্ক মাত্র। আমাদের ধর্মে যে বলে, এটা তাঁর ধ্যানের পরিণাম, এ কথাও যেমন ভুল, খ্রীষ্টান-মতের খামখেয়ালী ইচ্ছাব থিয়োরিটাও ঠিক তেমনই ভুল। তারা যে বলে—ভগবান বলিলেন, জল হউক, আর অমনই জল হইল, এ কথার কোন মানে হয় না। গণিতধর্মী সৃষ্টির কোন গাণিতিক প্রয়োজনের জন্যই ভগবানকে জল সৃজন করিতে হইয়াছিল এবং তাহা করিতে হইয়াছিল নিখুঁত অঙ্কের হিসাবে যথাপরিমাণ অক্সিজেনের সহিত যথাপরিমাণ হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিয়া। ইহাতে যদি একটুও ভুল হইত তো ধ্যানই বল, কিংবা খামখেয়ালী ইচ্ছাই বল, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও জলের জন্ম হইত না।

সৃষ্টির মূলতত্ত্ব গণিত বলিয়া মাস্টার মহাশয়ের মতে এর সব রহস্যের কুলুপই এক গণিতের 'মাস্টার কী' বা রাম-চাবি দিয়া খোলা যায়। ধর্ম—অঙ্ক, সঙ্গীত—অঙ্ক, ইতিহাস-দর্শন—অঙ্ক, ব্যাকরণ—অঙ্ক।

আজ টিফিন-পিরিয়ডেই একচোট ঘোর তর্ক হইয়া গেল। সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয় বুকের উপর চাদরের দুই প্রান্ত মিলাইয়া ধরিয়া

বলিতেছেন, অঙ্কের ভেতরই কি নেই মশাই? আর অঙ্কের বাইরে আছেই বা কি? নিউটন অঙ্কের একটি খুঁট ধ'রে টান দিলেন, সামান্য একটি ফল-পড়া নিয়ে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির সারা রহস্য ফরফর ক'রে বেরিয়ে এল। আপনারা কালিদাস কালিদাস করেন, ভাবলাম, একবার দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কি? সেদিন মেঘদূত পড়ছিলাম, ভেবে সারা হচ্ছিলাম, আপনারা ওতে ভাবে এলিয়ে পড়বার মত কি পান এত? ও তো একেবারে খাঁটি অঙ্কের হিসেব,—কি রেটে গেলে, কোথায় থামলে, কোন্ সময়ে কি ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে করতে যাবে, তার নিক্তি দিয়ে ওজন-করা হিসেব। অ্যাল্‌জেব্রার গ্রাফের এমন সুন্দর উদাহরণ দেখাই যায় না। যক্ষরাজ যেন একটি সুন্দর টাইম-টেব্‌ল ছ'কে দিয়েছে। বলুন, ম্যাথেম্যাটিক্স নয়? খোলের আওয়াজ একটু কানে গেলে ভাবের ঘোরে মূর্চ্ছা যান সব; বলুন তো, বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্বটা কি? শ্রীকৃষ্ণ কড়ে-আঙুল দিয়ে গোবর্ধন পাহাড়টা তুলে ধরলেন,—পিওর ব্যাল্যান্সিং, ভার-সাম্যতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা। যদি রূপক হিসেবে ধরেন তো ওই একই কথা, অর্থাৎ ম্যাথেম্যাটিক্স ছিল শ্রীকৃষ্ণের কড়ে-আঙুলের ডগায়। আর একটু এগিয়ে যান, শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান ব'লেই ধ'রে নিন—মানেটা কি হ'ল? এই নয় কি যে, সর্বশক্তিমান ভগবানের মূলশক্তি হচ্ছে ম্যাথেম্যাটিক্স? সর্বশক্তির গোড়ায় অঙ্ক? সব চুপ ক'রে রইলেন যে?

২

সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয় বলিলেন, তা হ'লে, সত্যি আমায় যেতে হবে নাকি? তবে তোমরা এগোও, আমি আসছি; হ্যাঁ, কম্পাস, চকখড়ি আর আপিস থেকে গজের ফিতেটা নিয়ে যেও।

আমরা যাইবার জন্য ঘুরিয়া আবার আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। অনাথ ভয়টা আর চাপিতে পারিল না, শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আবার অঙ্ক করাবেন নাকি সার্?

মাস্টার মশায় হাসিয়া বলিলেন, কেন, সাহিত্য কি অঙ্কের বাইরে?

হতভাগা বিলাস! আমরা এদিকে দারুণ নিরাশায় মুষড়িয়া পড়িয়াছি, আর সে স্বচ্ছন্দে মুখে হাসি টানিয়া আনিতে পারিল! বলিল, অঙ্ক আর পদ্য যে আলাদা জিনিস, আমি এই প্রথম শুনলুম সার্। তা ছাড়া অঙ্ক আগে, না, পদ্য আগে? পদ্য তো সেদিন বাল্মীকি এক দুই ক'রে অক্ষর গুনে রচনা করলেন।

ডেঁপোমির গন্ধ ছিল বেশ একটু, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার অঙ্কের পরিপোষক বলিয়া সেকেণ্ড মাস্টার চটিলেন না; বরং হেডমাস্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ছন্দ যে অঙ্ক—এ কথা বলেইছি আপনাকে কতবার। 'না' বলবার জো নেই। তোমরা চল।

বারান্দা হইতেই একটু একটু করিয়া অসন্তোষের গুঞ্জন আরম্ভ হইল এবং সকলে ক্লাসে ঢুকিলে সেটা রীতিমত গোলমালে দাঁড়াইল। লক্ষ্য সবার একা বিলাস। ইডিয়ট, কে তোকে মুরুব্বিয়ানা করতে বলেছিল র‍্যা? ওঃ, বাংলার জন্যে ওঁর প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠল! শুভঙ্করী বাল্মীকির কত আগে র‍্যা বিলাস? আজ ফুটবল খেলার সময় সামনে একবার আসিস বিলে, সাহস থাকে তো, যেখানে শুভঙ্কর আছেন, সেইখানে পাঠিয়ে দোব। ওর তো সময় থাকবে না, ও যে সেকেন মাস্টারের সঙ্গে হুঁকো টানতে টানতে—

বিলাস প্রথমটা অপরাধীর মত মুখ বুজিয়া রহিল, তাহার পর আঘাতে আঘাতে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়া উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় দুই হাতে চাদরের খুঁট মুঠা করিয়া ধরিয়া সেকেণ্ড মাস্টার

প্রবেশ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কই, কি আছে তোমাদের, নিয়ে এস।

বিলাস তৃতীয় বেঞ্চ হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, পদ্য সার্।

হরা চাপা গলায় ব্যঙ্গকটু স্বরে বলিল, বল্ পদ্যাঙ্ক।

বিলাস দুষ্টামি করিয়া তাহার দিকে মুখ ঘুরাইয়া উঁচু গলায় প্রশ্ন করিল, কি বলতে বলছিস ?

হরা ভয়ে প্রথমটা হকচকিয়া গেল, তাহার পর দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেকেণ্ড মাস্টারের দিকে চাহিয়া বলিল, পদ্য আছে সার্। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'।

তাহার পর হাত দিয়া নিজের বইয়ের গোছাটা নীচে ফেলিয়া কুড়াইবার অছিলায় ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে দুইটা হাত জোড় করিয়া বিলাসের দিকে চাহিয়া রহিল। বিলাস আস্তে আস্তে বলিল, ওঠ্, আর কখনও করিস নি।

সেকেণ্ড মাস্টার প্রসন্নভাবে ক্লাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পলাশীর যুদ্ধ—ব্যাট্‌ল অব প্ল্যাশী ? অনাথ, কোন্ সালে হয়েছিল, বলতে পার ?

হরা আস্তে আস্তে বলিল, এতেও অঙ্কের গন্ধ পেয়েছে।

অনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, ১৭৫৭, সার্।

সেভেনটিন ফিফ টি-সেভেন,—বেশ, কোন্ সেন্‌চুরি হ'ল ?

অনাথ চুপ করিয়া রহিল। সেকেণ্ড মাস্টার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিছনের বেঞ্চে ভবেশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি, কবি ?

ভবেশ কবিতা লেখে বলিয়া একটু বিশেষভাবে সেকেণ্ড মাস্টারের লক্ষ্যস্থল। বলিল, আজ্ঞে, সপ্তদশ শতক।

তা তো হবেই ; ১৭৫৭ সতরো শতাব্দী না হয়ে যায় কোথায় ? আবার সপ্তদশ শতক ! ভাষার জলুস দেখ না ! তুমি যে এর মধ্যে 'শতদল' কি 'কিশলয়' এনে ফেল নি, এই আমার বাবার ভাগ্যি ! তুমি, শৈলেন ?

বলিলাম, অষ্টাদশ শতাব্দী সার্।

কেন বলতে পার ? এদিকে তো ১৭৫৭, অষ্টাদশ শতাব্দী হ'ল কি ক'রে ?

রহস্যটা জানা ছিল না, চুপ করিয়া রহিলাম।

তোমরা বাপু এসেছ মহাকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়তে, অথচ এদিকে ১৭৫৭ কোন্ সেন্চুরি হ'ল জান না ; যদিই বা জান এক-আধজন তো কি ক'রে হ'ল বলতে পার না। তোমরা কাব্যটার কি ছাই রসগ্রহণ করবে, শুনি ?

আমরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম ; অনেকে লজ্জায়, অনেকে আবার পরস্পরের পানে আড়চোখ চাহিবার সুবিধার জন্য।

হয়েছে, আর লজ্জা দেখাতে হবে না, লজ্জা পাবার কথা তো বেচারী নবীন সেনের, তোমাদের মত পাঠকের হাতে প'ড়ে যাঁর নাকালের অন্ত নেই। যীশুখ্রীষ্ট কতদিন পূর্বে জন্মেছিলেন, বলতে পারেন বলাইবাবু ?

বলাই পাখার দড়ির দিকে চাহিয়া রহিল।

তুমি, অনাথ ? ইংরজী এটা কত সাল ?

উনিশ শো বারো সার্।

তা হ'লে ?

উনিশ শো বারো বছর পূর্বে জন্মেছিলেন সার্।

অর্থাৎ—

চকখড়িটা হাতে লুফিতে লুফিতে মাস্টার মহাশয় উঠিলেন এবং

বোর্ডে গিয়া পড়িয়া পড়িয়া লিখিলেন, উনিশ শো বারো মাইনাস উনিশ শো বারো—ইজ ইয়োল টু জ়িরো। অর্থাৎ ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার ক্লাসের দিকে চাহিলেন সকলেই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া বোর্ডের ১৯১২—১৯১২-র বিয়োগফল শূন্যটার পানে শূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয়, বোধ হয়, কাব্যটা অঙ্কের জটিলতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া প্রসন্নভাবে স্মিতহাস্য করিলেন, তাহার পর শূন্যটার দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, অর্থাৎ এই জিরো হ'ল স্টার্টিং পয়েণ্ট, এইখান থেকে হিসেবের শুরু। অর্থাৎ ?

আমরা ক্রমেই ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। যাহারা একটু-আধটু বুঝিতেছিলাম, সাহস করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না। মাস্টার মহাশয় আরও প্রসন্নতার সহিত হাস্য করিলেন।

অর্থাৎ এই শূন্য থেকে এক শো বছর পর্যন্ত হ'ল প্রথম সেন্‌চুরি, এক শো থেকে দু শো বছর হ'ল—

প্রায় সমস্ত ক্লাস হইতে মুক্তকণ্ঠের একটা আওয়াজ উঠিল, দ্বিতীয় সেন্‌চুরি সার্।

বুঝেছ তো ?

বিলাস বলিল, একেবারেই জল হয়ে গেছে সার্।

টুকে নাও।

এ কথাটা মাস্টার মহাশয়ের একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল প্রতিদিন পাঁচ-ছয় পিরিয়ড করিয়া অঙ্ক কষাইতে কষাইতে। টুকিবার কিছু না থাকিলেও আমরা খাতার উপর একটু পেন্সিল চালাইয়া, অতঃপর কি বলেন শুনিবার জন্য আবার মাস্টার মহাশয়ের দিকে চাহিলাম।

মাস্টার মহাশয় বলিলেন, তোমরা যুদ্ধের কাহিনী পড়তে যাচ্ছ, কিন্তু

জেনে রেখো, কাব্য পড়া মাত্রই একটা যুদ্ধ করা ;—শুধু কাব্য বলি কেন, যে কোন জিনিস পড়াই যুদ্ধ করা। কোন একটা জিনিস বোঝা মানেই সেই জিনিসটাকে আয়ত্ত করা অর্থাৎ জয় করা। তোমরা এ ক্ষেত্রে নবীন সেনের কাব্য—'পলাশীর যুদ্ধ' আয়ত্ত করতে যাচ্ছ, তার রস উপলব্ধি করবে ব'লে, এই তো? এই যে কাব্যের বিরুদ্ধে বিজয়-অভিযান, এতে তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র থাকা চাই তো? এখন, সে অস্ত্র কি? তুমি? তুমি? ভবেশ?

ভবেশ ডেস্কে হাত দুইটার উপর ভর দিয়া সামনে একটু ঝুঁকিয়া বলিল, হৃদয়রূপী—

ব'স বাপু, আমি জানি, তুমি সোজা ব্যাপারটিকে জটিল না ক'রে ছাড়বে না। বিলাস?

অঙ্ক সার্।

অঙ্ক। তবে শুধু অঙ্ক নয়, ইতিহাস ভূগোল সবই আছে, এই সমস্ত জিনিসের জ্ঞানই হ'ল তোমার অস্ত্র।

বিলাস বলিল, ইতিহাস ভূগোলও তো অঙ্ক থেকে আলাদা নয় সার্!

নয়ই তো। এইবার মনে হচ্ছে, যেন তোমরা কতক কতক বুঝেছ। পড় দেখি পদ্যটা এইবার।

৩

বিলাসেরই দিন আজ। আবার আবার সেই কামান গর্জন— বলিয়া অ্যাক্‌টিঙের ঢঙে আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, সেকেণ্ড মাস্টার বাধা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কামান-গর্জন থামাও একটু। বলি, রণক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন একটা ধারণা ক'রে নিয়েছ আগে?

ক্লাসে একটা চাপা আক্রোশের হাসি উঠিল। বিলাস থামিয়া গিয়া অপ্রতিভভাবে বলিল, না সার্।

তা করবে কেন? তাতে যে অঙ্কের গন্ধ আছে একটু। অথচ যিনি লিখেছেন, তাঁকে সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রটি মগজের মধ্যে রেখে তবে এই যুদ্ধের ইতিহাসটি পদ্যে বর্ণনা করতে হয়েছে।

সেকেণ্ড মাস্টার উঠিয়া গিয়া বোর্ডের গায়ে উঁচু দিকের ফলাটা নির্দেশ করিয়া একটি তীর আঁকিলেন, এবং ফলার মুখে একটি ইংরেজী 'N' অক্ষর বসাইয়া দিলেন। কে একজন চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, ওটা আবার কেন?

হরা সেইরূপ স্বরে উত্তর করিল, বাংলা সাহিত্যের জন্যে শক্তিশেল।

সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন, এটা হ'ল উত্তর দিক।

তীরের সমান্তরালে আর একটি দাঁড়ি টানিলেন, বলিলেন, ভাগীরথী। এবং দাঁড়িটির উভয় প্রান্তে মাঝে একটু জায়গা ছাড়িয়া দুইটি চতুষ্কোণ ঘর আঁকিলেন, একটির মাঝখানে লিখিলেন—'ইং', অপরটির মাঝখানে 'ন', তাহার পর অনাথের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কিছু বোধগম্য হচ্ছে অনাথবাবুব?

আজ্ঞে হ্যাঁ সার্, এদিকটা হ'ল নবাবের সৈন্য। আর এদিকটা ইংরেজের।

কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সব? তালগোল পাকিয়ে?

আজ্ঞে না সার্।

তবে?

অনাথ প্রশ্নটার অর্থ কি এবং কি ধরনের উত্তর চাহেন, তাহার কোনও হদিস না পাইয়া হতাশভাবে বোর্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

খুব বুঝেছ সব। তুমি? তুমি? ইউ? তুমি, শৈলেন?

আমি মুখটা ফেকাশে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, আকুলভাবে বোর্ডের সেনাবাহিনীর দুই কক্ষের দিকে চাহিলাম। তাহার পর তীরের ফলায় নজরটা আটকাইয়া গিয়া একটা বুদ্ধি আনিল, বলিলাম, সঙিন উঁচু ক'রে সার্।

ভাল ছেলে বলিয়া আমার একটু নাম ছিল। মাস্টার মহাশয় এমন গভীরভাবে নিরাশ হইয়া গেলেন যে, আমার উত্তরের উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। ভবেশকে বলিলেন, যা, বোর্ডের কাছে যা, জিওমেট্রির ছয়ের প্রব্লেমটা মুখস্থ আছে ?

ভবেশ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ছাদের দিকে এমনভাবে চাহিয়া রহিল, মনে হইল, যেন ছাদ ভেদ করিয়া আকাশে কোন নক্ষত্রলোকে ছয়ের প্রব্লেমটার অনুসন্ধান করিতেছে। সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন, যা, ওই এক কোণে ব'সে পদ্য লিখ্‌গে যা। বলাই ?

ভবেশের অবস্থার সঙ্গে বলাইয়ের অবস্থার কোন প্রভেদ লক্ষিত হইল না। সেকেণ্ড মাস্টার তখন নিজে বোর্ডের কাছে গেলেন এবং সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক চতুষ্কোণ ঘরটিতে পূর্ব-পশ্চিমে গোটাকতক করিয়া সোজা লাইন টানিলেন। বলিলেন, এই সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেক লাইনটি পরস্পর সমান্তরাল, কেন না, আমি প্রত্যেকটিকে প্রথম লাইনটির সঙ্গে প্যারালাল ক'রে টেনেছি। কোন্ থিয়োরেম ?

বিলাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, পনরোর থিয়োরেম সার্।

অনাথ সামনের খাতার দিকে মুখটা নীচু করিয়া, আমার দিকে আড়চোখে বলিল, অঙ্কের জের ধ'রে কোন্‌খানে চ'লে এলে এলেন দেখ্! কোথায় পলাশীর যুদ্ধ আর কোথায় পনরোর থিয়োরেম !

সেকেণ্ড মাস্টার সমান্তরাল লাইনগুলির উপর দিয়া তির্যকভাবে একটি সোজা লাইন টানিলেন, বলিলেন, ঠিক। ব'স। পনরোর

থিয়োরেম বলছে, যদি দুই কিংবা ততোধিক লাইন অন্য একটি লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল হয় তো তারা পরস্পরের মধ্যেও সমান্তরাল হবে।

অঙ্কের খেলা পুরামাত্রায় জমিয়া গিয়াছে। মাস্টার মহাশয় সমস্ত থিয়োরেমটি বিধি অনুসারে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, তা হ'লে সৈন্যেরা তালগোল পাকিয়ে, ( আমার দিকে শ্লেষ-কটাক্ষ করিয়া ) সঙিন খাড়া ক'রে না থেকে, প্যারালাল লাইনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনের ব্যূহ রচনার কথা শুনেছ তো ? পিয়োর মাথেম্যাটিক্স ; নিজের সৈন্যের সংখ্যা আর শক্তি বুঝে, তাহাকে বিভিন্ন সেক্‌শনে ভাগ ক'রে দাঁড করানো শুধু হায়ার ম্যাথেম্যাটিক্সের খেলা—জিয়োমেট্রি, অ্যাল্‌জেব্রা, ট্রিগনোমেট্রি, কেমন—ভাল লাগছে, ইন্‌টারেস্টিং বোধ হচ্ছে ?

ঢং ঢং করিয়া ষষ্ঠ ঘণ্টা শেষ হইল।

নাও, পদ্যটা পড দিকিন এইবার।

অপ্রস্তুত হইবার ভয়ে বিলাস আর উঠিল না। বোধ হয় অঙ্কের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় প্রত্যেক বেঞ্চে দুই-একজন করিয়া ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল, ভবেশ পর্যন্ত।

মাস্টার মহাশয় অনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ইউ।

অনাথ পড়িল—

আবার আবার সেই কামান গর্জন,<br>
উগরিল ধূমরাশি,<br>
আঁধারিল দশদিশি<br>
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিশ বাজন।

মাস্টার মহাশয় চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, যতটা সহজ ভাবছ, ততটা নয়। জিনিসটাকে খুব ভাল ক'রে অ্যানালাইজ ক'রে দেখতে হবে। লিখে ফেল বোর্ডে।

অনাথ রণস্থলের নীচে পদ্যটা লিখিয়া ফেলিল। মাস্টার মহাশয় একবার মনে মনে পড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'ধূম্ররাশি'র ওপর ১ লেখ, 'উগরিল'র ওপর ২, 'দশে'র ওপর ৩, 'দিশি'র ওপর ৪, 'আঁধারিল' ৫, 'সেই' ৬, 'সঙ্গে' ৭, 'ব্রিটিশ' ৮, 'গরজিল' ৯—যাও, নিজেব সীটে ব'স গিয়ে। এটা কি হ'ল বলতে পার ?

সবাই বুঝিল, কবিতাটির অন্বয় করা হইল, কিন্তু নিগূঢ় কোন অঙ্কের কারসাজি আশঙ্কা করিয়া কেহ আর উত্তর দিল না। "ইউ ইউ" করিতে করিতে মাস্টার মহাশয়ের নজর হরার উপর পড়িল। সে বেঁটে হওয়ার সুবিধায় মাথা নীচু করিয়া ঢুলিতেছিল। মাস্টার মহাশয় ডাকিলেন, হরা!

হরা হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিদ্রা দেওয়া হচ্ছে ? পদ্যর মাথায় ওই ফিগারগুলো কি হ'ল ?

তন্দ্রা হইতে একেবারে অঙ্কের মাঝখানে পড়িয়া হরার আর ভাবিয়া দেখিবার শক্তি রহিল না ; বলিল, একুশ আপন—

সেকেণ্ড মাস্টার একরকম ভেংচাইয়াই বলিলেন, হ্যাঁ, ব'লে যাও, একুশ আপন পাঁচ শো চৌত্রিশ আপন ন শো।

ললিত ঠিক সামনেই প্রথম বেঞ্চে বসিয়া ছিল। সেকেণ্ড মাস্টারের রসিকতায় হাসিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া যদি প্রশ্নাদি না করেন, এই আশায় সবে হাসিতে শুরু করিয়াছে, সেকেণ্ড মাস্টার আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, তুমি, ললিত ?

ললিতের মুখটা যেন ছাইয়ের মত হইয়া গেল। ও বেচারার জায়গা প্রথম বেঞ্চে নয়, শেষ বেঞ্চে নিরুপদ্রবে বসিয়া সাতটি ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ি চলিয়া যায় ; আজ গোলমালে কেমন অন্যমনস্কভাবে প্রথম বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়াছে। একে পডাশুনার সঙ্গে কোন কালেই কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আবার অঙ্ক শেষ হইয়া পদ্য চলিতেছে, কি পদ্য শেষ হইয়া

এই আসলে অঙ্ক আরম্ভ হইল, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই পাকা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোর্ডের পানে চাহিয়া পদ্যের উপর লেখা অঙ্কগুলা পড়িতে পড়িতে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, একুশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছ শো আটাত্তর।

চারিদিকে একটা চাপা হাসি উঠিল। সেকেণ্ড মাস্টার গম্ভীরভাবে বলিলেন, চমৎকার! একুশ কোটি কি, তা শুনি?

ললিত আরও ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, সৈন্য সার্।

ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা কত?

তিরিশ কোটি সার্।

তা হ'লে প্রায় সবাই পলাশীর যুদ্ধে নেমে পড়েছিল বল?

ললিত চুপ করিয়া রহিল। সেকেণ্ড মাস্টার নিরাশ হইয়া বলিলেন, ব'স। আমারও যেমন দুর্ভোগ, তোমাদের মত গর্দভদের ক্রিটিক্যালি পদ্য পড়াতে যাওয়া! তুমি, শৈলেন?

আমি সংখ্যার নির্দেশমত ভয়ে ভয়ে কথাগুলি পড়িয়া অন্বয়টা দাঁড় করাইলাম। মাস্টার মহাশয়ের রাগটা পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিলেন, এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, পদ্যের গোড়ার রহস্য হচ্ছে ম্যাথেম্যাটিক্স?

কাহারও কাছে কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, দেখ, তোমাদের সামনে গদ্য আর পদ্য—দুই একসঙ্গে রয়েছে, দুটোর মধ্যে মূলগত প্রভেদটা কি?

আমি বলিলাম, ছন্দ সার্।

ছন্দটা কি?

চুপ করিয়া রহিলাম।

তুমি, কবি?

ভবেশ বলিল, শব্দের এমন সংযোজনা সার্—

ব'স বাপু, তুমি আরম্ভই করলে অনুপ্রাস দিয়ে। ছন্দটা আর কিছু নয়, ম্যাথেম্যাটিক্স,—সময়ের অতি সূক্ষ্ম বিভাগ—কথাটা মনে রেখো,—বিভাগ, ডিভিশন—মাইণ্ড ইউ। পদ্য থেকে এই ম্যাথেম্যাটিক্স বের ক'রে নাও, যা অবশেষ থাকবে তা গদ্যেরও অধম। তা হ'লে দাঁড়াল—নবীন সেন বাইরেই নবীন সেন, তাঁর ভেতরে রয়েছে—ভেতরে রয়েছে— ?

বিলাস বলিল, যাদব চক্রবর্তী সার্।

মাস্টার মহাশয় প্রীতিপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, বুঝেছ তো ?

একেবারে জল হয়ে গেছে সার্।

সমস্ত ডায়াগ্রামটা এঁকে নাও। এইবার মানেটা একবার প'ড়ে নাও দিকিন—অর্থাৎ কাব্যের ভাবের দিকটা আর কি। দেখবে, তার মধ্যে ম্যাথেম্যাটিক্স আরও সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করেছে। কি বলছে ?—

আবার আবার সেই কামান গর্জন
উগরিল ধূমরাশি
আঁধারিল দশদিশি

হিয়ার ইউ আর, দশদিশি—দি টেন ডিভিশন্স অব দি কম্পাস। অনাথ !

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া শেষ ঘণ্টা পড়িল। মাস্টার মহাশয় ক্লাসের চারিদিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আর একটু তা হ'লে পডবে নাকি সব ?

বিলাস গোড়ায় মজাইয়াছিল, শেষের দিকে কিন্তু সে-ই উদ্ধার করিল। আমরা শঙ্কিতভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছি, বিলাস বলিল, আজ না হয় আর থাক্ সার্, জিনিসটাকে সত্যিই যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ততটা নয়, অনেক ভাববার কথা আছে।

মাস্টার মহাশয় গভীর প্রীতির সহিত চাদরের প্রান্তভাগ দুই মুষ্টিতে একত্র করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

# ছত্রপতি

বৃষ্টি নামিতে তাড়াতাড়ি একটু পা চালাইয়া একটা দোতলা বাড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে ফুটপাথটা খানিকটা ঢাকা। আশ্রয় মিলিল।

মনটা বিষণ্ণ হইয়া আছে। বাড়ি হইতে বাহির হইতেই ভাইপোটা টুকিয়া দিয়াছিল, কাকা, ছাতা নিলে না ?

সেই থেকে মনটা খিঁচড়াইয়া আছে। ঠিক যাত্রার মুখে পিছনে ডাকা আমার সয় না; খুব একচোট বকাবকি করিলাম। যাত্রাটা শোধরাইয়া লইবার জন্য একটু বসিয়া গেলাম। তাহার পর আবার যেন পিছনে না ডাকে, সেজন্য সতর্ক করিয়া দিয়া উঠিয়া আসিয়াছি। আবার যে ছাতাটা না লইয়াই উঠিয়াছি, ছেলেটা সেটুকু আর মনে করাইয়া দিতে সাহস পায় নাই।

পাশেই বারান্দাটার মধ্যে গায়ে গায়ে তিনটি দোকান। একটি চায়ের, একটি হোমিওপ্যাথির, একটি ছাতার—ছাতাব সঙ্গে কিছু কাটা কাপড়ও আছে।

সমাবেশটা একটু অদ্ভুত,—চা, হোমিওপ্যাথি, ছাতা। অন্য সময় নজর পড়ে না বটে, কিন্তু বর্ষার এই রকম জোর-করা অবসরের মধ্যে এই সামান্য অসামঞ্জস্যগুলাও মনকে যেন অভিভূত করিয়া বসে।

চিন্তার মধ্যে একবার ফিরিয়া দেখিতেই চক্ষে পড়িল, ছাতার দোকানীটা আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ সরাইয়া লইতে গিয়া দৃষ্টিটা চায়ের দোকানে গিয়া পড়িল; সেখানেও সেই অবস্থা, দোকানীর দুইটি লোলুপ চক্ষু আমার উপর নিবদ্ধ।

ব্যাপারটা বুঝিলাম। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। জামা-কাপড় একটু একটু ভিজিয়া গিয়াছে, বর্ষার ছাটে বেশ একটু শৈত্যভাব। অসময় হইলেও বর্ষাটা যে শীঘ্র থামিবে, এমন ভরসা নাই। এ অবস্থায় একটু চা পান না করা, অথবা সামনেই ছাতার দোকান থাকিতে একটা ছাতা কিনিয়া না লওয়া কেমন যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চা আমি পান করি না; বাড়িতে একটা ছাতা আছেই, এই সেদিন কিনিয়াছি। আমি দোকান হইতে সবলে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাস্তার পানে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু মাথার পিছনে যে চারিটি লুব্ধ চক্ষুর দৃষ্টি আসিয়া পড়িতেছে, তাহাদের হাত হইতে কোন-মতেই পরিত্রাণ পাইলাম না। সম্মোহকেরা শুনিয়াছি চোখের উপর চোখ রাখিয়াই বশীভূত করিতে পারে, এদের দৃষ্টি আমার মাথা ফুঁড়িয়া আমার মস্তিষ্ককে যেন বিবশ করিয়া ফেলিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমার মত এমন নিদারুণ অবস্থাতে পড়িয়াও যদি কেহ ইহাদের ফাঁকি দেয় তো কেনই বা ইহাদের এই এত কষ্ট করিয়া পাঁচ-জনের জন্য হাতের এত কাছে প্রয়োজনের সম্ভার সব যোগাইয়া রাখা? আরও কি সব আত্মধিক্কারের কথা মনে উদয় হইল, এখন ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসিয়া বসিয়া মনে পড়িতেছে না। মোট কথা, ঘুরিয়া ছাতার দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম।

২

আকার-প্রকারে মনে হইল, খুব পুরানো দোকান। প্রবেশ করিতেই ‘এই যে আসুন’ বলিয়া দোকানী ছোট্ট দোকানটির ভিতরে সরিয়া গিয়া হাত দিয়া আমার বসিবার জায়গাটুকু ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিল।

বলিল, বিশ্রী বর্ষা পড়েছে মশাই। এবারের নতুন পাঁজিতে বর্ষফল দেখেছেন তো ?

বলিলাম, না।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, দেখেন নি! বোশেখ মাস থেকেই যে বর্ষা প'ড়ে যাবে বলছে। আর যে-রকম সে-রকম বর্ষা নয়, বলছে—গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাকি এ রকম বর্ষা দেখে নি কেউ। কি, ছেলেমেয়েদের জামা চাই নাকি—কত বয়েস ?

বলিলাম, জামা নয়, ছাতা চাই একটা, আমার নিজের জন্যে।

দোকানী নিজের কপালে ছোট একটি করাঘাত করিয়া বলিল, দেখুন, এই বুদ্ধি নিয়ে দোকান করব! তাই করতেও পারলাম না কিছু। দেখছি, ছাতাই দরকার আপনার, অথচ জিজ্ঞেস করছি, জামা চাই ? কি বকম ছাতা দেখাই বলুন দেখি ?

সামনে কয়েক রকমের ছাতা একটা তারে টাঙানো ছিল। মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। মিছামিছি পয়সাটা খরচ করিব ? ওদিকে বৃষ্টিটাও যেন একটু ধরিয়া আসিতেছে। বলিলাম, একটু ভাল আর মজবুত হ'লে বেশ হয়, ওগুলো যেন নেহাত শৌখিন, আর, কি যে বলে—

দোকানী তর্জনী উঁচাইয়া গম্ভীরভাবে আমার মুখের কথাটা পূরণ করিয়া দিল—আর পলকা। ঠিক। তা, এ যে শৌখিন, ফাঁকি আর পলকার যুগ মশাই। চেহারা দেখুন, চুল-ছাঁটা দেখুন, জামা দেখুন, জুতো দেখুন—সব যেন উড়ছে। তা দোব আপনাকে, এমন ছাতা দোব যে, এ যুগে পাওয়াই যায় না। আমরা নিজেরা যে সব সে-যুগের। এই দেখুন, এগুলো কি এই সব ছোকরাদের যুগের ব'লে ভুল হবার জো আছে ?—বলিযা নিজের মাথার এক খামচা অবিন্যস্ত শুভ্র কেশ তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিল।

ছাতা আসিল। বাস্তবিক, অমন ছাতা আমি কলিকাতা শহরে পূর্বে কখনও দেখি নাই। যেমন দীর্ঘ, তেমনই আড়ে। সাধারণ ছাতায় আটটা করিয়া শিক থাকে, দোকানী এক এক করিয়া চৌদ্দটা গুনিয়া দিল। শিকের মাথাগুলা এক-একটা মটরের মত। মোটা অমসৃণ একটা বাঁশের বাঁট—যেন নিজের চর্বিতে মাথার কাছটা একটু একটু ফাটিয়া গিয়াছে। দোকানী একবার হাতে তৌল করিয়া সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, নিন, একবার ওজনটা দেখুন; ঘণ্টাখানেক বইলে আজকালকার রগ-কামানো ছোকরা-বাবুদের হাঁপ ধ'রে যাবে না? এই একটি ছিল, এর পরে আপনার মত খদ্দের এলে আর দিতে পারব না। এ জিনিস আব করে না। বইবার লোক নেই তো আর করবে কার জন্যে মশাই। আপনার মত সাজোয়ান লোক কটা চোখে পড়ে?

মনটা বেশ একটু খুঁতখুঁত করিতেছিল; কিন্তু আধুনিক ছাতাকে বিদ্রূপ করিয়া আরম্ভ করিয়াছি, খোলাখুলি কিছু বলিতে পারিতেছিলাম না। তবুও যা একটু বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম, দোকানী "সাজোয়ান" করিয়া দিয়া সেটুকুও প্রকাশ করিবার আর সামর্থ্য রাখিল না। বছর-দশেকের মধ্যে যাহাকে কেহ শক্তিমান বলিয়া ভ্রম করে নাই, ওই মন্ত্রটুকু শুনিলে তাহার মনের অবস্থা কেমন হয়? একবার খুলিয়া দেখিতে যাইতেছিলাম, দোকানী তাড়াতাড়ি হাত হইতে এক রকম কাড়িয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, তা ব'লে কি খুলতেও গা-জুরি চলবে বাবু? এ যে হাসালেন আপনি। শক্তিমান লোকের দোষ ওই।—বলিয়া সন্তর্পণে আঙুলের টিপ দিয়া দিয়া ছাতা খুলিয়া ধরিয়া আমার মুখের পানে স্মিত হাস্যে চাহিল। সমস্ত ঘরটি যেন অমাবস্যার অন্ধকারে ভরিয়া গেল।

দাম তিন টাকা। কিন্তু দোকানী বলিল, তবে আপনি ভাববেন,

জিনিসটা পছন্দ হয়েছে, তাতে এই দুর্যোগ, আর পাঁজিতে যেমন লিখছে, ছাতাটা হাতছাড়া করাও মুখ্যুমি, তাই দোকানী বেটা দাঁও হাঁকড়াচ্ছে। না মশাই, আপনি আড়াই টাকাই দিন। খদ্দেরের সঙ্গে তো এক দিনের সম্পর্ক নয়। আজ আট গণ্ডা পয়সা গুণগার দিলাম, কাল আবার দরকার পড়লে আপনাকে এই দোকানে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

যে লোকটা এত সুবিবেচক যে কিছু বলিবার পূর্বে নিজে হইতেই তিন টাকা হইতে আড়াই টাকায় নামিয়া আসিতে পারে, তাহার সহিত দর-কষাকষি চলে না। ছাতাটা কিনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

৩

বৃষ্টিটা ধরিয়া আসিয়াছে, তবে এখনও গুঁড়িগুঁড়ি পড়িতেছে। ছাতাটা কিন্তু সেইখানেই খুলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইল। একটু সরিয়া গিয়া আঙুল টিপিয়া টিপিয়া খুলিতে হইবে। ছাতা লইয়া বাহির হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। চায়ের দোকানী কি করিতেছে জানি না, খুব মনের জোর দিয়া ওদিক হইতে দৃষ্টিকে সংযত রাখিয়াছি। ইহার উপর ছাতা খুলিয়া আর বাড়াবাড়ি করিবার ভরসা হয় না। পাক দিয়া যতটা সম্ভব ছাতটার আকার সঙ্কুচিত করিয়া কোলের কাছে লইয়া অগ্রসর হইলাম এবং একটা মোড় ঘুরিয়া অন্য পথ ধরিলাম। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল, এবং মনের সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিলে ইংরেজী বাংলা হিন্দী—যত-গুলি গালাগাল জানা আছে, সমস্তগুলি দোকানীটার উপর উজাড় করিলাম। কি প্রবঞ্চক! মান্ধাতার আমলের কবেকার একটা ছাতা

কিনিয়া রাখিয়াছে, খদ্দের নাই, জো বুঝিয়া ঠিক আমায় গছাইয়া দিল! আচার্য রায় এই জাতকে দোকান করিতে উৎসাহিত করেন।

এ ছাতা লইয়া বাড়ি ফেরা চলিবে না। এমনই আমি কিছু সওদা করিয়া বাড়ি ফিরিলে সবাই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায় নানাবিধ অরুচিকর মন্তব্য লইয়া। তাহার উপর যদি এই ছাতা দেখে—

এক জায়গায় বারান্দার উপর একটি মাড়োয়ারী ঘন্টি বাজাইয়া ছিটের টুকরা নিলাম করিতেছিল। একটু ভিড় হইয়াছে। ছাতাটা কোলের কাছে লইয়া দাঁড়াইলাম। বৃষ্টিটা নিতান্ত আর গুঁড়িগুড়ি পড়িতেছে না, একটু জোর হইয়াছে, কিন্তু নিলাম দেখায় এত তল্লীন হইয়া গিয়াছি—বৃষ্টির কথাটা যেন মনেই নাই। একটি ফতুয়া-পরা বখাটে-গোছের ছোকরা মনে করাইয়া দিল। মুখের দিকে দুই-তিনবার চাহিয়া বলিল, ভিজছেন যে মশাই, ছাতাটা খুলুন না। আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিল।

বলিলাম, তাই তো! খেয়ালই ছিল না।

ভুলটা হঠাৎ জানিতে পারিলে তাড়াতাড়ি যেমন শোধরাইয়া লয় লোকে—লওয়া উচিত যেমন, সেইভাবে ছাতাটা মাথার উপর তুলিয়া শিকের গোড়ায় জোরে একটা ঠেলা দিলাম।

বাঁটের ঠিক এক-তৃতীয়াংশ গিয়া আটকাইয়া গেল। না নীচে নামে, না উপরে যায়। যত রকম ভাবে সম্ভব—অন্তত সে অবস্থায় যত রকম ভাবে সম্ভব ছিল, চেষ্টা করিলাম। কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া সেই অর্ধমুক্ত ছাতা মাথার উপর ধরিয়া নিলামে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ছোকরাও বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিরক্তি এবং বিদ্রূপের স্বরে বলিল, আচ্ছা কিপটে তো মশাই আপনি! তেরপলের মত একটা

ছাতা কিনেছেন—ঠিক অর্ধেকটি খুলে নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! ইচ্ছে করলে তো মাড়োয়ারীটাকে পর্যন্ত এর মধ্যে টেনে নিতে পারেন।

আরও দুই-একজন প্রত্যাশী তাহার সঙ্গে যোগ দিল। বলিলাম, না, কি রকম আটকে গেছে খানিকটা উঠে।

দেবার ইচ্ছে না থাকলে ও রকম আটকায় মশাই। কই, দেখি, কি রকম আটকেছে?

হাত হইতে ছাতাটা লইয়া উপরে ঠেলিবার চেষ্টা করিল। একেবারে অনড। দাঁত-মুখ কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ কুব্জ হইয়া নীচের দিকে টানিল। অতি কষ্টে আধ ইঞ্চিটাক নীচে নামিয়া সেই যে কাপে কাপ বসিয়া গেল, আর না উপরে যায়, না নীচে নামে। কসরতের চোটে শিকের ডগাগুলা খটাখট করিয়া আশেপাশের মাথাগুলির উপর ঠোক্কর দিতে লাগিল। অচিরেই নিলামের ভিড়েব একটা মোটা অংশ ছাতার চারিদিকে ঘেরিয়া মারমুখো হইয়া উঠিল। ছোকরার হাতেই ছাতাটা, আমি দর্শক সাজিয়া গিয়া অনেকটা নিরাপদ ছিলাম। ব্যাপার খুব ঘোরালো হইয়া উঠিতে ছোকরা বলিল, এই, এঁর ছাতা। পয়সা দিয়ে কিনেছিলেন নাকি মশাই? নিন, টুপি ক'রে প'রে থাকুন।—বলিয়া ছাতাটা আমাব হাতে দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও সেই স্বল্প-উদ্ঘাটিত ছাতায় যতটা সম্ভব চারিদিকের বিদ্রূপবাণ হইতে আত্মগোপন করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

কিন্তু সরিয়া যাইব কোথায়? বৃষ্টি পড়িতেছে একটু একটু করিয়া। মাথায় আধখোলা বিরাট ছাতা। কোথায় লোক কম আছে এই রকম গলি-ঘুঁজি দেখিয়া বেড়াইতে হইবে। দাঁড়াইলেই সেখানে বড় ছাতাব মধ্যে আশ্রয়ের লোভে লোক জুটিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, বিদ্রূপ, মন্তব্য।

কয়েকটা গলি ঘুরিয়া মাথায় একটু বুদ্ধি আসিল। একটা ছোট মনিহারী দোকানে গিয়া একটা ছুরি কিনিলাম। আর একটু গিয়া রেলিঙে ঘেরা একটি ছোট পার্কের মত দেখা গেল। গোটা তিনেক বেঞ্চ পাতা আছে। একটির মাথায় কাঠের একফালি চালা-গোছের, একটু জল আটকায়। সেই বেঞ্চটিতে বসিয়া ছাতার বাঁটটা চাঁচিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

উপর আর নীচের অংশটা চাঁচিতে সময় লাগিল না, কিন্তু যেখানটা আটকাইয়াছে ছুরির ছোট ফালির কোণ সাঁদ করাইয়া কুরিয়া কুরিয়া কাটিতে অনেক বিলম্ব লাগিল। যাহা হউক, ফল হইল। হঠাৎ আমার বাঁ হাতের বুড়া-আঙুলটা থামচাইয়া দিয়া ছাতাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে যাইব, দেখি, উপদ্রব অন্য দিক দিয়া মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে।

ছাতাটা শুধু আকারের দিক দিয়াই প্রাচীন নয়, সরঞ্জামের দিক দিয়াও একেবারে পচা। পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টায় শিকের গোড়ায় তারের বাঁধুনিটা কখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে টের পাই নাই; ছাতাটা হঠাৎ মুড়িয়া যাইতেই একসঙ্গে গোটা পাঁচ-ছয় শিকের মুখ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। হতাশ দৃষ্টিতে সেই ভগ্নাবশেষের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

## ৪

আড়াইটা টাকা গিয়াছে, কপালে লোকসান লেখা ছিল, কি আর হইবে? এখন কথা হইতেছে, এই ছাতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাই

কি করিয়া? এই বস্তু বহন করিয়া কি করিয়া ফিরি? একটি ছাতা মেরামতের দোকান নাই, 'ছাতা মেরামত' করিয়া লোকও হাঁকে না। একটু নিরিবিলি জায়গার খোঁজে প্রায় ঘণ্টা দুই আড়াই ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ পাড়ায় যে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

বৃষ্টিটা বেশ ছাড়িয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ছোট পার্কটিতে একটি চাকর তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া প্রবেশ করিল। আমি উঠিলাম, মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়াছে।

চাকরটাকে প্রশ্ন করিলাম, এখান থেকে ট্রামের রাস্তা কতটা? কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে?

কোথায় যাবেন আপনি?

আমার ট্রামের দরকার, কোথায় যাই সেটা অবান্তর।

বলিলাম, বউবাজার স্ট্রীটে গিয়ে আমায় ট্রাম ধরতে হবে। কতটা হবে এখান থেকে?

উত্তর করিল, গ্রে স্ট্রীটের ট্রাম-লাইন এখান থেকে সবচেয়ে কাছে। বলিলাম, তাতেও চলবে। কোন্ দিকে?

চাকরটা একটু সন্দিগ্ধভাবে মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর হাত দেখাইয়া বলিল, তা হ'লে সোজা গিয়ে একটু মোড় ফিরেই সিধে পশ্চিমে চ'লে যান।

টানা-হিঁচড়া করিতে কয়েকটা শিকের মাঝখানটা বাঁকিয়া গিয়া ছাতার পেটটা ফুলিয়া গিয়াছে, যথাসম্ভব গুছাইয়া লইয়া যাত্রা করিলাম।

গ্রে স্ট্রীটে আসিয়া একটা চিৎপুরগামী ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়িলাম। একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। ট্রামের এক কোণে দুই-একজন সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির লোক পরস্পরের কাছে মুখ সরাইয়া লইয়া কি একটা পরামর্শে লাগিয়া আছে। ইহাদেরই খুঁজিতেছি। গিয়া

ঠিক তাহাদের সামনের সীটটিতে বসিলাম, এবং তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধাই না হয়, সেইজন্য ছাতাটা নিজের সামনে না রাখিয়া বেঞ্চটার পিঠে ঠিক তাহাদের হাতের কাছে টাঙাইয়া রাখিলাম।

সামনে লম্বালম্বি করিয়া বসানো একটা বেঞ্চে কতকগুলি পাড়াগেঁয়ে-গোছের বাঙালী বসিয়া তর্ক করিতেছিল। বসিতেই সামনের লোকটি আমার ছাতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে মাথা নোয়াইয়া খুব ভক্তিভরে বলিল, প্রণাম হই।

তাহার পর সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, কেন এত তর্ক বাপু তোমাদের? এই এঁকেই জিজ্ঞাসা কর না, আমাদের ভাগ্যে যখন এসে পড়েছেন। এরা বলছে, আজ বারোটা একচল্লিশ মিনিট গতে অমাবস্যা পড়বে, অথচ আমার যেন মনে হচ্ছে, পাঁজিতে দেখে এলাম—

অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, কিন্তু তখনই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। ইহারা ছাতা দেখিয়া আমায় নিশ্চয় গুরুপুরোহিত-গোছের কিছু একটা ঠাহর করিয়া থাকিবে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেহারাতেও নিশ্চয় একটা পরিব্রাজক-গোছের ছাপ পড়িয়াছে। তাহার উপর মুণ্ডিত মুখমণ্ডল, পায়ে একটু পুরাতন গোছের স্যাণ্ডাল—এসবের সাক্ষ্য তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় নিদর্শন ওই ছাতা। নির্ঘাত শিষ্য-বাড়ি জিনিস, মেদিনীপুর ঘাঁটাল অথবা একেবারে সুন্দরবন ঘেঁষিয়া কোন শিষ্য-বাড়ি হইতে আমদানি—কলিকাতার বহুদূরে এবং এ যুগের ছোঁয়াচ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন শিষ্য-বাড়ি।

লোকগুলা চিৎপুরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় নামিয়া গেল। পিছনের সেই লোক দুইটা বসিয়া আছে। কান ওই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছি। না, যতটা বুঝা যাইতেছে, খাঁটি লোক। ইহারা আমায় ছাতা-সমস্যা হইতে মুক্ত করিবেই। হ্যারিসন রোডের কাছে আসিয়া

ভিড়টা চাপ বাঁধিয়া উঠিল। এই সুযোগ। আমি উঠিয়া পড়িলাম এবং ছাতাটা তুলিয়া, ভিড় ঠেলিয়া ট্রামের ফুট্‌বোর্ডের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম।. নামিতে যাইব; কাঁধে একটা রুক্ষ হস্তের স্পর্শ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখি, আমার পিছনের সঙ্গীদের মধ্যে একজন। একটি সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া বলিল, ঠাকুর মশাই, আপনার ছাতা।

ও, ভুলেই গেছলাম তো!—বলিয়া ছাতাটা লইয়া নামিয়া ফুট্‌পাথে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কি করা যায়! চোর-গুণ্ডাকেও নির্লোভ সাধু করিয়া তোলে, এ কি পাপ ঘাড়ে আসিয়া পড়িল! বাড়ি যাই কি করিয়া? শিবপুরের রামরাজাতলা—এখানে তো নয়। ট্রাম বাস—অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, তা ছাড়া উঠিই বা কি করিয়া বাড়িতে এ জিনিস লইয়া? ওদিকে ছাতা ক্রমেই অঙ্গবিস্তার করিতেছে। এদিকে নিজের শরীর দুশ্চিন্তা আর নিরুদ্দেশ ঘোরাঘুরিতে একেবারে অবসন্ন।

সুবিধার মধ্যে বৃষ্টির ছাটে মাথাটা ঠাণ্ডা আছে, আবার একটু বুদ্ধি আসিল।

লোয়া'র চিৎপুর হইয়া এস্‌প্ল্যানেডে আসিলাম এবং সেখান হইতে একেবারে ইডেন গার্ডেনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পথের বিড়ম্বনাটা আর লিপিবদ্ধ করিতেছি না।

খুব ঝোপঝাড় দেখিয়া একটি নিভৃত স্থানে গিয়া বসিলাম। তখন বেলা গিয়া বেশ একটু গা-ঢাকা হইয়া আসিয়াছে।

পরে বুঝিলাম, অত বেশি নিভৃত স্থান খুঁজিতে যাওয়াই ভুল হইয়াছিল।

বেঞ্চে একটু বসিয়া ছাতা তুলিয়া একটু বাহিরে ফাঁকায় আসিয়া পড়িয়াছি, একটা উড়িয়া মালী আসিয়া বাঁ হাতে ছাতাটা লইয়া হাসিয়া

দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, ছাতাটা ভুলে যাচ্ছিলেন, বকশিশ দেবেন বাবু।

চূড়ান্ত অবস্থা হইয়া আসিয়াছে। স্খলিত কণ্ঠে বলিলাম, ঠিক, ভুলে গেছলাম বটে।

একটু চিন্তা করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলাম, গরিব মালী হয়েও যে রকম সাধু লোক, নে, তুই ছাতাটাই নিয়ে নে।

মালীও একটু চিন্তা করিল, একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে ছাতাটার পানে চাহিল বটে, কিন্তু বুঝিলাম. কি একটা প্রবল দ্বিধায় পড়িয়াছে। উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, এই নে চারটে পয়সা, বরং মেরামত ক'রে নিস। আহা, গরিব লোক!

মালী ভীত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিল, জায়গাটার নিভৃত ভাবটাও একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর হঠাৎ যেন একটা অজানা বিপদের ইঙ্গিত পাইয়া নিজের লোভ সংযত করিয়া বলিল, না বাবু, থাক্. বকশিশ চাই না; সেলাম।

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

* * *

গভীর নৈরাশ্যে অবশেষে মা-গঙ্গাকে আশ্রয় করিতে হইল।

কতবার ভাবিয়াছি, মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? আজ একটি দিনের সামান্য একটা ছত্রবিভ্রাটের মধ্যে তাহার উত্তর পাইযাছি।

কেমন একটা বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছে। এই তো জীবন—এতটুকু একটা তুচ্ছতায় যাহাব মধ্যে এতবড একটা বিপর্যয় আনিয়া ফেলিতে পারে, একেও মানুষ এত করিযা চায় কেন? একটা সামান্য ছাতা, না হয় অসামান্যই, কিন্তু ছাতাই তো? ইহার দ্বারাও যদি এতটা নির্যাতন সম্ভব জীবনে তো কেন মানুষ এ জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকে?

সন্ধ্যার অন্ধকার, গঙ্গার তীর—এমনিই মনটাকে উদাস করিয়া তোলে, তায় নিতান্ত অহেতুকভাবেই আজ সমস্ত দিনটা এই নিগ্রহ।

স্ট্র্যাণ্ড রোড পার হইয়া গঙ্গার ধার দিয়া খানিকটা দক্ষিণে চলিয়া গেলাম। কেল্লার সামনাসামনি জেটির বালাই নাই, নৌকাও কাছে-পিঠে দেখা যায় না। এই উপযুক্ত জায়গা। কেহ একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে না। আমি সন্তর্পণে জলের ধারে নামিয়া গেলাম।

কাছেই একটা গোল পাথরের বড় চাঁই; কেমন করিয়া ঠিক এই জায়গাটিতে আসিয়া পড়িয়াছিল জানি না,—মা বোধ হয় এই বিড়ম্বনার অবসান করিবেন বলিয়াই।

এইবার খানিকটা দড়ি দরকার। নিজের বস্ত্রের পানে চাহিলাম। এত সাধের দেহটাকেই যে বস্ত্রখণ্ডের মত এক কথায় ত্যাগ করা চলে, সে বস্ত্রখণ্ডের জন্য এত মায়া কেন? কোঁচার খুঁটটা খুলিয়া কাপড়টা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

পাথরটা ভাল করিয়া বাঁধিলাম। প্রায় পনরো-কুড়ি সেরের শিলা, ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া যদি অতলকে আশ্রয় করা যায় তো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি কোন সন্ধানই পায় না।

তারপর?

তারপর মায়া। হাঁ, জীবনে এত দুঃখ-দুর্গতির পাশেও যে কোথা হইতে এত মায়া আসিয়া জমা হয়, কি করিয়া বলি? দেহই বল অথবা অন্য কিছুই বল—যাহা লইয়া এত নির্যাতন, তাহাকেই আবার বিদায়ের সময় প্রাণ এমন করিয়া জড়াইয়া ধরে কেন?

ছাতাটার পানে একবার করুণ নেত্রে চাহিলাম, তারপর পাথর-ল কাপড়ের পাড়ের সঙ্গে সেটাকে বাঁধিয়া পাথরটা ধীরে ধীরে গ গর্ভে ঠেলিয়া দিলাম।